সুভাষ-রচনাবলী

কারামুক্তির পর। ১৯২৭

সুভাষ-রচনাবলী

১

উপদেষ্টামণ্ডলী

সভাপতি

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

সদস্যগণ

শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী — শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ

ড. অশোকনাথ বসু — শ্রীসমর গুহ

প্রধান সম্পাদক

শ্রীসুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশন। কলিকাতা ২৬

প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৫ : এপ্রিল ১৯৭৮

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলিকাতা ২৬

মুদ্রক : শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

গ্রন্থক : সেঞ্চুরি বাইন্ডিং কোম্পানি
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সার্থক সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান যে কত মূল্যবান এ দেশের লোক তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। যে ব্রিটিশ রাজমন্ত্রী (অর্থাৎ অ্যাটলিসাহেব) ভারতকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে সুভাষচন্দ্রের গঠিত ভারতের জাতীয় বাহিনী যখন প্রমাণ করিল যে ইংরেজ সরকার ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতকে স্বীয় অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না, তখনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়লাভ করিয়াও ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করিলেন এবং এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহারা খুব বিচলিত হন নাই। বিষয়টি আমি আমার History of the Freedom Movement in India (Vol. III, Pp 609-10) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের অবদান যে কত বড় তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্রের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অনেক রচনা— বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার অভিভাষণ প্রকাশিত হইলেও এখন দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট কোনো ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য 'জয়শ্রী প্রকাশন' ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি তাহার প্রথম খণ্ড। ইহাতে বহু বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৮ সন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণগুলি এই খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইভাবে প্রতিখণ্ডে সুভাষচন্দ্রের জীবনী ও চিন্তাধারার ক্রমিক পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থগুলির সংকলনের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং শ্রীসুনীল দাস ইহার প্রধান সম্পাদক। তাঁহাদের এবং শ্রীবিজয়কুমার নাগের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য আমি তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

মুখবন্ধ

দুরূহ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে 'সুভাষ-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে এই খণ্ডটি কেন প্রকাশিত হতে পারল না, কেন-ই বা এত বিলম্ব হল, যাঁরা 'সুভাষ-রচনাবলী'র গ্রাহক হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সে-বিষয়ে অবগত আছেন। এখানে সবিস্তারে সে-প্রসঙ্গের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সমকালীন ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রহস্যময়তার অন্তরালে অন্তর্হিত হলেও সমসাময়িক জীবনে তিনি এক যুগ-নায়কের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন— রূপকথার মতো যাঁর জীবনের ও ভারতের মুক্তিসাধনার জন্য যাঁর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের কাহিনী দেশের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। কটকে কৈশোর থেকে যে-জীবনের যাত্রা শুরু, যৌবনে যে-জীবন বিপ্লবের পথে অভিযাত্রী, যে-অভিযাত্রী জীবনকে পরিপূর্ণরূপে সত্তার গভীরে উপলব্ধির জন্য জীবনের পরতে পরতে সংগ্রাম করে চলেছেন এবং যে মহা-বিপ্লবী বন্ধনমুক্তির নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের অন্তিম পর্যায়ে অধ্যাত্মচেতনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁচেছেন— সেই মহাজীবনকে তাঁর কৈশোর থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চারিত বাণীর সংকলনে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলবার জন্যই 'সুভাষ-রচনাবলী' প্রকাশের উদ্যোগ।

জীবন ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতার উন্মেষ সেই শৈশবেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে দেখা গেছে। সুভাষচন্দ্র তখনো কটকে প্রোটেস্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র। সেই ইউরোপীয় স্কুলের বিজাতীয় পরিবেশে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের নানা সুযোগ থাকলেও, ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি স্কুল-কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণ, বালক সুভাষের মনে এ কথা গেঁথে দিয়েছিল যে, ভারতীয় হিসাবে তারা আর-এক জাতের লোক— 'as Indian's we are a class apart'। ভারতীয়রা ইংরেজদের চাইতে আলাদা জাতের লোক, ভারতীয়ত্ববোধের এই অস্পষ্ট ছাপ বালক সুভাষচন্দ্রের মনে সে-সময়েই একটা দাগ কেটে গিয়েছিল। বারো বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি দুটো পৃথিবীতে বাস করছেন। একটা ইউরোপীয় স্কুলের ইউরোপীয়

ভাবধারার পৃথিবী— দেশের মাটির সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই, সম্পর্ক নেই ; আর-একটি পৃথিবী ভারতীয় জীবনবোধের— যেখানে রয়েছে ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় জীবনধারা এবং পারিবারিক জীবনের পরিবেশ।

কটক মিশনারী স্কুলে সাত বছর পড়বার পর সুভাষচন্দ্র ১৯০৯ সালে কটক র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভারতীয় পরিবেশে ফিরে এলেন। তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। বৃহৎ পরিবারে একসঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠা, পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, অতিথি-পরায়ণতা, আশ্রিতদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার একটা সমাজ-সচেতনতা, সুভাষচন্দ্রের মনে তাঁর বাল্যে ও কৈশোরেই দানা বেঁধে উঠেছিল। ভারতীয় জীবনবোধের পরার্থপরতা সেদিনকার সমাজেও যেমন দীপ্যমান ছিল, বর্তমানের শিল্পাশ্রয়ী সমাজেও সেই পরার্থপরতার মূল্যবোধই মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যান্ত্রিকতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করছে। ভারতীয় জীবনের এই উপাদানটি সুভাষ-মানসের অনবদ্য মৌলিক উপাদান-রূপে গড়ে উঠেছিল।

এই মহান বিপ্লবীর জীবনচর্যার অনুষঙ্গরূপে যে অধ্যাত্মসাধনা তাঁকে জন্মভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সর্বস্বসমর্পণের দুর্গম যাত্রায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে তারও স্ফুরণ হয়েছিল কটকে কৈশোরে। বারো বছরের বালক সুভাষ, জীবনে যেন একটা আদর্শের হাতছানি দেখলেন র‍্যাভেনশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক আচার্য বেণীমাধব দাসের সান্নিধ্যে। আচার্য বেণীমাধব কিশোর ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন— 'প্রকৃতির কাছে নিজেকে সঁপে দাও'— প্রকৃতির কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দ্বন্দ্বসংঘাতে জীর্ণ মন, শান্ত ও শুচি হয়ে একটি নৈতিক মূল্যবোধের আশ্রয় খুঁজে পাবে। আচার্য বেণীমাধব এই আদর্শই ছাত্র-শিষ্যের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অশান্ত কিশোরের মন জীবনের আরো গভীরে প্রবেশ করে আরো মূলগত আদর্শবোধের সন্ধান করতে লাগলেন। এমন একটি আদর্শ-বোধ চাই, যা কেবলমাত্র জীবনের সকল জিজ্ঞাসার সমাধান দেবে তাই নয়, যে আদর্শ অনুসরণে জীবনকে একান্তভাবে উৎসর্গ করা চলবে। কিশোর সুভাষ যখন এরকম আত্মানুসন্ধানে অধীর হয়ে উঠেছেন, জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তাল তরঙ্গ যখন তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, সে-সময় আত্ম-আবিষ্কারের দহনে জর্জরিত সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে। তখন তাঁর

বয়স পনেরো বছর। সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিবেকানন্দের আবির্ভাবে সহসা বিপ্লব ঘটে গেল। বিবেকানন্দ তাঁকে পথ দেখালেন, আদর্শের সন্ধান দিলেন। 'তোমার নিজের মুক্তি-সাধন ও মানবসেবা'— বিবেকানন্দ তাঁকে এই দ্বৈত-আদর্শ দিলেন। অতঃপর এই আদর্শবোধ হয়ে উঠল সুভাষ-জীবনের ব্রত। এই আদর্শবোধের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র অধ্যাত্মসাধনার দিকে অগ্রসর হলেন— যোগাভ্যাসের দুর্বার প্রয়াসের শুরু সেইখানে। মানবসেবার আদর্শ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল স্বদেশসেবায়, স্বদেশসেবা থেকে বিপ্লব-সাধনায়। তাই সুভাষ-জীবনে অধ্যাত্মসাধনা ও বিপ্লব-সাধনা দুইটি গিরি-শৃঙ্গের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যাত্মসাধনা বা আত্মজিজ্ঞাসা সুভাষচন্দ্রকে ভারতীয়ত্ববোধের প্রত্যয়ের গভীরে সমাহিত করে দিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ধ্যানের ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায়, মননে ও জীবনের স্তরে স্তরে পল্লবিত হয়ে উঠে তাঁর ভারতীয়ত্ববোধকে, তাঁর মানবতাবোধের সাগরসঙ্গমে মিলিত করেছে। এই ভারতীয়ত্ববোধের 'শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবেদ থেকে গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে নিজের জন্য মুক্তির সাধনাই ভারতীয়ত্ববোধের অন্তিমবার্তা নয়। তার মধ্যে নিহিত রয়েছে স্বার্থসন্ধ মন। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে পরাধীনতার গ্লানিমুক্তির জন্য যেমন শক্তির স্পন্দন চাই আত্মার গভীরে, যে শক্তির উদ্বোধন না হলে ত্যাগব্রতের তপশ্চর্যা অসম্পূর্ণ থাকবে, সেবাব্রতের শক্তি সুপ্ত থাকবে। সেই উদ্ভাসিত শক্তির শাণিত দীপ্তি পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনকেও যেমন অনিবার্য করে তুলবে, তেমনি দুঃখ-দৈন্য-জর্জর সাধারণ মানুষের জীবনে পীড়ন-শোষণ-লাঞ্ছনা থেকে বন্ধনমুক্তির দুর্বার শক্তিকেও বেগবান ক'রে তুলবে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ভারতীয়ত্ববোধের যে শক্তি সার্বিক বন্ধনমুক্তির পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, সেই শক্তিই বিশ্বমানবতার বন্ধনমুক্তিতে দিগ্‌দিগন্তে সঞ্চারিত হয়ে ভারতীয়ত্ববোধের সঙ্গে মানবতাবোধের সমন্বয় সাধন করবে। সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধের গভীরে অতঃপর ধীরে ধীরে তাঁর দৃঢ়মূল প্রত্যয় জন্মেছিল যে ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব ক'রে তুলতে পারলে, বিশ্বমানবতার নিরাপত্তাও অনিবার্য হয়ে উঠবে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে তাঁর কৈশোরের জীবন-জিজ্ঞাসার স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর মাতৃদেবীর কাছে লিখিত চিঠিগুলি। সুতীব্র মানবতাবোধ,

সেবাব্রত, ত্যাগব্রত, অধ্যাত্মসাধনার অঙ্কুরোদ্গম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে কিশোর সুভাষের এই চিঠিগুলিতে। সুভাষ লিখছেন : "জন্মমৃত্যু লইয়া এ-জীবন— তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ— হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক। আমাতে জন্তুতে প্রভেদ এই যে পশুরা ভগবানকে বুঝিতে বা বুঝিয়া ডাকিতে পারে না আর আমরা চেষ্টা করিলে তাহা পারি।..." আবার বলছেন, "...আমরা বৃথা 'ধন' 'ধন' বলিয়া হাহাকার করি। একবারও ভাবি না, প্রকৃত ধনী কে? যাহার ভগবৎ প্রেম, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি ধন আছে জগতে সেই ত ধনী।..."

অন্য এক চিঠিতে লিখছেন : "মা, আপনার মতে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?... বড় হইলে আমাদিগকে কোন্ কার্যে নিযুক্ত দেখিলে আপনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করিবেন— জানি না আপনার মনের ইচ্ছা কি।... প্রচুর ধনশালী, গাড়ী, ঘোড়া, মোটর প্রভৃতির অধিকারী, নানা দাসদাসীর প্রভু, প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বিপুল জমিদারীর অধিকারী হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে— না দরিদ্র হইলেও পণ্ডিতদিগের দ্বারা এবং গুণিজনের দ্বারা 'প্রকৃত মানুষ' বলিয়া পূজিত হইলে আপনার সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইবে তাহা জানি না।..." ঐ চিঠিতেই আরো লিখছেন : "আমি প্রায়ই ভাবি বাঙালী কবে মানুষ হইবে— কবে ছার টাকার লোভ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে— কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে।"

এই 'মানুষ' হবার সাধনা সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আয়ত্ত করবার পাঠ নিতে শুরু করেন। দক্ষিণেশ্বরের সাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মাত্র আঠারো বছর বয়সে 'টাকা-মাটি'— 'মাটি-টাকা' বলতে বলতে টাকাকে মাটির সঙ্গে একাকার ক'রে ফেলে এই দুইটি দ্রব্যকেই দুই হাতের ভঙ্গি দিয়ে গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলতে শিখেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর 'টাকা-মাটি'-'মাটি-টাকা'র সাধনাই সুভাষচন্দ্রকে পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ দেখিয়ে দেয়। অতঃপর ত্যাগব্রতের তপশ্চর্যা সুভাষচন্দ্রকে শক্তির আরাধনার পথে নিয়ে যায়। ঠাকুর আরো শিখিয়েছেন : 'সর্বভূতে হরির সেবা... যদি কেউ করে, আর সে যদি মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে, উল্টে কোনো উপকার চায় না, এরূপভাবে যদি সেবা করে তা হলে যথার্থ নিষ্কাম কর্ম করা

হ'ল।" স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগের এই পথই নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন নূতন যুগের 'মানুষ তৈরীর' জন্য। সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের চোখ দিয়েই মৃন্ময়ী দেশমাতাকে চিন্ময়ী দেশমাতারূপে দেখেছেন এবং এই দুঃখিনী ভারতমাতার কোলে আশ্রিত ভারতবাসীদের জীবনকে মনুষ্যত্বের অবমাননার জ্বালা থেকে মুক্ত করতে সর্বস্বপণ আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হন। সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়সে মা'র কাছে লেখা চিঠিতে তাই সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন : "...আমাদের দেশের অবস্থা কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে— দুঃখিনী ভারতমাতার কোনো সন্তান কি নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করিবেন না?..."

দেশমাতার জন্য স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতার আদর্শকে জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করা এবং ভগবদ্ভক্তির প্রবণতা, সেই কৈশোরে মাতৃদেবীর কাছে লেখা চিঠিগুলিতে বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। তাঁর ভগবদ্ভক্তির প্রবল স্বাক্ষর স্বরূপ মাতৃদেবীকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি বলছেন : "...যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র, সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান— ঈশ্বর! যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা— আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা— সব কেবল ভণ্ডামী।..."

সুভাষচন্দ্রের জীবনে কৈশোরের এই জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে অনবরত অঙ্কুশবিদ্ধ ক'রে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর নিজের কাছে নিজের ধারণার রূপরেখা ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তুলেছে। ছাত্র-সুভাষ অনন্তের সন্ধানে একবার গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো মনের গহনে তাঁর মানসিক-আত্মিক সাধনা অবিচল ধারায় প্রবাহিত হয়ে গেছে। তারই বহিঃস্ফুরণ দেখা গেছে মাঝে মাঝে। গুরু-সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে ১৯১৪ সালে জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বাড়ি ফিরে আসবার পরই যেন তাঁর আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেল। ঘরে ফেরবার সংবাদ দিয়ে বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লিখছেন : "ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম।" এটা ১৯১৪-র জুন মাসের ঘটনা। ১৯১৫-র আগস্ট মাসে আঠারো বছর বয়সে বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে অন্তহীন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে লিখছেন : "... আমি এটা বুঝিতেছি দিন দিন যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ

and I am not to drift in the current of popular opinion... যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude পরিবর্তন অর্থাৎ দুঃখ নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্বলতা, কিন্তু যে রকম আকাশের দিকে যার লক্ষ্য সম্মুখে পর্বত আসছে, কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না— সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে আদর্শের দিকে— তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with an idea." তারপর সেই চিঠিতেই আরো লিখছেন : "মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই"— ব্যক্তিকে 'অতীতের প্রতিভূ হতে হবে'— ("Embodiment of the Past")— 'বর্তমানের ফসল হতে হবে'— ("Product of the Present")— এবং 'ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে'— ("Prophet of the Future")। 'এই আদর্শগুলিকে একটি জাতির জীবনে সার্থক করে তুলতে হবে— ভারতবর্ষ দিয়েই সুরু করা যাক না ?'

জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির মসৃণ পথ বার বার তাঁর কাছে অবারিত হয়েছে, বার বার সে-পথ প্রত্যাখ্যান করে তিনি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুর্গম পথকে আপন করে নিয়েছেন। সহজাত মেধার গুণে ভালো ছাত্রের শিরোপা তাঁর করায়ত্ত হলেও দুঃসাধ্যব্রত সাধনকেই জীবনের স্তরে স্তরে তিনি জয়মাল্য-রূপে বরণ করে নিয়েছেন। মেধাবী ছাত্র সুভাষচন্দ্র, স্কুলজীবনেই সহপাঠীদের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়ে দেশের বন্ধনমুক্তির সংগ্রামকে সেই সহপাঠীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখাতে শেখালেন, ১৯১১ সালে ১১ আগস্ট তারিখে শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবিলয়ের দিন ছাত্রদের গণ-অনশনের নেতৃত্ব দিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনের দুর্বিনীত বর্ণবিদ্বেষী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কলেজের সহপাঠীদের প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র প্রচারের পাদপীঠে হঠাৎই এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চারিত্রশক্তির ও নেতৃত্বশক্তির চকিত চমক বাংলাদেশে আত্ম-নিবেদনের জীবনদর্শনের বনিয়াদ তৈরি ক'রে দিয়ে গেল। এই ঘটনার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সুভাষচন্দ্র কিভাবে আত্মশক্তির সাক্ষাৎ পেলেন 'ভারত পথিক' গ্রন্থে তা ব্যক্ত করে বলছেন : "অধ্যক্ষ আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার জীবনের ভবিষ্যৎও তিনিই নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।··· যে আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যমের পরিচয় সেদিন

আমার মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম উত্তরকালে সেই ছিল আমার পাথেয়। আমি নেতৃত্বের স্বাদ সেদিন পেয়েছি এবং পেয়েছি আদর্শের জন্য দুঃখবরণের গভীর আনন্দ।” যে-কিশোর ওটেন-পর্বের মাত্র একবছর পূর্বে ১৯১৫ সালে আঠারো বছর বয়সে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন : “আমার জীবনের একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে”, যিনি সেই চিঠিতে আরো লিখলেন : “মানুষ হ'তে গেলে ব্যক্তিকে অতীতের প্রতিভূ হতে হবে, বর্তমানের অভিব্যক্তি হতে হবে এবং ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে”— তিনি এক বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ওটেন-পর্বের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের ইশারা পেলেন।

ওটেন-পর্বের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলন্ডে মাত্র কয়েক মাসের পাঠ-প্রস্তুতির পর সুভাষচন্দ্র ১৯২০ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ২৩ বছর বয়সে চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার সাতমাস পরই আই.সি.এস. চাকুরি থেকে পদত্যাগ করলেন। এ-সময় ‘মেজদা’ শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে বিপ্লবী সুভাষের অংকুর খুঁজে পাওয়া যায়। আই. সি. এস.-এর ফল ১৯২০-র সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ঘোষিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ‘মেজদা’ শরৎচন্দ্র বসুকে লিখছেন (২২ সেপ্টেম্বর) : “...জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাফল্য অসাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই, সংশয় নাই। কিন্তু আমার মত মনোবৃত্তির লোক যে চিরকাল “উদ্ভট” জিনিসেরই পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহার পক্ষে স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিপদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহার অন্তরের মধ্যে সাংসারিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দংশন নাই তাহার নিকট জীবনের সংশয়, বিপদ ততটা ভয়াবহ নহে। উপরন্তু এ কথা ঠিক যে সিভিল সার্ভিসের শৃংখলার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দেশের সত্যকার কাজ করা চলে না। এক কথায় সিভিল সার্ভিসের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্যের সংগে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে মেলানো চলে না।...”

জাতীয়তাবোধ ও আধ্যাত্মিকতার অংকুশের সংগে ততদিনে সুভাষ-মানসে আত্মত্যাগের আদর্শও যে কতটা স্থান জুড়ে ফেলেছে তারই স্বাক্ষর রয়েছে লন্ডন থেকে শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা ১৯২১-এর ১৬ ও ২৩ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে। ১৬ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে লিখছেন : “...আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর

জীবন ও উচ্চচিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাহা ছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরী করা ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে-পথ রমেশ দত্তের পথ অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ।"

সে বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা আর-একটি চিঠিতে জাতীয় সংগ্রামে আত্মনিবেদনের সংকল্প ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্র বলছেন : "...সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব।... আমার মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্বদা জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দাবী মিটাইতে পারিব।"

ত্যাগব্রতের সহযাত্রী সেবাব্রত, ভারতীয়-জীবনবোধের অপূর্ব দুই ফল্গুধারা। তৃতীয় ধারা অধ্যাত্মসাধনা। ভারতীয়ত্বের মাপকাঠি, এই তিনটি উপাদানের অন্তরঙ্গ অন্তঃসলিলা প্রবাহ। তিনটিই আত্মজিজ্ঞাসা থেকে উৎসারিত। ভারতীয়ত্বের এই ত্রিবেণী-সংগমে অবগাহন করেই সুভাষচন্দ্র এই ভারতীয় জীবনবোধের নিশানা পেয়েছেন এবং রাজনীতিকে সেবাব্রতের ক্ষেত্র-রূপে নির্বাচন করেছেন ; রাজনীতি তাঁর পেশাও যেমন নয়, সাময়িক বৃত্তিও নয় : "স্বদেশসেবা বা রাজনীতি আমি সাময়িকবৃত্তিরূপে গ্রহণ করি নি।" বিবেকানন্দের আদর্শ থেকেই সেবা ও ত্যাগবৃত্তির অনুরণন সুভাষচন্দ্রের জীবনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র মাতৃভূমির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের ধ্যান, আরাধনা ও আহুতি দেবার একমাত্র লক্ষ্য-স্থল। নিজের জীবনকে মাতৃভূমির বেদীমূলে উৎসর্গ করবার জন্যই তাঁর জীবনের স্তরে স্তরে নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি চলেছে। ত্যাগ তো জীবনকে বর্জন করা নয়। জীবনকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেই তো সেখানে ত্যাগের গৈরিকের স্থান হবে। জীবনের বলিষ্ঠ গ্রহণ মানে আত্মসুখমগ্নতা নয়। জীবনটা মায়া নয়, মোহ নয়, স্বপ্ন নয়। জীবনের উপর সুনির্দিষ্ট কর্তব্যপালনের দাবি রয়েছে— 'Life is a mission, a duty'— এই বোধে সঞ্জীবিত হয়ে জীবনে আসক্তি বর্জন করে ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে হবে, সেবার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে— শোষিত ও বঞ্চিতের সেবা, দেশের সেবা, মানবতার সেবা। "জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে আত্মসুখলাভের পথ মসৃণ করবার জন্য নয়, ধন, মান ও ক্ষমতার লোলুপতা নয়, নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে বিকাশ

করে ভারতমাতার পদাম্বুজে নিবেদন করবো"— এই আদর্শ নিয়েই সুভাষচন্দ্র জীবনের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের সুগভীর সেতুবন্ধন সুভাষ-মানসের অপর একটি অমূল্য উপাদান। "অতীত ভারত বর্তমানে বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে।" অতীতের কাছে তাঁর এই ঋণবোধ, তাঁকে একদিকে যেমন শক্তিদান করেছে, অপরপক্ষে নূতন ভাবধারা গ্রহণে উদ্দীপিত করেছে। অতীতই বর্তমান ও ভবিষ্যতের পৃষ্ঠভূমি। ব্যক্তিজীবনে যেমন, জাতির জীবনেও তেমনি এ কথা সত্য। যে-জাতি অতীত-বিস্মৃত সে আত্ম-বিস্মৃতও বটে। যে ব্যক্তি-মানুষ অতীতের সংগে অচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ নয়, যার জীবনের মূল সুদৃঢ়ভাবে অতীতে গ্রথিত নয়, সে ব্যক্তি-মানুষ সহজেই আদর্শনৈতিক জীবনের ঝড়-ঝাপ্টায় উৎসাদিত হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনযাপনে অগ্রসর হবেন। ব্যক্তি-মানুষের জীবনে এই সংকট উত্তরণের জন্য অতীত-স্মরণের যে ঘনিষ্ঠতা সুভাষ-মানসে উদ্ভাসিত হয়েছিল, জাতির ইতিহাসেও সুভাষচন্দ্র সেই সুদৃঢ় বন্ধনের পারম্পর্যকেই বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই ব্যক্তি-জীবনে যেমন দ্বিধাহীন চিত্তে মাত্র আঠারো বছর বয়সে বলতে পেরেছিলেন "আমার জীবনের একটা definite mission আছে, তারই জন্য আমার শরীর ধারণ", তেমনি ভারতবর্ষ সম্পর্কেও গভীর প্রত্যয় নিয়ে বলতে পেরেছিলেন : "India has a mission to fulfil"— 'ভারতের একটি বাণী আছে।'

এদিক থেকে সুভাষচন্দ্র অনন্য এবং অদ্বিতীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো বিপ্লবী মহানায়ক তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং মাতৃভূমির অবদান সম্পর্কে এত দ্ব্যর্থহীন প্রত্যয় নিয়ে স্পর্ধিত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন কিনা সন্দেহ। দেশের ও জাতির ঐতিহ্য-চেতনা কারুর চোখে রক্ষণশীলতার লক্ষণরূপে চিহ্নিত, তাদের দিগন্ত সমকালেই সীমিত। ভারতবর্ষের দুই-তিন হাজার বছর অতীতের দিকে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্রের বুঝতে ভুল হয় নি, যে সেদিনকার পূর্বসূরীদের ধ্যান-ধারণার, চিন্তা-ভাবনার সংগে তাঁদের বর্তমান উত্তরসূরীদের ধ্যান-ধারণার চিন্তা-ভাবনার কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। তাই বার বার তাঁর মনে অনুরণিত হয়েছে অতীত ভারতের মৃত্যু হয় নাই। সে-ভারত আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে : "India of the past is not dead."

কিন্তু বর্তমান ভারতে প্রাচীন ভারতের ধারা সঞ্জীবিত ও সঞ্চারিত থাকলেও, প্রাচীনের কাঠামোতে ভারতবর্ষ প্রস্তরীভূত হওয়া তো দূরের কথা, ইতিহাসের গতিধারার সংগে নব নব চিন্তা, ভাবনা ও সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষ আত্মস্থ করে জাতীয় জীবনের রূপান্তর সাধন করেছে। তাই সময়ের অতিক্রমণের সংগে সংগে প্রাচীন ভারতের অতীত, বর্তমানের দ্বারপ্রান্তে পেঁছে নবীন ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নূতন বিশ্বে অনায়াসেই নূতন ভারত তার স্থান করে নিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত ও নবীন ভারতের এই সহজ সমন্বয় সুভাষ-মানসকে স্বকীয়তা দান করেছে, সুভাষ-মানসের উপাদানে যা 'ভারতীয়ত্ব'-র পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। কংগ্রেসের গণসংযোগে তিলকের অবদান সম্পর্কে চোদ্দ বছর পর বিলেত থেকে দেশে ফিরে এসে অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় "New Lamps for the old" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের তৃতীয় কিস্তিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে কংগ্রেস আদৌ কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, এই কারণে যে, এখানে ভারতের জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিদের স্থান নাই। কংগ্রেসের গণসংযোগে তিলকের অবদান সম্পর্কে অরবিন্দ লেখেন : "···Tilak used methods which Indianised the movement and brought it to the masses. To bring in the mass of the people is an indispensable condition for a great and powerful political awakening in India."

তিলক কংগ্রেসকে যে ভারতীয়ত্ব দান করেছেন গান্ধীজী তাঁকে ব্যাপকতর শক্তিমণ্ডে রূপান্তরিত করেছেন। সুভাষচন্দ্র ভারতীয়ত্বে সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর রাজনীতির প্রথম জীবনে গান্ধীজীর অনুগামী হয়েছেন। কিন্তু সেই অন্তহীন ভারতীয়ত্বে প্রত্যয়, সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজীর সংগে আদর্শবাদের সংঘাত থেকে বিরত করতে পারে নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস হতে পারে না, হিংসা-অহিংসার বিতর্কে স্বাধীনতার অন্তিম সংগ্রাম প্রতিহত হতে পারে না—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় মত। সুভাষচন্দ্র অহিংসাকে গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অপরূপ পদ্ধতিরূপে, যদিও এই পদ্ধতি যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কতটা সীমাবদ্ধ তা উপলব্ধি করেন তিনি রাজনীতি শুরু করবার পূর্বে আই. সি. এস. চাকুরি ত্যাগ করে দেশের মাটিতে পা দিয়েই, বোম্বাইতে গান্ধীজীর সংগে ১৯২১-এর

জুলাইতে আলোচনাকালে। গান্ধীজীর কাছে অহিংসা জীবনের একটি মৌলিক নীতিরূপে দেখা দিয়েছিল। আর সুভাষচন্দ্র শান্তিপূর্ণ অহিংসা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন দেশের পরিস্থিতি বিচারে, সীমাবদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এ-সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বহুপূর্বে ১৯১৪ সালে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অবস্থায় গুরু-সন্ধানে ব্যর্থ সুভাষ, ঘরে ফিরে টাইফয়েড রোগের আক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সময় শয্যাশায়ী অবস্থায় তার সকল ধারণার পুনর্বিচার করছিলেন। সুভাষচন্দ্র 'ভারত পথিক' গ্রন্থে এ-সময়কার মননের সংবাদ দিয়ে নিজেই বলছেন : "যদি ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সভ্য জাতিতে পরিণত হইতে হয় তাহা হইলে উহার মূল্য দিতেই হইবে এবং কোনও প্রকারেই তাহার পক্ষে দৈহিক বা সামরিক প্রশ্নটি এড়াইয়া যাওয়া চলিবে না। যাঁহারা দেশের মুক্তির জন্য কাজ করিবেন তাঁহাদিগকে সামরিক ও অসামরিক উভয়বিধ শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং উহার দ্বারা বৈদেশিক শাসন ও অধীনতামুক্ত পূর্ণ স্বরাজ বুঝায়। যুদ্ধ দেখাইয়া দিয়াছে যে, যে জাতির সামরিক শক্তি নাই, সে জাতি তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে এরূপ আশা করা যায় না।" তাই অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েও সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে চরম আঘাত দেবার বিকল্প কর্মপন্থাও তিনি সময়মত উত্থাপন করেছেন। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন সেই কর্মপন্থারই অন্তর্ভুক্ত। ১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তিনিই একমাত্র জাতীয় নেতা যাঁর পক্ষে গান্ধী-নেতৃত্বের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিকল্পরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপনের স্পর্ধা দেখিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দান সম্ভব হয়েছিল। ১৯১৪ সালে ভারতীয় সামরিক শক্তির যে-ভাবনা রোগশয্যায় সুভাষ-মানসে উদ্ভাসিত হয়েছিল, ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে সামরিক কায়দায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলবার মধ্য দিয়ে সে-ভাবধারা অবয়ব নেয়—এবং তা চূড়ান্ত রূপ পায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের জন্মলগ্নে। ১৯২৮-এর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের পাশাপাশি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে সেই অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে ভারতবর্ষকে দায়িত্ব নিতে হবে।

মাথা গুণতিতে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হলেও তাঁর নৈতিক জয় ছিল অবিসম্বাদী। আর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সুভাষচন্দ্র সেদিন গান্ধীজীর বিকল্প নেতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। গান্ধীজীর বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে সুভাষের প্রস্তাব বেশিদিন অগ্রাহ্য করা যাবে না। সুভাষচন্দ্রের বয়স সে-সময় একত্রিশ বছর। গান্ধীজীর বয়স তখন উনষাট বছর।

সুভাষ-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ, ভাষণ, বিবৃতি, আবেদন ইত্যাদি ১৯১৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ক্রম-অনুযায়ী সংকলিত হয়েছে। প্রেসে ছাপার কাজ আরম্ভ হবার পর আরো যে-সব এ-ধরনের উপাদান পাওয়া গেছে তা 'সংযোজন'-এ সংকলিত হয়েছে। 'রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি প্রকাশে 'আকর-তথ্য'রূপে সমসাময়িক ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বাংলায় ভাষণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা পত্রিকায় সে-সংবাদ প্রকাশিত হয় নি, হয়েছে ইংরেজী পত্রিকায়। এই-সব ক্ষেত্রে তথ্য সংকলনের জন্য ইংরেজী পত্রিকার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যেখানে ইংরেজী ও বাংলা—উভয় ভাষার পত্রিকাতেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে যে সংবাদ-পরিবেশনকে অপেক্ষাকৃত তথ্যনির্ভর মনে হয়েছে, সেগুলিই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিচার, বিশ্লেষণ এবং অনুবাদে তাঁদেরই সহায়তা নেওয়া হয়েছে— যাঁরা সুভাষচন্দ্রের ভাব-ভাবনা ও ভাষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত।

গ্রন্থের শেষে তথ্যপঞ্জী ও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ সবই সাধুভাষায় করা হয়েছে। পুরাতন বানান-রীতি পরিবর্তন ক'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত আধুনিক বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী খণ্ডগুলিতে কালানুক্রমে সুভাষচন্দ্রের সমগ্র ভাষণ, অভিভাষণ, বিবৃতি, আবেদন ইত্যাদি প্রকাশের পর অন্যান্য উপাদান সংকলিত হবে।

এই রচনাবলীর উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সভাপতি ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, এবং শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ এম. পি., অধ্যাপক সমর গুহ এম. পি., ড. অশোকনাথ বসু প্রমুখ অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শ এবং নিরবচ্ছিন্ন

সহযোগিতা 'সুভাষ-রচনাবলী' প্রকাশের পথে অনেক বিঘ্ন দূর করতে সহায়তা করেছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের বিঘ্ন দূর করতে আর যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীঅজিত রায় মুখার্জি, শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, শ্রীঅমিয়নাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীসুব্রত বসুর নাম উল্লেখ করতে হয়।

এই গ্রন্থ সংকলনে অনুবাদের বহুল দায়িত্ব নিয়ে ও সম্পাদনার কাজে নানা পরামর্শ দিয়ে বাংলায় একমাত্র সুভাষ-জীবনীকার শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ আমাদের অপরিসীম সাহায্য করেছেন। অনুবাদের কাজে শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবদাস জোয়ারদার ও শ্রীঅজিত দাসও সাহায্য করেছেন। শ্রীশিবব্রত ঘোষের কাছ থেকে সংকলনের নানাবিধ কাজে সব সময়ই আমরা সহায়তা পেয়েছি। মুদ্রণ ও প্রকাশনার নানা কাজে দৈনন্দিনের সহায়ক ছিলেন শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। যে-সব নীরব কর্মী দীর্ঘদিন যাবৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই রচনাবলী প্রকাশে সাহায্য করে চলেছেন তাঁদের অন্যতম শ্রীরমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকা বিভাগের কর্মীগণের সাহায্যের জন্যও আমরা ঋণী। এ-ছাড়া মুদ্রণ-সৌকর্য ও ব্লক তৈয়ারিতে সহায়তা করেছেন শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়। এই গ্রন্থ প্রকাশনায় ও তার সুষ্ঠু প্রচারে শ্রীশেখর দাশগুপ্তের অক্লান্ত প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করে প্রচ্ছদ ও পুস্তানি রচনার দ্বারা গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন।

'দৈনিক বাঙলার কথা'র প্রথম সংখ্যার আলোকচিত্র নেবার সুযোগ দিয়ে অধ্যাপক শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু আমাদের সাহায্য করেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট-এর সম্পাদক শ্রীসমরেশ চক্রবর্তী এবং 'দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রসেস'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীনীরদবরণ মুখার্জি যথাক্রমে সুভাষচন্দ্রের ছবি ও ব্লক-এর ব্যবস্থা ক'রে আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন।

'সুভাষ-রচনাবলী' প্রকাশে যার উদ্যোগ সব চাইতে বেশি এবং যার অক্লান্ত সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থের সুষ্ঠু সম্পাদনা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ, আমাদের সেই অতি কাছের মানুষ স্নেহভাজন শ্রীবিজয়কুমার নাগের অনুল্লেখে এই মুখবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এ-ছাড়াও এমন অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও সহযাত্রী রয়েছেন যাঁরা অন্তরালে থেকে আমাদের এই শুভপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছেন, অথবা বাধা-বিপত্তির মুখে সদরে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই অনুক্তনাম সুহৃদ্‌দেরও 'সুভাষ-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আনন্দচিত্তে স্মরণ করছি। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এবং নানাজনের আন্তরিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হ'ল। তবুও এ-কাজের সুষ্ঠুসম্পাদনার জন্য সুভাষ-অনুরাগী সর্বসাধারণের নিকট আমাদের আবেদন রইল, সুভাষচন্দ্র-প্রসঙ্গে যে-কোনোপ্রকার তথ্য আমাদের সরবরাহ করলে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। ইতি

১ বৈশাখ ১৩৮৫ সুনীল দাস

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

সুভাষ-রচনাবলী

১৯১৬ - ১৯২৮

প্রেসিডেন্সি কলেজের গণ্ডগোল : যথাযথ বিবরণ

সোমবার* হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ৮-১০ জন প্রাক্তন ছাত্র, যাঁরা বর্তমানে তৃতীয় বার্ষিক বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সভা বেলা প্রায় ১২টা ১৫ মিনিটে সমাপ্ত হইবার পর উপরোক্ত ছাত্রগণ ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পূর্বেই তাঁহাদের জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ইংরাজীর অধ্যাপক আর. এন. ঘোষ (বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্যন্ত) ইংরাজী ক্লাস সেদিন লইবেন না। কিন্তু ফিরিবার পথে স্টুয়ার্ডের সহিত দেখা হইলে তিনি ঐ ছাত্রদের জানাইয়া দেন যে মিঃ ঘোষ কলেজে উপস্থিত আছেন এবং সম্ভবত তাঁহার নির্দিষ্ট ক্লাস লইবেন। সে সময় যে ঘরে মিঃ ওটেন ক্লাস লইতেছিলেন তারই সংলগ্ন যাতায়াতের পথ দিয়া ঐ ছাত্রবৃন্দ অগ্রসর হইলে, মিঃ ওটেন ক্লাস হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিলেন এবং দুই-একজনের হাত ধরিয়া অপমানজনক ভাবে তাঁহাদের স্থানত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন। ছাত্রবৃন্দ অধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ জানাইবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সংযতভাবে স্থানত্যাগ করিলেন। এই অবসরে ছাত্রবৃন্দ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ক্লাসে সমবেত হইয়াছেন। বেলা ১২টা ২৫ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিলে পথে মিঃ ওটেনের সহিত তাহাদের দেখা হইল, বেলা ১টার পূর্বে ক্লাস হইতে বাহির হইলে পাঁচটাকা হারে জরিমানার ভয় দেখাইয়া তিনি আবার অসম্মানজনকভাবে ছাত্রদের ক্লাসে ফেরত পাঠাইলেন। যদিও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে তাঁহাদের উদ্দেশ্য জানাইয়া কোনোরকম গোলমাল না করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বেলা ১২টা ২৫ মিনিটের কিছুক্ষণ পূর্বে অধ্যাপক ঘোষ ক্লাসে আসিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস ছুটি দিলেন। মিঃ ওটেনের ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও অধ্যাপক ঘোষের অনুমতিক্রমে নীচে যাইতে পারে কিনা, ছাত্রবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যাইবার পথে মিঃ ওটেনের সহিত ছাত্রবৃন্দের দেখা হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে জানান যে ক্লাস ছুটি হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা কোনোরূপ শব্দ করিবেন না। ইহা সত্ত্বেও মিঃ ওটেন তাঁহাদের ক্লাসে ফিরিয়া বেলা ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার হুকুম দিলেন এবং এই মৌখিক অপমানের

* ১০ জানুয়ারি ১৯১৬

সহিত শারীরিক বলপ্রয়োগ যুক্ত করিয়া অসম্মানের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। ছাত্ররা ফিরিয়া গেলেন। বেলা ১টায় মিঃ ওটেন তাঁহাদের নিকট গিয়া আরো ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বলেন যে একজন অধ্যাপক ছাত্রদের জরিমানা করিবার ক্ষমতার অধিকারীও বটে। এই ক্ষমতা যে এতদিন প্রয়োগ করা হয় নাই, তাহাই মিঃ ওটেনের নিকট দুঃখের এবং অতঃপর এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা হইবে। ছাত্রবৃন্দ অধ্যক্ষের নিকট সেদিন এক অভিযোগপত্র পেশ করিলে অধ্যক্ষ ক্ষুব্ধ ছাত্রদের কয়েকজনের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া অভিযোগ-পত্রটি প্রত্যাহার করিয়া মিঃ ওটেনের সহিত বিষয়টি মিটাইয়া ফেলিতে বলিলেন। মাত্র তিনজন ছাত্র তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিযোগের বিষয়ে মিঃ ওটেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন, কিন্তু ক্লাসের সকল ছাত্রবৃন্দ মিঃ ওটেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলেন। পরদিন মিঃ ওটেনের সহিত ঐ তিনজন ছাত্র সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেও তিনি অনিবার্য কারণে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ক্লাসের সকল ছাত্রবৃন্দ তাঁহাদের অভিযোগের কোনো প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া রহিলেন এবং এই অসন্তোষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়া এত ব্যাপক আকার ধারণ করিল যে কলেজের সকল ছাত্র সমবেতভাবে তাঁহাদের অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ক্লাসে হাজির হইতে অস্বীকৃত হইলেন। এইভাবে দুইদিন ছাত্রদের ধর্মঘট পরিচালিত হইবার পর মিঃ ওটেন তৃতীয় দিন ছাত্রদের সহিত আলোচনায় বসিয়া এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ছেদ টানিলেন।

ভাষণ

৯ আগস্ট ১৯২২ বাগবাগান স্ট্রীটে কলিকাতা বিদ্যাপীঠে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তি উপলক্ষে সহকারী অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ কর্তৃক অভ্যর্থনার উত্তর।

বন্ধুগণ ও ছাত্রভাইয়েরা,

আমি এমন কিছু করি নি যার জন্য আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করতে পারেন। আমি যে আজ দেশ-মাতৃকার আহ্বানে আমার সামান্য শক্তি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি— তার উৎসাহ প্রেরণা ও সহায়তা জুগিয়েছেন আপনারা। দেশের জন্য কারাবাস আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করি। দেশবন্ধু বলেন— আমরা দেশের বিরাট কারাগারে সকলেই বন্দী হয়ে আছি— কাজেই ইংরেজের কারাগার অতি সামান্য সীমাবদ্ধ স্থান—। আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি আপনারাও করেন যে— আমাদের সম্মুখে যে ভীষণ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছে— তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি— এবং আমাদের নেতার আদেশ পেলেই আমরা কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ছাত্রবৃন্দের কাছে আমার কৈফিয়ত দিবার আছে। যদিও আমরা জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যাপীঠ ও সর্ববিদ্যায়তন স্থাপন করেছিলাম— তবু এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা যে সংকটকালের মধ্য দিয়ে চলেছি— সে কালের আহ্বান আসে আচম্বিতে— এবং নূতন ঘটনার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমাদের পরিকল্পিত গঠনকার্যেরও ব্যাঘাত ঘটে। তার জন্য আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনারা এই স্বল্পকালের মধ্যেও যদি জাতীয় শিক্ষার আদর্শের কিছুটা আভাসও পেয়ে থাকেন— তা হলে বুঝব আমাদের যৎসামান্য চেষ্টাও বিফলে যায় নি।...

বন্যা-প্রপীড়িত উত্তরবঙ্গের বিবরণ

১

বন্যার বেগে অনেক গ্রাম একেবারে গৃহশূন্য হইয়া গিয়াছে। যে-সব গ্রামে উচ্চভূমিতে দুই-একখানা ঘর কোনোরকমে বাঁচিয়া গিয়াছে, সেখানে সমস্ত লোক আশ্রয় লইয়াছে। যদি কোনোপ্রকারে একবার সংক্রামক রোগ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সমস্ত গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে। কুসুম্বী গ্রামে ১০০ খানা ঘর ছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ৩ খানা এবং তালসুন নামক বর্ধিষ্ণু গ্রামের ২০০ ঘরের মধ্যে মাত্র ২০ খানা বর্তমান। ঘরের দেওয়াল ধসিয়া পড়িয়া অনেক গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে। মরা গোরুর পচা গন্ধে তালসুন গ্রামে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আদমদীঘি কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কত লোক যে মারা গিয়াছে, এতদিন পরে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

গ্রামের লোক সবাই বলিতেছে, রেল কোম্পানিই বর্তমান বন্যার জন্য দায়ী। কারণ রেল রাস্তার জল নিকাশের উপযুক্ত পুল ও প্রণালীর অভাব। ফলে ১৯১৮-২২ সনের মধ্যে তিনবার বন্যা হইয়া গেল। সম্প্রতি প্রস্তাব হইতেছে যে, রেলপথটিকে আরো ২/৩ ফুট উঁচু করা হইবে। যদি তাই হয় তাহা হইলে এ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাইবে।

৬ অক্টোবর ১৯২২

২

প্রত্যেক স্থানে আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, বন্যার জলে ডুবিয়া কিম্বা ভাসিয়া গিয়া অনেক লোক মারা গিয়াছে। ঘটনার সাত-আট দিন পরে আমরা আসিয়াছি। সুতরাং সমস্ত লোকের শবদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ : ১. আদমদীঘি থানার অন্তর্গত তালসুন গ্রামের নিকট নদী পার হইবার সময় জানুপদ এবং তাহার ছয় বৎসরের কন্যা ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ২. তালসুনে যাইবার সময় কলার ভেলার উপর হইতে হলধর চক্রবর্তী ডুবিয়া মারা গিয়াছে। ৩. গৃহের দেওয়াল চাপা-পড়িয়া বাগবাড়ির অধিবাসী কুসীর ফকির, তাহার স্ত্রী এবং ৪ বৎসরের কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

৪. ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখ শান্তাহার গ্রামের দীনু মণ্ডল এবং তাহার পুত্র দেওয়াল চাপা পড়িয়া মারা পড়িয়াছে। ৫. দেওয়াল চাপা পড়িয়া তালসুন গ্রামের মথুরা পালের ২২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ৬. শান্তাহারের রেল লাইনের নিকট পাছা গ্রামের ঝুমুর ফকির ডুবিয়া যায়। পরে কুসুম্বীর নিকট তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। ৭. ঘরচাপা পড়িয়া ধেলকান্দার একজন পাগল মারা পড়িয়াছে। সে পাগল বলিয়া ঐ ঘরে আবদ্ধ ছিল। ৮. কুন্দগ্রামের একটি বালক ঘরচাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ৯. ঠাণ্ডায় চৈতন্যশূন্য হইয়া আদমদীঘির খোলসা মণ্ডলের ৫ বৎসরের কন্যা মারা পড়িয়াছে। ১০. একই কারণে বাঁশিখোড়ায় প্রসন্ন চাণ্ডালের ৫ বৎসরের পুত্র; ১১. ভাইয়া গ্রামের নিকুচা মণ্ডলের ২২ বৎসরের কন্যা; ১২. উক্ত গ্রামের হাফিন পরামাণিকের ৬ বৎসরের পুত্র এবং ১৩. রুদ্র পরামাণিকের ২ বৎসরের পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১৪. আদমদীঘির সন্নিকটস্থ নিমাইদীঘির নিকট একটি ১৫ বৎসরের বালকের শবদেহ পাওয়া গিয়াছে। ১৫. ২৯ তারিখ শান্তাহার স্টেশনের নিকট একটি ৬ বৎসরের বালকের মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

৭ অক্টোবর ১৯২২

বন্যার শোচনীয় ফল : খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা

সুভাষচন্দ্র জানাইতেছেন—"২৪ অক্টোবর আমি জানিতে পারিলাম যে, মহাদেবপুর থানার ইন্দাই গ্রামে একটি লোক খাদ্যাভাব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।...

"মৃত শুকনাশ্য একজন নিঃস্ব গরীব ছিল। সে মজুর খাটিয়া দিন গুজরান করিত। ইহা ব্যতীত তাহার জীবিকার আর কোনো উপায় ছিল না। গত বন্যায় সে গৃহহীন হইয়া পড়ে এবং পেটের অন্নের সংস্থান করিবার কোনো উপায় তাহার রহিল না। তাহার স্ত্রীও ধান ভানিয়া দিন গুজরানের অনেকটা জোগাড় করিত। উভয়ই উপায়হীন হইয়া পড়িল। তাহাদিগের সংসারে ছয় জন লোক। ইহাদিগের খাদ্য জোগাড় করা দায় হইয়া উঠিল। অবশেষে নিরাশাতাড়িত হইয়া সে গত ১৯ অক্টোবর উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিল। এই ঘটনা সত্য, সে-বিষয়ে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ রজনীবাবু ও জিতেন-বাবুর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন--১. শ্রীযুত দুর্গাশংকর শর্মা মজুমদার। ইঁহার বয়স প্রায় ৫৬ বৎসর এবং ইনি ইন্দাইয়ের জমিদার। ২. মৃত শুকনাশ্য-এর ৩৮ বৎসর বয়স্ক শ্যালক পালামৌনাশ্য। ৩. মৃত শুকনাশ্যের ৩০ বৎসর বয়স্কা পত্নী মোরুম বেওয়া। ৪. ইনায়াৎপুর নিবাসী জমিদার ও উকিল শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ খান, এম. এ., বি. এল.। ৫. ইনায়াৎপুরের জমিদার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী। ৬. ইনায়াৎপুরের সহকারী পঞ্চায়েৎ শ্রীযুত হেমচন্দ্র বক্সী। ৭. ইন্দাইয়ের চৌকিদার নিজে। এই চৌকিদার শুকনাশ্যের মৃত্যু সম্বন্ধে মহাদেবপুর থানায় যে রিপোর্ট দিয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। থানা হইতে আদিষ্ট হইয়া সহকারী পঞ্চায়েৎ শ্রীযুত হেমচন্দ্র বক্সী এই সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাও আমার নিকট আছে! শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ এবং রজনীমোহন যে-সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে-সকল সাক্ষ্যপত্র আমার নিকট আছে। এই সাক্ষ্যপত্রে সাক্ষীদের নাম ও বৃদ্ধাংগুষ্ঠের মোহর দেওয়া আছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, এই সাক্ষ্যপত্র দেখিতে পারেন। এই-সকল সাক্ষ্য হইতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হতভাগ্য স্ত্রী-পুত্রের অনাহার দৃশ্য সহ্য করিবার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। ২৩ অক্টোবর সর্বপ্রথম এই স্থানে সাহায্য প্রেরণ করা হয়। এখন সমগ্র স্থানেই সাহায্য বিতরিত হইতেছে।"

১৮ নভেম্বর ১৯২২

তরুণের আহ্বান

ডিসেম্বর ১৯২২, আর্য সমাজ হলে নিখিল বঙ্গ যুব সম্মিলনীর অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

শ্রদ্ধাস্পদ ভদ্রমণ্ডলী ও প্রীতিভাজন তরুণ বন্ধুগণ—

আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আমি আপনাদের সাদর সম্বর্ধনা জানাবার সুযোগ পেয়েছি। আমার এই সৌভাগ্য সম্ভাবনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে, সেটা এই যে আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার অনাচারের মধ্যে— সবার উপর মনুষ্যত্বের পদে পদে অপমানের মধ্যে। এই তো আমাদের সাধনার ক্ষেত্র, এখানে মাধুর্য কিছু নাই, কিন্তু সৌন্দর্য আছে, এইখানে নিষ্ঠুর দুঃসহ আবির্ভাবের মধ্যে আমাদের যোগসাধনার জন্য দাঁড়াতে হবে। আনন্দ এই যে এখানে ভোলাবার কিছু নেই, অপরিসীম রিক্ততা আর অপরিমেয় ত্যাগের মধ্যে আমাদের নিজের পথ নিজে করে নিতে হবে— পশুশক্তির সাধনায় নয়, কাপুরুষের ভেদনীতিতে নয়— এখানে সমাহিত আত্মসাধনার দ্বারা, সর্বস্পৃহাশূন্য পুণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা, নরনারায়ণের নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মুহ্যমান জাতির উদ্বোধন করতে হবে।

তাই বলছিলাম এত বড়ো দুশ্চর্য সাধনায় আপনাদের আহ্বান করবার সুযোগ যে আমি পেয়েছি— এ আমার পরম সৌভাগ্য, আর আমার পরম আনন্দের কথা এই যে— আমি এই কঠিন তপস্যার জন্য সত্যের পথে আহ্বান করছি— বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে। আমি আজ দেহে, মনে, আদর্শে ও উদ্দেশ্যে এক হয়ে তাদের কাছে আমার প্রীতির অর্ঘ্য উপহার দিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলি— হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো যুগে যুগে, দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে এসেছ, মুক্তিপথের নিশানধারী তোমরাই তো চিরদিন অগ্রগামী হয়ে পথ দেখিয়ে এসেছ। তোমরা যে জেগেছ, অলস বিলাস পরিহার করে তোমরা যে আজ আত্মভোলা হয়ে পথে চলবার জন্য দাঁড়িয়েছ তা আমি জানি— জানি বলেই তো তোমাদের আহ্বান করার সাহস আমার হয়েছে।

প্রলয়ের ঝড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, বর্ষার দুর্যোগকে মাথায় করেও আমরা সমান দাঁড়িয়ে আছি। সুযোগ যখন এসেছে, ভাগ্য-বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছেন, তখন তো আর বসে বসে তর্কযুদ্ধ করে জাতির লজ্জা, দেশের দৈন্য, মনুষ্যত্বের অপমানকে দিন দিন বাড়ালে চলবে না।

চেয়ে দেখো, যেখানে আমাদের সত্যকার দেশ, যেখানে আমাদের জীবনের আশা, ভরসা, উৎসাহ, মান, সম্পদ, সেখানে আমরা নাই। সেখানে—

"গভীর আঁধার ঘেরা চারিধার নিঝুম দিবস রাতি,
বুকের আড়ালে মিটি মিটি জ্বলে তৈলবিহীন বাতি।
গম ধরে আছে পাতাটি কাঁপে না, ছম্ ছম্ করে দেহ,
দেবতাবিহীন দেবালয় আজ, জনহীন সব গেহ।
মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য—রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্মম।"

তাই আমাদের দেশের বেদনাময়ী মাতৃমূর্তি নয়নজলে ছিন্ন অঞ্চল ভিজিয়ে আমাদেরই আশায় বসে আছেন।

যেখানে জীবনের লীলাখেলার আনন্দের লুঠ হত, যেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উৎসগুলি প্রাচুর্যে আমাদের ভাণ্ডারে উপচে পড়ত, যেখানে জলে সুধা, ফলে অমৃত, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত প্রাণদায়িনী শক্তি ছিল—সেখানে আজ বিরাট শ্মশান খাঁ খাঁ করছে— প্রেতের ছায়া দেখে অর্ধমৃত প্রাণ শিউরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ চুলি দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে— এক বিন্দু জল নাই, এতটুকু জীবন নাই।

তোমরা জাগো ভাই, মায়ের পুজোর শঙ্খ বেজেছে, আর তোমরা তুচ্ছ দীনতা নিয়ে ঘরের কোণে বসে থেকো না।

এমন সুন্দর দেশ, এমন আলো, এমন বাতাস, এমন গান, এমন প্রাণ, আজ মা সত্যই বুঝি ডেকেছেন। ভাই, একবার ধ্যাননেত্রে চেয়ে দেখো, চারি দিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। কী বিরাট! কী মহিমাময়!

শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়বিধায়িনী সর্বাণী, সদা হাস্যময়ী, সেই তো আমার জননী। শারদ জ্যোৎস্নামৌলি মালিনী, শরদিন্দু নিভাননা, অসুর-দর্প-খর্ব-কারিণী,

মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ময়ী আজ আমাদের হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তরাগরঞ্জিত পা দু'খানি রেখে বলছেন—"মা ভৈঃ—জাগৃহি।"

জাগো মায়ের সন্তান, দূর করো তোমাদের বৃথা তর্ক, ধার করা কথার মালা, ধূলায় ছুড়ে ফেলে দাও তোমাদের বিলাস ব্যসন, মুছে ফেলো তোমাদের ললাট হতে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ঐ দাসত্ব-কালিমার রেখা।

নবীন সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টিশক্তির প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সমস্ত উন্মাদনা সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ছোটো নই আমরা বড়ো, নইলে সমস্ত ম্রিয়মাণ ধ্বংসোন্মুখ উপাদানের উপর এই নব সৃষ্টির দুরূহ ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন কেন?

মনুষ্যজীবনের পরম সার্থকতা সৃষ্টির আনন্দে। আমরা আজ সেই সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব।

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহংকারের জন্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বের আত্মম্ভরী জ্ঞান হইতে নয়— আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করব, তা শুধু নিজেদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য, আত্মবিস্মৃত পুরুষ-সিংহের জাগরণের জন্য মথিত নর-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য। অনাদি কাল হতে ভারতবর্ষের যে মহান্ আদর্শ পরসেবাব্রতে প্রারব্ধ হয়েছে, তা এই সেবাব্রতেই উদ্‌যাপিত হয়ে আমাদের সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে।

আমি জানি এই দুর্দিনে আমাদের এই সাধনা কঠোর, অতি ভয়ংকর—

"পিছনে উঠিছে ঝড়, সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নামমাত্র পথরেখা, তাও আজ হয়েছে নির্জন,
চরণ চলে না আর, দেহলতা কাঁপে থর থর,
কণ্টকে সংকট পথ, চোখ দু'টি জলে ভর ভর।
তবু যে গো যেতে হবে, থেমে থাকা মরণের দায়,
কেন মিছে থেমে যাও, হে পথিক, ঘরের মায়ায়?
সর্বহারা মহাপ্রাণ, তাহারে কে রাখে বন্ধ করে,
আলোর ইশারা আসে, প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে।

মৃতদেহ আগুলিয়া, সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে, এক বিন্দু অমৃতের দান।”

এই অমৃতের দানের আশায় আমরা থাকব, নিশ্চেষ্ট হয়ে নয়, অদৃষ্টবাদীর মতো নয়, দুর্বল পরমুখাপেক্ষীর মতো নয়— আমরা আমাদের স্বাধীন, আত্মস্বতন্ত্র কর্মঠ শত শত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকব। সমগ্র বাংলায় এইরূপ অসংখ্য কর্মকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। যেখানে কোনো কর্মকেন্দ্র নাই, সেখানে উৎসাহী কর্মীদলকে সংঘবদ্ধ করে নূতন কর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যে-সকল স্থানে কর্মকেন্দ্র পূর্ব হতে জাগ্রত অথবা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে সে-সবগুলিকে বর্তমানের কর্মোপযোগী করে, নূতন প্রেরণা দিয়ে, নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত করে, একটা বিরাট কর্মকেন্দ্রের অঙ্গীভূত করতে হবে। আমাদের আদর্শ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে নানাভাবে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত সকল কর্মকেন্দ্রের মধ্যে একই দুর্লঙ্ঘ্য অনিবার্য শক্তি আমাদের সমস্ত কর্মসাধনাকে সেই একই পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এইরূপে আমরা ‘এক’ হইতে ‘বহুতে’ এবং ‘বহু’ হইতে ‘একের’ মধ্যে একটা সহজ, সরল স্বাভাবিক সংযোগের সৃষ্টি করে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্রকে আন্তরিক ঔদার্যের দ্বারা সর্বজনগ্রাহ্য এবং সকলের পক্ষে সুলভ করে আমাদের কর্মবাহুল্যের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বিধান করতে পারব।

সেখানে রাজনীতিক মতদ্বৈধের কোনো স্থান থাকবে না, সমাজপদ্ধতির কোনো বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানকে গোঁড়ামির দ্বারা বড়ো করে দেখা হবে না, বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্য কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না— সেখানে সমস্ত দেশবাসী জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই আদর্শ অনুসরণ করে, একই লক্ষ্যে, একই পথে আপন আপন মনুষ্যত্বকে পাথেয় রূপে গ্রহণ করে আমরণ চলতে থাকবে।

জনশিক্ষার বহুল প্রচার দ্বারা দেশের আত্মমর্যাদাবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে হবে। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করে তাকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসোন্মুখ পল্লীসমূহের সংস্কার দ্বারা দেশের লুপ্ত সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই-সব বিভিন্ন কর্মের ভার আমাদের কর্মকেন্দ্রগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কর্মকেন্দ্র ক্ষুদ্রই হউক আর বিরাটই হউক, যেখানে সহকর্মীরা

সহায়তা, সমানুভূতি ও কর্মকুশলতার অভাব, সেখানে কোনো কাজে সাফল্য লাভ করা যায় না। যেখানে সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, হাসিকান্নার অংশ হিসাব আছে, সেখানে সাহচর্য অযাচিত ভাবে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সকল কর্ম সফলতার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কাজে সাধারণের হৃদয় বিনিয়োগ হয়, তা অসাধ্য হলেও সমবেত ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার বলে সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। আন্তরিকতাবিহীন অনুষ্ঠান বিধাতার অভিশাপে দুষ্ট— কাজেই আত্মনাম-ঘোষণার চেষ্টার মধ্যে কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কাজের মধ্যে সার্থকতা নাই। তাই বলি, আমাদের হৃদয় দিয়ে কাজ করতে হবে, 'ছুৎমার্গ' পরিহার করে অস্পৃশ্যতা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার বলে আলিঙ্গন করতে হবে। মনকে ফাঁকি দিলে চলবে না, বিবেকের গলা টিপে ধরলে কুকর্ম আরো জোর গলায় প্রচারিত হবে।

অন্তর থেকে যে কর্ম-শক্তি আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করবে, যে নৈতিক বল আমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত করবে সেই শক্তি, সেই বলকে আহুতির অগ্নির মতো চিরন্তনের জন্য উদ্দীপ্ত রাখতে হবে।—আশা চাই, উৎসাহ চাই, সহানুভূতি চাই, প্রেম চাই, অনুকম্পা চাই— সবার উপরে মানুষ হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠাই আমাদের সাধনা— জীবনব্যাপী এই সাধনার মধ্যে আমাদের মুক্তি— নান্যঃ পন্থা।

মিলনের এই পুণ্য দিনে, এই কল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানকল্পে, প্রারম্ভেই আমি আপনাদের আহ্বান করছি। এ আহ্বান তাঁর, যিনি আমাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী, বর্ষের পর বর্ষ, দিনের পর দিন, আহ্বান করেছেন— ভোগ থেকে বিরত হয়ে ত্যাগ করবার জন্য, অবসাদ থেকে জেগে উঠে কর্ম করবার জন্য, বিস্মৃতিকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের জাতির ইতিহাস-লব্ধ আত্মাকে অনুভব করবার জন্য। নরনারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করবার নয়। রোগে যারা অবসন্ন, দারিদ্র্যে, নির্যাতনে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি— সে আদেশ আজ দেশের কানে পৌঁচেছে, তাই আজ আমাদের নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন— ভোগবিলাস ও আরামের মাঝখানে নয়—যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে নির্যাতন, যেখানে অপমান—সেখানে গিয়ে আজ তাঁকে পূজা করতে হবে। পুরাতন পুঁথি-পড়া মন্ত্র আওড়ালে চলবে না, আশার গান গেয়ে তাকে শুনাতে হবে— যে আশার গানে রোগী বিছানা থেকে বল পেয়ে উঠে দাঁড়াবে, ঋণ-ভার-জর্জরিত

কৃষক সাহস করে কাঁধে লাঙ্গল তুলবে, অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবর্ষসঞ্চিত দুঃখের গুরুভার লাঘব হয়েছে বলে মনে করবে।

আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সংগীতের আনন্দধ্বনি আসছে, আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। এ কী উৎসাহ। এ কী আনন্দ। আমার মনে হয় এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোন্ ওপার থেকে আনন্দে এক সোনার সুতায় কাটনা কেটে আসছেন—যা আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিক-মিকিয়ে উঠছে—ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দস্রোতে ভেসে চলেছে, আবার সেই সোনার সুতাই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙা রাখী হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, বার্ধক্যের সঙ্গে যৌবনকে, কর্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পুণ্য দিনের ভরসার কিরণ-সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন, যিনি ওপারে, দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন— এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের সুবর্ণসূত্রের সৃষ্টি করছেন—তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়— জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ করব।

অগ্রহায়ণ ১৩২৯

দলের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য

২ মে ১৯২৩ হরিশ পার্কের সভায় ভাষণ

সুভাষচন্দ্র বলেন, "কলিকাতার কোনো কোনো সংবাদপত্র লিখিতেছে। গয়া কংগ্রেসের কর্মসূচী পুরাপুরি গ্রহণ করিতে না পারিলে 'কংগ্রেস ত্যাগ কর'। এই কথা বলিবার স্বপক্ষে তাহাদের যুক্তিটা কি? তিনি নিজেও এই ধারণা লইয়াই কংগ্রেস-নীতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে স্বরাজলাভের জন্য শান্তি-পূর্ণ ও আইনসম্মত পথে বিশ্বাস থাকিলে কংগ্রেসের সদস্যপদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সুতরাং যাহারা কংগ্রেস-নীতিতে অবিচল আছেন, অথচ কংগ্রেসের কর্মসূচী পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাহাদেরই বা কংগ্রেস ত্যাগ করিবার কথা উঠিবে কেন? কংগ্রেসকেও যথাসম্ভব উদার হইতে হইবে। যাহারা সময়ে অসময়ে মহাত্মাগান্ধীর উদ্ধৃতি দেন, তাঁহারা কি গান্ধীজির মতামত জানেন? গান্ধীজি নিজেই বলিয়াছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সদস্যদের নিকট গ্রহণীয় না হইলেও, কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণের স্বাধীনতা সংখ্যালঘু সদস্যদের রহিয়াছে। কিন্তু তাহা কংগ্রেসের নামে অনুসরণ করা যাইবে না। সেজন্য সংখ্যালঘুদের কংগ্রেস ত্যাগে সংখ্যাগরিষ্ঠরা বাধ্য করিতে পারিবে না। ৩০শে এপ্রিলের পর দেশে আইন অমান্য শুরু হইবে। এ কথা কোনো নেতাই বিশ্বাস করেন না। যশোহর কনফারেন্সে দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাছাই-এর এবং সেইজন্য দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব পাস করিয়া দলের ও জনসাধারণের সহিত প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে। এই কারণেই তিনি ঐ প্রস্তাবের একটি সংশোধনী আনিয়াছিলেন। সেই সংশোধনীর বক্তব্য ছিল জনবল ও অর্থবল সংগ্রহ করিয়া গঠনমূলক কাজে লাগাইতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সংশোধনীটি অবৈধ ঘোষণা করিয়া বাতিল করা হয়। সংশোধনীটি গৃহীত হইলে সকলেই একযোগে কর্মসূচীটিকে কেন্দ্র করিয়া কাজে নামিতে পারিতেন। কাজে কোনো অগ্রগতি না দেখা গেলে কর্মসূচীতে আস্থার অভাব প্রমাণিত হইত। সে-অবস্থায় তাঁহাদের কর্তব্য কি? জনসাধারণ সাড়া দিল কি না দিল, সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহারা কি গোঁড়ামনোভাব লইয়া নীতি-বিশেষকে আঁকড়াইয়া থাকিবেন? জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক কোনো কর্মসূচী ছকিবার সময় আসিয়াছে এবং সংগ্রামী কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। পরিশেষে তিনি বলেন যে শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠন করা, গঠনমূলক কার্য পরিচালনা করা এবং আমলাতন্ত্রের প্রতিটি ঘাঁটি আক্রমণ করা আমাদের বর্তমান কর্তব্য।"

গান্ধী-পুণ্যাহ

১

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মির্জাপুর পার্কে অনুষ্ঠিত গান্ধী-পুণ্যাহ উপলক্ষে ভাষণ।

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙালী জাতি ইংরাজের ভারত-প্রবেশের সাহায্য করিয়াছিল আজ সেই বাঙালী জাতিই ইংরাজের নিকাশের বন্দোবস্ত করিবে। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফরাসী দেশেও ঠিক এইরূপ ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট একটি পতাকার উদ্ভব হইয়াছিল। আমি আশা করি অন্যান্য দেশের মতো বাঙালী তরুণেরাও ভারতের জাতীয় সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

১৯ জুলাই ১৯২৩

২

২৩ আগস্ট ১৯২৩ সপ্তদশ গান্ধী-পুণ্যাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হাওড়া টাউন হলে প্রদত্ত ভাষণ।

সুভাষচন্দ্র বলেন, কংগ্রেসের এবং অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে স্তব্ধতা নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ নহে, ইহা প্রত্যাসন্ন মহতী সংগ্রামের সংকেত মাত্র। শ্রমিকদের সংগঠিত করিবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়ত্ব রহিয়াছে এবং এই দিক হইতে হাওড়াই সর্বোত্তম এলাকা। এই স্থানের জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দিন-মজুর এবং ইহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে না পারিলে দেশের পরিত্রাণ নাই। দুই বৎসর পূর্বে হাওড়ার এই-সকল শ্রমিকেরা পূর্ব-দিনের গুলিচালনা অগ্রাহ্য করিয়া পরদিনই দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিলে তাঁহার মন গভীর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। সেই সময় এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গৃহে তাঁত ও চরকা চালু ছিল কিন্তু বর্তমানে এই-সকল তাঁত ও চরকা কী অবস্থায় রহিয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। অতঃপর পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী জাতীয় আদর্শে যথাসম্ভব ত্যাগ করিতে হাওড়ার জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

কাউন্সিল নির্বাচনে প্রচার-অভিযান

১৩ অক্টোবর ১৯২৩ কাউন্সেল নির্বাচন আলোচনার জন্য স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক শ্যাম স্কোয়ারে আহূত জনসভায় ভাষণ।

সুভাষচন্দ্র বলেন, "গয়া কংগ্রেসের পর ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রে স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে সমালোচনা দেখিয়া তিনি সঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ? কিন্তু দিল্লী কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য সঠিক পথেই তাঁহারা (স্বরাজ্য পার্টি) অগ্রসর হইতেছেন।

দিল্লী কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরই বাংলার সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, এই ধরনের গ্রেপ্তার বাংলাদেশের পক্ষে কোনো নূতন ঘটনা নহে। যাঁহারা কংগ্রেসের কাজে যোগদান করিয়াছেন, জেলে যাইতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই কাজে নামিয়াছেন। ক্রমাগত এই ধরনের গ্রেপ্তারে আশু কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইলেও শেষ পর্যন্ত এই গ্রেপ্তার স্বরাজলাভে সাহায্য করিবে। কংগ্রেস কর্মিটির সদস্যরা অতঃপর তাহাদের কার্যক্রম খদ্দর প্রচারে, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাজে এবং কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট সংগ্রহের জন্য ভাগ করিয়া লইবেন। আমলাতন্ত্রের সহিত কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সংঘাতের জন্য, এখন হইতে স্বরাজ্যদলের সদস্যদের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইবে কাউন্সিলে যত বেশি সম্ভব আসন দখল করা। এই নির্বাচনের আর মাত্র দুই মাস অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তাঁহাদের সাফল্য মূলত দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভর করিতেছে, কারণ জনসাধারণ ভোট দিয়া তাহাদের কাউন্সিলে নির্বাচিত করিবেন। মধ্যবিত্তের হাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট রহিয়াছে এবং এই কারণে স্বরাজ্য দলের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত। গভর্নমেণ্টের প্রতিটি কাজে বিরোধিতার জন্য স্বরাজ্য পার্টির একজন শক্তিশালী প্রতিনিধি কাউন্সিলে পাঠাইতে সচেষ্ট হইতে হইবে। নির্বাচিত সদস্যদের একটি প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে তাঁহারা কোনো খেতাব অথবা সরকারের প্রস্তাবিত কোনো পদ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের মূল লক্ষ্য হইবে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে কাউন্সিলে আমলাতন্ত্রের প্রভাব ক্ষুন্ন করা। নির্বাচনপ্রার্থীরা সকলেই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেস কর্মী সুতরাং তাঁহারা সকলেই

স্বরাজ্য পার্টির নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। কংগ্রেস প্রার্থীদের সঙ্গে বিত্তশালী ধনীদের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে সন্দেহ নাই। তাই প্রার্থীদের ভোটদানের পূর্বে তিনি শ্রোতাদের নিকট গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। পরিশেষে তিনি বলেন আমলাতন্ত্রকে কাউন্সিলের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে পরাজিত করিতে সফল হইলেই দেশে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে।"

প্রতিবাদ

'সার্ভেন্ট'-এ ১ ও ৩ ডিসেম্বর ১৯২৩ প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিবাদ ।

গত ১ ও ৩ ডিসেম্বর তারিখে 'সার্ভেন্টে' বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি ভুল আছে। প্রথমত উক্ত সভা কমিটির আফিসে হয় নাই, উহার অধিবেশন আলবার্ট ইনস্টিটিউট হলে হইয়াছিল। ১ তারিখের রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, শ্রীযুক্ত দাশ ও তাঁহার সহকর্মিগণ কর্মীদের ভাতা সম্বন্ধে ও 'সার্ভেন্টে'র সাহায্য সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্তন-বিরোধীদলের সদস্য ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল অডিটারের রিপোর্টের কোনো কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চাহিয়া এই তর্ক উত্থাপন করেন। তখন উভয় পক্ষের সদস্যগণ তর্কে যোগ দেন এবং সমস্ত বিষয়েই বিস্তৃত বিবরণ চাওয়া হয়! দুর্ভাগ্যের বিষয় সমিতির আয়ব্যয়-বিষয়ক আলোচনাতেও দলাদলির ভাব বর্তমান আছে। আমি সভায় জানাই যে কতকগুলি ভাউচার অডিটারের কাছে আছে এবং যে সময়ের হিসাবপত্রের আলোচনা হইতেছে, সে সময় আমি সম্পাদক ছিলাম না, কাজেই ঐ দিন বিস্তৃত রিপোর্ট সভায় উপস্থিত করিবার জন্য আমি সময় চাই ও সভা স্থগিতের প্রস্তাব করি। এই আলোচনার সময়ে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ প্রস্তাব করেন যে, উহা পরীক্ষা করার ভার একটি কমিটির হাতে দেওয়া হউক। আলোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্যও এই সময়ে চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ বলেন যে, সমিতির আয়ব্যয় বৎসরে মাত্র একবার আলোচিত হয়। অত্রাবস্থায় শ্রীযুক্ত নাগ অথবা শ্রীযুক্ত রায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আলোচনার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সমিতি নিজ তহবিলে লইয়াছেন। উহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত; কেননা আইনত এই অর্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতিরই হওয়া উচিত। এই বিষয়ে দেখা গেল উভয় দলেরই সহানুভূতি আছে। পরিবর্তন-বিরোধীদলের বর্ধমানের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় উভয়েই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন।

সভার কার্য স্থগিত রাখা সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে ঐ দিনের সভাতে সমস্ত বিবরণ না পাওয়াতে উহা স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর

ছিল না। তবে কার্যবিবরণীর অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ঐ দিন আলোচিত হইবে— এই বিষয়ে মতভেদ বর্তমান ছিল। ঐ সময়ে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল অথচ কার্য-বিবরণীর পরবর্তী প্রস্তাব আলোচিত হইতে ৩ ঘণ্টা সময়ের দরকার। সভায় কার্য শনিবারে স্থগিত না করিয়া রবিবারের জন্য কেন করা হইল, তাহারও কারণ আছে। কেননা বৈকালে খিলাফৎ কমিটির একটি সভা হইয়াছিল এবং শনিবার চরমনাইর রিপোর্ট আলোচনার জন্য কলিকাতায় একাধিক সভার অধিবেশন হয়। শনিবার প্রাতঃকালে সভা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কেননা সমগ্র বিবরণ পাইতে আমার একটু সময়ের দরকার ছিল।

ভয় প্রদর্শনের ফলে সভাপতি বাধ্য হইয়া সভার কার্য স্থগিত রাখেন, উহা বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অপমানজনক হইয়াছে। সভাপতি অবস্থা বিবেচনায় যাহা সংগত বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও মতভেদ হইবে বলিয়া মনে করি না। পরিবর্তন-বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য রূঢ়ভাবে সভাপতির সভা স্থগিতের অধিকার নাই এরূপ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

৩ তারিখের 'সার্ভেণ্ট', প্রকাশিত রিপোর্টে অদ্ভুত হেডিং দিয়া ভ্রান্ত সংবাদ ছাপানো হইয়াছিল। দক্ষিণ কলিকাতা হইতে একজন সদস্যকে মনোনীত (কো-অপশন) করিবার পক্ষে অন্যান্য নামের সংগে শ্রীযুক্ত বি. চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম প্রস্তাবিত হয়। হেমেন্দ্রবাবু একজন কংগ্রেস কর্মী বলিয়া তাঁহাকেই মনোনীত করা হয়। বিশেষত অন্য ২ জন সদস্য হইতে ইচ্ছুক কিনা তাহা জানা ছিল না। অধিকন্তু অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত যাহাতে সদস্য না হইতে পারেন তজ্জন্যই শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত পালের নাম প্রস্তাবিত হয়, যদি শ্রীযুক্ত পাল ও চক্রবর্তী কমিটির সদস্য হইতে চান, তাহা হইলে আমি স্বয়ং এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহাদের জন্য কমিটিতে স্থান করিয়া দিতে প্রস্তুত।

শ্রীযুক্ত পি. সি. রায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কেন নির্বাচিত হইলেন না তাহারও একটা কৈফিয়ত দরকার। শ্যামবাবুর নাম সভাতে প্রস্তাবিত হয় নাই, কাজেই তাঁহার জন্য কেহ ভোট দিবার সুযোগ পান নাই। তিনি সমিতির সদস্য থাকিতে রাজী কিনা এই বিষয়ের সন্দেহ নাই, হওয়াতেই তাহার নাম প্রস্তাবিত হয় নাই।

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ ও অন্যান্যের নামের সংগে উত্তর কলিকাতা হইতে স্যার পি.সি. রায়ের নাম সভায় প্রস্তাবিত হয়। আমার মনে হয় কংগ্রেসের দিক হইতে স্যার পি. সি. রায়ের পরিবর্তে মৌলানা আজাদ নির্বাচিত হওয়াতে সংগতই হইয়াছে। অবশ্য অন্য নির্বাচন মন্ডলী হইলেও তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইতে পারিত। তবে তিনি সদস্য হইতে বাস্তবিকই ইচ্ছুক অথবা দলাদলির জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে— উহা তখন বুঝা যায় নাই। স্যার পি. সি. রায়ের মনোনয়নের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ ভোট দিয়াছিলেন এ কথা সত্য নহে।

একজন মাত্র সদস্যও প্রতিবাদ করিলে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন না— শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ এ কথা বলিয়াছেন উহা সত্য নহে। শ্রীযুক্ত দাশ এ কথা কাহার কাছে বলিয়াছিলেন জানি না। পরিবর্তন-বিরোধী দলের অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত দাশ সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন কিনা। আমি বলি যে এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত দাশের মনোভাবের বিষয় আমি অবগত নহি, তবে যদি কেহ উহার প্রতিবাদ না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। একজন মাত্র প্রতিবাদ করিলেও তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন না— উপরোক্ত কথা হইতে কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম।

কার্যকরী সমিতিতে মাত্র ৫/৬ জন পরিবর্তন-বিরোধী দলের সদস্য আছেন এ কথাও সত্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে সংখ্যা আরো বেশি, তবে যদি পরিবর্তন-বিরোধী দলের সদস্যগণ পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হন তজ্জন্য কমিটিকে দোষ দিবার কিছু নাই।

চব্বিশ পরগনার নির্বাচনে যে মতভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দাশ সাব-কমিটির সিদ্ধান্তই ঠিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এ কথাও সত্য নহে। সভাপতি বলেন যে, নির্বাচনাধ্যক্ষের নির্বাচন ইচ্ছা করিলে সাব-কমিটি নাকচ করিতে পারে, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে সাব-কমিটির কার্য কতদূর সংগত তাহা সভার বিবেচ্য। এই সম্বন্ধে আরো বলা যায় যে, প্রস্তাবক সাব-কমিটি নির্বাচন নাকচ করিতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধেই সভাপতির অভিমত চাহিয়াছিলেন। আদতে বিষয়টি ভালো কি মন্দ তৎসম্বন্ধে তিনি কোনো আলোচনা করেন নাই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে দায়িত্বপূর্ণ একটি দৈনিকে ভ্রমপূর্ণ ও অননুমোদিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির অধিবেশনে কোনো সংবাদপত্রের রিপোর্টার উপস্থিত থাকিতে পারেন না। অত্রাবস্থায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংবাদপত্র মাত্রেরই সরকারী রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা ন্যায়সংগত।

১১ ডিসেম্বর ১৯২৩

দেশবাসীর প্রতি বাণী

অসুস্থ অবস্থায় মান্দালয় বন্দী নিবাস হইতে মুক্তিলাভের পর ১৬ মে ১৯২৭, ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িতে পৌঁছিয়া অ্যাসোসিয়েট প্রেসের নিকট প্রেরিত বাণী।

"এখন যখন বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছি, আমার মনে হয় আমার প্রথম কর্তব্য হইবে আমার পুরানো স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, যাহাতে আমি আমার কাজ যথা শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করিতে পারি। দীর্ঘকাল বন্দীশালায় থাকিবার ফলে, আমার সহ-বন্দীদের দুঃখ দুর্দশা আমাকে দিবারাত্র পীড়া দিবে। আমি আশা করি আমার দেশবাসী আমার দ্রুত আরোগ্যলাভ কামনা করিবেন যাহাতে আমাদের অন্তরের আদর্শ পরিপূরণের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করিতে পারি।"

১৭ মে ১৯২৭

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

আমার কারামুক্তির পর হইতে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে নানাভাবের সমবেদনাসূচক ও আনন্দজ্ঞাপক অসংখ্য সংবাদ পাইতেছি। ধনী-দরিদ্র-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল স্থানের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের এরূপ আকুল অভ্যর্থনা এবং আমার রোগমুক্তির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনায়, আমি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে এতই অভিভূত ছিলাম যে এতদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ের দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দলের লোকই আমাকে আমার হৃত স্বাস্থ্য অর্জনের প্রার্থনা করিয়া যে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করিতেছি। আমার স্বাস্থ্যচিন্তায় উদ্‌বিগ্ন হইয়া বাংলার বহু গৃহে ভগবৎ চরণে যে প্রার্থনা জানানো হইয়াছে তাহাতেও আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য, তাহাতে পৃথকভাবে প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু আশা করি, আমি একটু সবল

হইলেই তাহা পারিব। আমার চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিবার কিম্বা শান্তি-স্বস্তায়নাদি সাধন করিবার ব্যবস্থা আসিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার এক-ধারানুযায়ী চিকিৎসা চলিতেছে; সুতরাং সকলেই স্বীকার করিবেন এ ধারার পূর্ণ পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন সাধন উচিত হইবে না। আমি প্রেরিত সকল পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছি এবং যতটুকু সম্ভব তাহার প্রয়োগও করিতেছি।

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর আমার কারাবরণের পর হইতে এবং বিশেষত মান্দালয় জেলে অধিবাসের পর আমার স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হওয়ায় অধিকাংশ দেশ-বাসিগণ যেরূপভাবে আমার হিতচিন্তা করিতেছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। সার্ধ দুই বৎসর কাল বাহিরে আমাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পরও বাংলার চিরশ্যামল তটে পুনরায় উপস্থিত হইলে দেশবাসিগণ পূর্ণ উৎসাহে আমাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা আমার অজ্ঞাত রাখিবার বহুবিধ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আমি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি এবং জনসাধারণের সেবা-কার্য পুনরারম্ভ করিলে দেশবাসিগণ আমাকে কিরূপ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিবেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি।

সম্মুখে অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম ও অবসরের যে সময় রহিয়াছে সে সময় আমি অহর্নিশি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করিব যে দেশবাসী আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্পণ করিয়াছে— আমি যেন কিয়দংশে তাহার যোগ্য হইতে পারি। এখন আমার প্রধান কাজ হইবে— আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে, তাহার সমাধানকল্পে আমি যেন নিভৃতে প্রস্তুত হইতে পারি।

চতুর্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর যে ঘনান্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়া ছিল, তাহা ক্রমশ অপসারিত হইতেছে। যাহা এখনো আছে, তাহার মধ্যেও নব প্রভাতের নবীন সূর্যের অরুণ আভা দেখা যাইতেছে।

সময় নিকট হইলে, কর্মের আহ্বান আসিলে, যেন আমরা সকলেই একাগ্র চিত্তে পুনরায় কার্য আরম্ভ করিতে পারি, আজ ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

৩ জুন ১৯২৭

রাজবন্দী সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ

রাজবন্দীদের সম্বন্ধে 'মিথ্যা উক্তি'র প্রতিবাদকল্পে সংবাদপত্রে প্রেরিত বক্তব্য।

রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া রাজনৈতিক কলহে লিপ্ত হইবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি কমন্স সভায় লর্ড উইন্টারটন যাহা বলিয়াছেন—তাহা এত বিরক্তিকর যে নীরব থাকা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যদি তিনি কেবল মাত্র আমার বিরুদ্ধেই মন্তব্য প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। কারণ আমার বর্তমান অবস্থায় এই বিষয়ে উত্তর দিতে গেলে যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইবে— তাহা সহ্য করা কষ্টকর। কিন্তু যাঁহারা এখনো জেলে আবদ্ধ এবং যাঁহারা ইহার উত্তর দিতে একেবারে অপারগ, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে এইরূপ কাপুরুষের মতো আক্রমণ করায় তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে এবং আমার নিজের জন্যও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্তব্য মনে করি।

সহকারী ভারত-সচিব বলিয়াছেন যে "তিনি আইন এবং অর্ডিনান্স বন্দীদিগের বিষয় একজন বিচারপতি এবং সুভাষবাবুর বিষয় দুইজন বিচারপতি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন।" আমি যতদূর জানি, কোনো বন্দীর বিষয় কোনো বিচারপতি দ্বারা বিচারিত হয় নাই। এমন-কি, লোক-দেখানো বিচারও হয় নাই। আমাকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। আমার বিরুদ্ধে যে-সকল কাগজপত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল বা সাজানো হইয়াছিল, আমার গ্রেপ্তারের পূর্বে বা পরে তাহা কাহাকেও দেখানো হইয়াছিল কিনা তাহাও আমার জানা নাই।

লাটসাহেবের উত্তরে মিঃ ল্যান্সবেরি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় অন্তত একটি একতরফা বিচারও হইয়াছিল; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ কোনো বিচারই হয় নাই।

আমার গ্রেপ্তারের কিছুকাল পরে, একজন পুলিস কর্মচারী আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন; শুনিতে পাই ইহারই নাম 'চার্জ'। আমি উক্ত 'চার্জের' কোনো নকল পাই নাই বা আমি কিছু লিখিয়া লই নাই। আমার যতদূর মনে আছে, অস্ত্র আমদানী করা, বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে আমি লিপ্ত ছিলাম; শ্রীযুক্ত অনিলবরণ

রায়, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং আরো কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর সহিত আমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম— আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল। জেলে অন্য বন্দীদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি ঠিক এইরূপ 'চার্জ' তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেও আনা হইয়াছিল— তফাত এই ছিল যে তাহাদের সংগী ও ষড়যন্ত্রকারীদিগের নামের সামান্য অদলবদল ছিল।

আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, উপরোক্ত 'চার্জের' বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার আছে কিনা ; আমি বলিলাম, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আমি আদালতের বিচার চাই। আমার যতদূর স্মরণ আছে তাহাতে মনে হয় যে আমি ইহাও বলিয়াছিলাম যে কিরূপ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমার বিরুদ্ধে ঐরূপ অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে তাহা না জানিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর ১৮১৮ সালের তিন আইনানুসারে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, অথচ পরবর্তী নভেম্বর মাসের শেষভাগের পূর্বে আমার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত 'অভিযোগ' আমাকে জানানো হয় না। ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অর্ডিনান্স আইনানুসারে আমাকে বহরমপুর হইতে মান্দালয় স্থানান্তরিত করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন আমাদের নিকট পূর্বোল্লিখিত অভিযোগ আর-একবার উত্থাপিত করা হয়— সম্ভবত আমাদের কয়েকজনকে তিন আইন হইতে অর্ডিনান্সের আইনানুসারে বন্দীরূপে পরিবর্তিত করা হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ করা হইয়াছিল। এই সময় পুলিস 'চার্জ' কথাটি পরিবর্তিত করিয়া 'allegation' ব্যবহার করেন— কারণ অনেক বন্দীই অনুযোগ করেন যে আইনানুযায়ী 'চার্জ' বলিলে যাহা বুঝায় সেরূপ কিছুই তাঁহাদের বিরুদ্ধে আরোপ করা হয় নি।

এই তথাকথিত 'চার্জ' যখন ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাঁহাদিগকে এরূপ সকল লোকের সহিত বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল যাঁহারা পরস্পরের আলাপ হওয়া দূরের কথা পরিচিতও ছিলেন না। বন্দী হইবার পরও শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গ লইয়া কাউন্সিলে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপনও করিয়াছিলেন। পরে এই ভ্রমসংশোধনের জন্য সংগী ও সহকর্মীদের তালিকা কিছু পরিবর্তিত করা হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি

পূর্বে যে-সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও মুখ্যত সেই অভিযোগগুলি পুনরুত্থাপিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার যখন আমার নিকট উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত করা হইল, আমি তখন লিখিত জবাবে আমার নির্দোষিতার পুনঃঘোষণা করিলাম। তার পর আমি কেন পুলিসের 'নেকনজরে' পড়িলাম সে প্রশ্ন নিজেই উত্থাপন করিলাম এবং পুলিসের একজন প্রধান কর্তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতই যে আজ আমার এ দশা হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিলাম— অন্তত প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমি যে বর্ণনা দিয়াছিলাম তাহা খুব তুচ্ছ হইলেও পুলিস আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রচনা করিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক অবিশ্বাস্য ছিল না। এইজন্য আমি বলিব যে লর্ড উইন্টারটন পূর্বে যে একবার বলিয়াছিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলে আমি চুপ করিয়া ছিলাম— এ কথা ঠিক নহে। অথবা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব যে একবার বলিয়াছিলেন যে— রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ এবং সাক্ষী সাবুদ আছে এ কথা তাহাদিগকে মোটামুটিভাবে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, ইহাও ঠিক নহে। জেলে আমি যে-সকল রাজবন্দীদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলের সহিত আলাপ করিয়া আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে অ্যাসেম্বলিতে স্বরাষ্ট্র-সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার বা অন্য রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পাঠ করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের বিরুদ্ধে পুলিসের সাক্ষ্য প্রমাণ কী আছে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এইজন্য আমি বা তাঁহারা পেনালকোডের কোন্ ধারা অমান্য করিয়া বিপ্লববাদসূচক অপরাধ করিয়াছে তাহা জানা যায় না।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে মান্দালয় জেলে একজন পুলিস কর্মচারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আমার বিরুদ্ধে কাগজপত্রে সাক্ষ্য আছে— এইরূপ কথা বলিবার চেষ্টা করেন। আমি তাঁহাকে ঐ সাক্ষ্য উত্থাপন করিতে আহবান করিয়া বলিলাম আমার বিরুদ্ধে কখনোই ঐরূপ প্রমাণ নাই এবং যদি সত্যই থাকে তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই জাল। এই কথা শুনিয়া উক্ত কর্মচারী চুপ হইয়া গেলেন— কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার খেলা ধরা পড়িয়াছে।

লর্ড উইন্টারটন অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন, যে "রাজবন্দীগণ হত্যার-ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে দোষী।" যে দেশে পাঁচ কোটি লোকের বাস তথায় পাঁচ-

ছয় বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হইয়াছে— তাহা হইল মিঃ ডে'র হত্যা। এই হত্যার নিন্দা করে না, এমন লোক কেহই নাই, এমন-কি, শ্রীগোপীনাথ সাহা স্বয়ং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এই ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আইন ও শৃঙ্খলার সকল মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অপরের প্রাণ হত্যার অপরাধে শ্রীগোপীনাথকে নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়া আইনের সম্মান রক্ষা করিতে হইয়াছিল। ডে'র হত্যাকাণ্ড এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা দ্বারা আমরা একটি কথাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি তাহা হইল এই হিংসাপথাবলম্বীর যে উদ্দেশ্যই থাকুক-না-কেন তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে বর্তমান আইন ও শাসনবিধিই যথেষ্ট।

শাঁখারীটোলা পোস্টমাস্টার হত্যার ব্যাপারকে রাজনৈতিক ঘটনা বলিয়া কখনো কখনো উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশের বহুলোক উহাকে সাধারণ ডাকাতি ও হত্যা বলিয়াই গণনা করে। এই অপরাধের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে ; তা ছাড়া, ইহাও সত্য যে, যাহারা অপরাধী ছিল তাহাদিগকে সাধারণ বিচারালয়ে লইয়া গিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল এবং সাধারণ আইন ও শৃঙ্খলা দ্বারাই এ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

গভর্ণমেন্টের পক্ষীয় কোনো কোনো ব্যক্তি শান্তি চক্রবর্তীর হত্যার ব্যাপারকেও রাজনৈতিক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ ব্যাপার অত্যন্ত কুহেলিকা আচ্ছন্ন, তজ্জন্য এ সম্বন্ধে কোনো নির্ধারিত মত প্রকাশ করা যায় না। প্রসংগক্রমে বলা যাইতে পারে, জেলের ভিতরে এবং বাহিরে বহু ব্যক্তি এ ঘটনাটিকে 'এজেন্ট প্রভোকেটার'-এর কার্য বলিয়া গণনা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতেও পারিবেন। যতদিন না এ সম্বন্ধে দুই পক্ষের কথা শুনিয়া ব্যাপারটি অনুসন্ধান করা হয় ততদিন এই ঘটনার অজুহাতে নূতন আইন প্রবর্তন বা বেআইনী কাজের সমর্থন সরকারের পক্ষে সংগত হইবে না।

রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জেলের মধ্যে হত্যা করায় একটি জেল-আইন-বিরোধী কাজ করা হইয়াছে। কয়েকজন জেলবাসীর বাহুবল প্রয়োগের ফলেই এ কার্য সাধিত হইয়াছে। জেল-প্রশাসন-ইতিহাসে এরূপ আইনভংগ নূতন নহে। জেলের ঘটনা বলিয়া ইহার উপযোগিতা অতিশয় সংকীর্ণ— ইহার নাম করিয়া অর্ডিনান্স বা রেগুলেশন সমর্থন কথনোই

চলে না। সরকার কি বলিতে পারেন যে যাঁহারা জেল-হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাহাদিগকে সাধারণ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিলে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইত না ?

রাজনৈতিক হত্যা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। রাজনৈতিক মামলায় সাক্ষীকে ভয় প্রদর্শন এবং হত্যা সম্বন্ধে লাট সাহেবের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে— পুলিসের মতে যে সময় বিপ্লববাদের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ— তাহাতে একজন সাক্ষীও নিহত বা শঙ্কিত হয় নাই। শাঁখারীটোলা হত্যাকাণ্ডের মামলা, আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলা, ডে হত্যার মামলা, শোভাবাজার মামলা, বর্মাবন্দুক সরবরাহের মামলা, আলিপুর জেল-হত্যাকাণ্ডের মামলা, সংযুক্ত প্রদেশের কাকোরী ষড়যন্ত্রের মামলা এবং এইরূপ যে-সকল মামলাকে পুলিস রাজনৈতিক বলিয়া প্রচার করেন, তাহার প্রত্যেকটি উপযুক্ত আদালতে বিচার হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য কোনো সাক্ষীর প্রাণনাশ বা অন্য কোনোরূপ ক্ষতি হইয়াছে— দেশবাসীর কেহই সেরূপ কোনো কথা শোনে নাই। ভারতবর্ষের সহকারী সচিব এই-সবল প্রমাণিত মিথ্যাতর্কের অবতারণা করিয়া, পরিত্যক্ত ও অবজ্ঞাত নীতি সমর্থনের চেষ্টা পান, ইহাই আশ্চর্য।

আর্ল উইন্টারটন বলিয়াছেন কেহ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেই তাহাকে দোষী বা নির্দোষ বলা চলে না। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। ব্যক্তিগতভাবে বা কর্মজীবনে আমার পদমর্যাদার জোরে আমি আইনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছুক নহি। আইনের চক্ষে আমরা সকলেই সমান এবং আমরা তাহাই থাকিতে চাই। যদি আমরা আইন ভঙ্গ করি— যেমন আমরা ১৯২১ সালে করিয়াছিলাম— তাহা হইলে তাহা আমরা প্রকাশ্য ভাবেই করিব এবং তখন যেমন আমরা তাহার ফল ভোগ করিয়াছিলাম ভবিষ্যতেও আনন্দের সহিত সেইরূপ ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিব। বর্তমান ব্যাপারে আমরা আইনভঙ্গ করি নাই এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনো ধারা অমান্য করি নাই। সুতরাং স্বভাবতই আমাদের মনে হয় কোনো বিপ্লবাত্মক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমাদের সাজা হয় নাই— একটি শক্তি-শালী রাজনীতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অপরাধে আমাদের দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে।

আর্ল উইন্টারটন বলিয়াছেন যে ১৯২০ সালে যে-সকল রাজবন্দীকে মুক্তি

দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের পরবর্তী আচরণে প্রমাণিত হইয়াছে যে সেই নীতি যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ১৯২০ সালে যাহারা মুক্তি পাইয়াছিল— তাহাদের সকলের সহিত আমি পরিচিত নহি। কিন্তু আমি কয়েকজনকে জানি— যাহারা মুক্তির পর কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে এবং কংগ্রেস ও স্বরাজ দলের কার্যের জন্য মনেপ্রাণে খাটিয়াছে। আমি খুব নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে তাঁহারা কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের আদর্শের প্রতি খুব আস্থাবান ছিলেন।

আর্ল উইন্টারটন যে-সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়াছেন— আমি সেই-সমস্ত কথায়ই আমার উত্তর সীমাবদ্ধ করিলাম। রাজবন্দীদিগের সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে আমার অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু বর্তমানে আমি তাহা হইতে নিরস্ত থাকিব, সুস্থ হইলে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল। যখনই রাজবন্দী-দিগের মুক্তির কথা উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়েই কোনো লোক একটি ভাঙা পিস্তল বা কুড়াইয়া পাওয়া বোমা লইয়া ধরা দিতে আসিয়াছে— ইহা ছাড়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশে কোনো বিপ্লবসূচক কার্য দেখা যায় নাই, অন্তত গত এক বৎসরের মধ্যে তো একেবারেই দেখা যায় নাই।

আর্ল উইন্টারটনের বক্তৃতা পাঠ করিলে মনে হয় যে তিনি ইচ্ছাপূর্বক অসত্য বা অর্ধসত্য উক্তি করিয়াছেন অথবা এখনকার শাসকমণ্ডলী এই দুর্দশা-গ্রস্ত প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে। এই দুই অনুমানের যেটিই সত্য হউক-না-কেন তাহাতে আশ্বস্ত হইবার কোনো কারণ নাই।

৫ জুন ১৯২৭

অতীতের গণ্ডগোল বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দাও

শিলং হইতে বাংলার জনসাধারণের প্রতি আবেদন

"যাঁহারা অন্তরের সহিত দেশের উন্নতি কামনা করেন, পক্ষকাল পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জয়লাভ হওয়াতে তাঁহারা দেশের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। যদি কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে ঐক্যভাব বজায় রাখেন এবং কংগ্রেসের বাহিরে যে-সকল সংঘ কার্য করিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত যদি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে উপরোক্ত জয় হইতে সাধারণে অনেক কিছু লাভ করিতে পারিবেন। যে-সকল সমিতি কংগ্রেস-দলভুক্ত নহে তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিবার এই উপযুক্ত সময়। ১৯২৫ সালে কংগ্রেসের যে অবস্থা ছিল, বর্তমানে যে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কংগ্রেস কর্মীদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে এবং বর্তমানে বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ অক্লান্তকর্মী কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন।

বাংলার দুর্ভাগ্য, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাও সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে বিপর্যস্ত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যেন অনেকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। রাজনীতিক জগতের অবস্থা মন্দ নহে— এখন দেশে একটি নূতন জীবনের আরম্ভ হইবার সূচনা হইতেছে। নিত্য ছোটোখাটো গোলমালে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে— সাম্প্রদায়িক গোলমালেও লোকের একটা অবসাদ আসিয়াছে। শুভ মুহূর্ত দেশবাসীর সম্মুখে রহিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে সকলকে জাতীয় জীবনে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং একমাত্র শক্তিশালী সংঘবদ্ধ কংগ্রেস দলই তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আমাদিগকে সাহস অবলম্বন করিতে হইবে— অতীতের সব গোলমাল ভুলিয়া গিয়া— সব সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আন্তরিক উদারতা এবং গভীর সহানুভূতির মধ্য দিয়া পুরাতন সহকর্মীদিগকে আমাদিগের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। যাঁহারা কোনো কারণে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত নহেন —তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল বাক্যে নহে— যথার্থ বিশ্বাসের সহিত— আন্তরিকতার সহিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মীমাংসা করিতে হইবে। দেশবন্ধু যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন

তখন কংগ্রেস যে শক্তি ধারণ করিত— ঠিক সেই অবস্থা ফিরিয়া পাইবার জন্য মানুষের শক্তিতে যতটা সম্ভব সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

কংগ্রেসকে উপরোক্ত অবস্থায় আনিতে গেলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচন শীঘ্রই হইবে— এবং সাধারণ সভা হইতে ষাট জন সভ্য লওয়া হইবে। বাংলার কংগ্রেস কর্মীদিগের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ— তাঁহারা যেন সৎ, অকপট দেশভক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। হয়তো যাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবেন, বিশেষ কোনো বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত মতের মিল ছিল না, হয়তো তাঁহারা অন্য সংঘভুক্ত হইতে পারেন অথবা হয়তো তাঁহারা গত দুই বৎসর কাল দলাদলি হিসাবে নানাপ্রকার কাজ করিয়াছেন— কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। পরবর্তী কয়েক বৎসরে কংগ্রেসের স্কন্ধে যে গুরু-দায়িত্বভার চাপিবে— তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে গেলে দেশের উন্নতির জন্য কোনো কর্মীকে হারাইতে পারা যায় না। আসুন, সকলে আমরা ভালোবাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া অগ্রসর হই।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

ভাষণ

২৯ অক্টোবর ১৯২৭, অ্যালবার্ট হলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় প্রদত্ত।

"সভাপতি মহাশয়, এই সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থনের জন্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমি দুঃখিত যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে আমি অসমর্থ। ইহা ব্যতীত আমার সম্মানীয় বন্ধু মৌলানা আক্রাম খানের আবেগকম্পিত ভাষণের পর দীর্ঘ বক্তৃতা নিষ্প্রয়োজনও বটে।

আলোচ্য প্রস্তাবটি মনুষ্য-সৃষ্ট যে-কোনো ফর্মুলার ত্রুটি-বিচ্যুতির ছাপ বহন করিতেছে। প্রস্তাবটি ত্রুটিহীন ইহা আমি দাবি করি না এবং ইহা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসা দিবে, ইহাও দাবি করি না। কিন্তু আমি অবশ্যই দাবি করিব যে, সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা ঐকান্তিক ও সৎ-প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। শ্রীপ্রকাশম এবং তাঁহার সমমতাবলম্বী নেতৃবর্গের সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে যে কঠিন সমস্যাসমূহ আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে, সে সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা শুনিয়াছি। কিন্তু এই-সকল সমস্যার সমাধান তাঁহারা কিভাবে করিতে চান, সে সম্বন্ধে তাঁহারা মনস্থির করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইল না।

সমস্যা অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, হিন্দু এবং মুসলমান, সকলে মিলিয়া একাগ্রভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনের জন্য আমাদের ঐকান্তিক উদ্যোগের সময় আসিয়াছে।

মাননীয় মহাশয়, এই প্রস্তাবটিকে বাস্তব রূপদানের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিতে শ্রীপ্রকাশম ও তাঁহার মতানুসারীদের আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। অদ্য যে-সকল বিধানের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না, ভবিষ্যতে হয়তো সেই-সকল বিধান সংযোজিত করিতে হইবে। কিন্তু সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টা হইলে সকলের পক্ষেই কল্যাণের এবং আনন্দের হইবে। শ্রীপ্রকাশম এই সভায় যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা মনোযোগ সহকারে বুঝিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। আমি এ-পর্যন্ত তাহার একটি মাত্র গঠনমূলক প্রস্তাব বুঝিতে পারিয়াছি, যে প্রস্তাবটি গো-হত্যা সম্পর্কিত এবং যাহা বিচার করিবার জন্য বক্তা এ-সম্বন্ধে বর্তমান বিধিবদ্ধ আইন ও পৌর আইনগুলিকে স্বীকার করিয়া লইতে আবেদন

জানাইয়াছেন। আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এই একটি মাত্র প্রস্তাব ছাড়া তাঁহার উত্থাপিত আর কোনো গঠনমূলক প্রস্তাবই আমার বোধগম্য হয় নাই।

মহাশয়, এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি কারণ আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে প্রস্তাবটি হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রশমিত করিয়া একদিকে যেমন মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার জন্য হিন্দুদের জেদ দূর করিবে অপর পক্ষে দেশে গো-হত্যা কমাইতে সাহায্য করিবে।

মৌলানা আক্রাম খান সাহেবের সহিত আমি অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, তিনিও আমার মতোই বিশ্বাস করেন যে প্রস্তাবটি কার্যকর হইলে একদিকে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার জন্য হিন্দুদের জেদ এবং অপরপক্ষে গো-হত্যা সম্পর্কে মুসলমানদের গোঁড়ামি দূর হইবে। আসুন, আমরা এই প্রস্তাবটিকে সততার সহিত কার্যকর করিয়া দেখি আমাদের এই আশা পূরণ হয় কিনা!

যদি আমরা ব্যর্থ হই, সমবেতভাবে সকলের নিকট গ্রহণীয় মীমাংসার অন্য কোনো বিকল্প সূত্র উদ্ভাবনের জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। এখন পর্যন্ত সকলের নিকট গ্রহণীয়, ইহা হইতে সন্তোষজনক, কোনো বিকল্প সূত্র আমরা বাহির করিতে পারি নাই। এই কারণে প্রস্তাবটি কার্যকর করিবার সময় ইহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে যে দুই পক্ষই একটি চুক্তি অনুযায়ী নিজ নিজ ভূমিকা পালন করিতেছেন। যে-কোনো এক পক্ষ তাহাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে চুক্তিটি বাতিল হইয়া যাইবে।

সুতরাং, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঠকাইবার কিম্বা একপক্ষ অপর পক্ষের প্রতিকূলে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আশংকা নাই। আমি এই দিকটির উপর জোর দিতে চাই; কেননা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের চরমপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায় তাহা এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিলে বহুলাংশে দূর হইয়া যাইবে।

সমস্যাটিকে আমি যেভাবে দেখিতেছি তাহা এই: মৌলানা শৌকত আলি, মহম্মদ আলি কিম্বা আবুল কালাম আজাদের মতো বিশিষ্ট নেতৃবর্গ যদি তাঁহাদের মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রয়োজন মনেও করেন বাংলাদেশের হিন্দুরা উত্তেজনা বশবর্তী হইয়া কোনো কাজ করিবেন না (মহম্মদ আলি: আমার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইবে না) কিম্বা কোনো উত্তেজনার প্রশ্রয় দিবেন না। বাংলার হিন্দুরা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বহন করিতেছেন এবং আমি মনে করি

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধ্যায়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যাহাই হউক-না-কেন, শুরু হইতেই আমরা যে মনোভাব নিয়া কাজে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। আমি আশাবাদী এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ একটি সাময়িক সমস্যা মাত্র। সুতরাং আমি বাংলার হিন্দুদের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যে অনমনীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব গ্রহণ ও লালন করিয়া দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা যেন তাহা বর্জন না করেন। আমি মৌলানা খান সাহেবের নিকট সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি যে প্রতিটি প্রদেশে নির্ভরযোগ্য মুসলমান ও হিন্দু নেতার সন্ধান পাইলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দূর করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করিতে পারিব। চরমপন্থী হিন্দুদের এ-বিষয়ে বুঝাইতে গিয়া তাহাদের এই অভিযোগের সম্মুখীন হইয়াছি যে, কোনো নির্ভরযোগ্য মুসলিম নেতার সন্ধান তাঁহারা পান নাই। আমি আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবসানের জন্য মৌলানা আক্রাম খান যে-কোনো দুরূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। সাহসে ভর করিয়া হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসায় অগ্রসর হইলে তাহাদের সুনিশ্চিত সাফল্যের আশা আক্রাম খান সাহেবকে অনুপ্রেরিত করিয়াছে ; আমিও অনুরূপ মনোভাবের পোষকতা করিতেছি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বর্তমান অধিবেশনে সমবেত হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট গ্রহণীয় যে সমাধান-সূত্র সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসাধনে এ. আই. সি. সি.-র পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।

দীর্ঘ বক্তৃতা আপনাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র দেশ সাম্প্রদায়িক বিরোধে জর্জরিত, যত শীঘ্র ইহার অবসান হয় ততই মঙ্গল। সুতরাং প্রস্তাবটিকে আন্তরিকতার সহিত রূপদানের জন্য আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। মাদ্রাজে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে আমরা সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নেতৃবৃন্দের একটি সর্বসম্মত মীমাংসায় পেঁছাইতে উদ্যোগী হইব—যে মীমাংসা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বনিয়াদ হইবে এবং কংগ্রেসের পক্ষে স্বরাজলাভের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করিবে।

ভাষণ

১২ নভেম্বর ১৯২৭ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবের আলোচনার জন্য শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আহূত সভায় প্রদত্ত।

আমাদের স্বাধীনতার দাবি, ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত নয়, শুধুমাত্র আমাদের রুটি-মাখন সংস্থানের জন্য নয়— এই দাবি একটি অনিবার্য নৈতিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। পশ্চিমের এবং পশ্চিমী প্রতিষ্ঠানগুলির চাপে আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আমাদের ধর্ম রক্ষা পাইবে না এবং গো-হত্যা বন্ধ কিম্বা হ্রাস করিতে পারিব না, মুসলিমদের সঙ্গে কোনো সম্মানজনক মীমাংসায় আসিতে পারিব না এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিতে কিম্বা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইব না।

বাংলাভাষী শ্রোতাদের কাছে আমি এই প্রথম আমার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছি। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন বন্দীশালায় যাঁহাদের জীবন অপচিত হইতেছে, ছয়মাস পূর্বে কারাবাস হইতে মুক্তি পাইবার পর তাঁহাদের ভাবনাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মান্দালয় জেলে বন্দী থাকাকালীন সংবাদপত্রে যখন পড়িলাম যে কলিকাতার হিন্দুরা পুলিস কমিশনার স্যার চালর্স টেগার্টের নেতৃত্বে এবং পুলিস-পরিবৃত হইয়া মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে ধ্বনিত হইল : 'মা ধরিত্রী দ্বিধা-বিভক্ত হও'। আমি জানিতে চাই আপনাদের মধ্যে কয়জন রাজবন্দীদের জন্য আন্তরিকভাবে মর্মবেদনা অনুভব করেন (সমস্বরে : 'সকলে', 'সকলে')। তাই যদি হয়, আমি আপনাদের অনুরোধ করিব বিভিন্ন দূর-দূরান্তের জেলে আটক রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবেন উপরোক্ত সংবাদটি পাঠ করিয়া তাহাদের মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল! আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'রাজবন্দীদের বন্দীদশার জন্য দায়ী কে?' (একটি কণ্ঠস্বর : 'আমরাই')। এবং তার পর? তার পর বাংলাদেশের পুলিস তাঁহাদের বন্দীদশার জন্য দায়ী। আমি জিজ্ঞাসা করি বাংলাদেশের সেই পুলিসদের প্রহরায় মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রা পরিচালনায় আপনাদের লজ্জাবোধ হইল না? দুর্বল অসহায় নারীদের অপেক্ষাও নিজেদের অধিকতর দুর্বলের মতো আচরণ করিতে

আপনাদের লজ্জাবোধ হইল না? কুলকাঠিতে নিরস্ত্র মুসলিমদের উপর গুলিবর্ষণে কিছু হিন্দুর মনের কোণে হয়তো বা আনন্দের শিহরণ বহাইয়া দিয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহার অপেক্ষা বেদনার ও লজ্জার আর কিছু হইতে পারে না। আমি আপনাদের সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে যাহারা আজ নিরস্ত্র মুসলিমদের উপর গুলিচালনা করিতে পারে, আগামীকাল তাহারাই নিরস্ত্র হিন্দুদের উপরও গুলিচালনার মহড়া লইবে।

সরকারী কর্মচারীদের কাছে নতি স্বীকার করিবেন না

যাঁহারা হিন্দুদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত রহিয়াছেন তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত এবং তাঁহাদের আমি অভিবাদন জানাইতেছি; কিন্তু কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বেতনভুক কর্মচারীদের কাছে নতি স্বীকারে আমি কখনো সম্মত হইব না। অদ্য আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি এই জন্য যে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এ-পর্যন্ত উত্থাপিত হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানসূত্রের মধ্যে আলোচ্য ঐক্যপ্রস্তাবটি সর্বোত্তম। কারণ এই প্রস্তাব হিন্দু ও মুসলিমদের গোঁড়ামিতে ছেদ টানিয়া দিবে, দেশে গো-হত্যার সংখ্যা হ্রাসে সহায়ক হইবে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। আমি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় স্বার্থহীনভাবে এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছি এবং অদ্যকার এই সভায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। কিন্তু যদি আমার এই বাঞ্ছিত প্রত্যাশা পূর্ণ না হয়, আমিই সর্বপ্রথম আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া আর-একবার ঐক্যের জন্য উদ্যোগী হইব। আপনারা গত দুই-তিন বছর পরস্পরের সহিত বিরোধে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের দিকে আমরা এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারি নাই। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে আমাদের একটি সুযোগ দিতে, ঐক্যসাধনের জন্য একটি অবকাশ দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি, যাহাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারি। আমাদের সম্মুখে আজ একটি মাত্রই সমস্যা রহিয়াছে, সে সমস্যাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। আপনারা হিন্দুর অধিকার, মুসলিমদের অধিকারের কথা বলিয়া থাকেন। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি পরাধীন জাতির কোনো মানুষের কি কোনো অধিকার আছে? আপনারা জানেন বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

কুলকাঠিতে হিন্দুদের বলিয়াছেন : 'আপনারা মসজিদের সামনে অবশ্যই বাজনা বাজাইবেন' এবং এই অধিকার রক্ষাকল্পে মুসলিমদের উপর গুলি-চালনার আদেশ দেন। পটুয়াখালিতে তিনি হিন্দুদের বলিয়াছেন : 'আপনাদের বাজনা বাজাইতে দেওয়া হইবে না' ; এবং তাহার এই আদেশ-অমান্যকারীদের তিনি গ্রেপ্তার করেন। সুতরাং, একই জেলায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিতে দুইরকম প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। যদি আপনি একবার এক ধরনের প্রথাকে স্বীকৃতি দেন, পরমুহূর্তে আপনি জানেন না কোথায় দাঁড়াইবেন। কারণ, ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত মতদ্বৈধ হইলেই তিনিই হইবেন প্রথাসমূহের বিচারক। স্থানীয় রীতি-নীতি নির্ধারণের জন্য হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা শপথ লইয়া এক ধরনের কথা বলিবেন, আর যদি আপনি একই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে মুসলিমদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁহারও শপথ লইয়া হিন্দুদের বিপরীত কথা বলিবেন। সেই অবস্থায় কে মীমাংসা দিবে ? আবার দেখা যাইবে, যেমন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বেলায়, হাইকোর্টের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের পরও ম্যাজিস্ট্রেট অনায়াসেই বলিতে পারেন : 'যদিও কোর্টের সিদ্ধান্ত মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার স্বপক্ষে রহিয়াছে, আমি ১৪৪ ধারা অনুযায়ী বাজনা বাজানো নিষেধ করিয়া দিতেছি, কারণ আমি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছি।' যদি প্রথা অনুযায়ী চলিতে হয়, তবে দক্ষিণ ভারতে মোপলা অধ্যুষিত অঞ্চলে মসজিদের সম্মুখে বাজনা নিষিদ্ধ করিতে হয় এবং ভারতবর্ষের বহু জায়গায় পূর্ব-অনুসৃত নীতি অনুযায়ী বাজনা বন্ধও করিতে হয়। আমি হিন্দুসভার কাছে জানিতে চাই 'তাঁহারা কি মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন ?'

'গত দশ মাস হিন্দুসভা এবং মুসলিম লীগকে ঐক্যসাধনের জন্য সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা ব্যর্থ হইবার ফলেই কংগ্রেসকে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। সিমলায় বাংলাদেশের হিন্দুসভার নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কি সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়া সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন ?' আমার অনুমান তাঁহারা কেহই যোগ দেন নাই। এখন তাঁহাদের আর অভিযোগ করা সাজে না যে তাঁহাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

আবেদন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইবার পর রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কংগ্রেস কর্মীদের ব্যাপক আন্দোলনের জন্য এবং তাহাদের কর্তব্য বিবৃত করিয়া 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' মারফত ২০ নভেম্বর ১৯২৭ প্রচারিত।

কংগ্রেসের নূতন বছরের শুরুতেই বাংলায় ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যমের সুষ্ঠু ভিত গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমি কংগ্রেসের সকল কর্মী, সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট কংগ্রেসের পুনর্গঠনের এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিতে নবপ্রাণ সঞ্চারণের জন্য নিষ্ঠার সহিত উদ্যোগী হইতে আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি। বাংলার প্রতিটি অংশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের হৃদ্যতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তাহাই করিতে হইবে, যাহাতে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা কংগ্রেসের পতাকাতলে পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কংগ্রেসের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আন্তরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। কংগ্রেসের লুপ্ত শাখাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নূতন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।

বর্তমান সংগঠনের মধ্যে যেমন নূতন প্রাণের ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে হইবে, তেমনি যে-সকল কর্মী সাময়িকভাবে কংগ্রেসের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন কাজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রতিটি জেলায় নূতন কর্মী সংগ্রহ করিতে হইবে এবং যাঁহারা কাজের ক্ষেত্রে রহিয়াছেন তাঁহাদের পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সর্বোপরি অবিলম্বে ব্যাপকভাবে নূতন কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। ১০ ডিসেম্বর নাগাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পুনরায় বৈঠক বসিবে এবং আমি সাগ্রহে আশা করি সে-সময় বিভিন্ন জেলা হইতে সমবেত সদস্যগণ উপরোক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে এই অবসরে অগ্রগতির অনুকূল রিপোর্ট দিতে পারিবেন। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে কোনো কর্মসূচীরই, তাহা যতই সুষ্ঠু হউক-না কেন, কার্যকরী রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার জন্য উপযুক্ত ভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে।

কিভাবে রাজবন্দী মুক্ত করা যায়

বর্তমানে বাংলাদেশের সম্মুখে একটি মাত্র সমস্যা রহিয়াছে, যাহা রাজবন্দীদের সমস্যা। এই সমস্যা বৃহত্তর জাতীয় পরাধীনতার প্রতীকী সমস্যা মাত্র।

রাজবন্দীদের আশু মুক্তির সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় কর্মচাঞ্চল্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় রহিবে, ততদিন আমাদের দাবি সরকারী অবজ্ঞার বস্তু হইয়া থাকিবে— ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র ব্যাপক এবং তীব্র জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া আমরা এই প্রশ্নে জনসাধারণের অনুভূতির গভীরতা সপ্রমাণ করিতে পারিব এবং রাজবন্দীদের দ্রুত মুক্তি সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিব।

একটি সুবর্ণ সুযোগ

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সকল গোষ্ঠী এবং দেশের সকল দলের পক্ষে বিভেদ ভুলিয়া স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় সংকল্পে সংহত সংগ্রাম পরিচালনার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের পরমপ্রিয় এবং মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বেদনাময় অকালবিয়োগের পর যৌথ-সংগ্রামের এমন অনুকূল পরিবেশ আর কখনো দেখা যায় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে এই প্রদেশ-বাসীরা এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবেন।

ভাষণ

১০ ডিসেম্বর ১৯২৭ লক্ষ্মী ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক গৃহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আলেখ্য-আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে প্রদত্ত।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমরা এই সন্ধ্যায় স্বর্গত দেশবন্ধু সি. আর. দাশের আলেখ্যের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়াছি। আমরা সকলেই অবগত আছি যে স্বর্গত দেশবন্ধু দাশ কেবলমাত্র একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তাহার অপেক্ষাও বড়ো কথা, তিনি কেবলমাত্র একজন বড়োমাপের মানুষই ছিলেন না, বস্তুত ভারতবর্ষে যে-সকল মহামানব জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার জীবনের উপান্তে তাঁহার বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সহিত আমাদের পরিচয় থাকিলেও, আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বহুবিধ কর্মতৎপরতার মধ্যে জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে কখনো তিনি অবহেলা করেন নাই। স্বদেশী শিল্পের ক্ষেত্রে, পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্প-সমালোচকের ভূমিকায়, সাহিত্যিকরূপে এবং সর্বোপরি পরোপকার এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতিটি পাপড়ি যেমন পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া প্রাণ-প্রাচুর্যের এবং পূর্ণতার রূপ গ্রহণ করে তেমনি তাঁহার বিচিত্র জীবনের সকল দিকের বিকাশ আমাদের কাছে সর্বময় পরিপূর্ণতার আবেদন পৌঁছাইয়া দিয়াছে— তাঁহার জীবনের একটি দিকও অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবহেলিত হয় নাই। তিনি শুধুই একজন উঁচুদরের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন এক বিরাট পুরুষ। বস্তুতপক্ষে তিনি যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না-ও হইতেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতমরূপে অবশ্যই গণ্য হইতেন! তাহার কারণ, কবিরূপে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত, অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, পরোপকারে বিরাট পুরুষ এবং আরো বলিতে হয় স্বদেশী শিল্পের মহান পথিকৃৎ ও পরিপোষকরূপে তাঁহার স্থান ছিল স্বীকৃত।

যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহার পোষকতা লাভ করিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশত সেগুলি আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নাই, তাহার কারণ হয়তো আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে উপযুক্ত লোকের অভাব, এবং আমি বিশ্বাস করি, উপযুক্ত

আরো ব্যক্তি আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাওয়া গেলে, আমরা এই ক্ষেত্রে আরো ভালো ফল দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের এইটুকু সুনিশ্চিত সান্ত্বনা রহিয়াছে যে তাঁহার জীবনে তিনি যে-সকল শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগের সহিত যুক্ত ছিলেন তাহাদের কিছু কিছু প্রসার লাভ করিয়াছে এবং এই-সকল উদ্যোগ দিনের পর দিন অধিকতর উন্নত হইবে, সে-আশার সার্থকতাও সপ্রমাণ করিয়াছে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা হয়তো জানেন যে তাঁহার জীবনের শেষের দিকে এই ব্যাংকটির সহিত নানাভাবে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি একাধিকরূপে ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাংকটিকে সহায়তা করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ এবং সেক্রেটারি ব্যাংকটির প্রতি তাঁহার সকল প্রকার সহায়তা ও সহানুভূতির সকল সংবাদই অবগত আছেন। সুতরাং, সংগত ভাবেই এই ব্যাঙ্কে তাঁহার আলেখ্য স্থান পাইতে চলিয়াছে, ইহাই বরং আশ্চর্যের কথা যে এ-যাবৎ তাঁহার প্রতিকৃতি এই গৃহে স্থান পায় নাই। কথায় বলে, না হওয়ার চাইতে বিলম্বে হওয়াও ভালো। তাই দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি এইখানে উন্মোচনের ঘটনায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করিতেছি। আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানাই, যেন লোকান্তরিতের আত্মা এই স্বদেশী উদ্যোগটির উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া ধাপের পর ধাপে ইহাকে আরো উন্নতির পথে পরিচালিত করে।

মাদ্রাজ অধিবেশন : বিবৃতি

সংবাদ পাঠ করিয়া এবং শুনিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সম্পূর্ণ সাফল্য সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমাদের বাৎসরিক জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে না পারা আমার পক্ষে অতীব বেদনাদায়ক হওয়া সত্ত্বেও আরো অধিকতরভাবে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে এই পথ গ্রহণ করিতে হইল। যে উদ্দীপনা মাদ্রাজ হইতে উৎসারিত হইল তাহার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত উদ্বেলিত হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। আমাদের জাতীয় আন্দোলনে মাদ্রাজের ভূমিকা, এবং আমাদের হৃদয়ে প্রেরণার উৎসরূপে মাদ্রাজের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

এত বড়ো সাফল্য এবং এরূপ ঐকমত্যের কথা চিন্তাই করিতে পারা যায় না। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশক যে ঐক্যপ্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে আমি তাহার উপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিতে চাই। এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কাজে সার্থক প্রয়াসীদের সকলের প্রতি এবং বিশেষভাবে মহাত্মাগান্ধী, ডাঃ আনসারী, মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখর প্রতি দেশ কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি আরো গভীর ভাবে আনন্দিত কারণ আমাদের বিদায়ী সভাপতি মিঃ আয়েঙ্গার তাঁহার নিজ শহর মাদ্রাজে একটি বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলশ্রুতিরূপে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রচেষ্টার শুভ পরণতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং অন্যান্য হিন্দু মহাসভা-নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রসঙ্গে যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যে সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের মনে গভীর আনন্দের এবং কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিয়াছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আগামী বৎসরের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শুভ ঘটনা ইহাই। আমি আশা করি, যে পরিস্থিতি মাদ্রাজের সাফল্যকে সার্থক করিয়াছিল কলিকাতাতেও সেই পরিস্থিতি গড়িয়া উঠিবে এবং যে মনোভাব সেখানকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে প্রেরণা দান করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম-লীগ নেতৃবৃন্দের মনেও সেই মনোভাবের প্রতিফলন দেখা দিবে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যদি এই উপযুক্ত সময়ের উপলব্ধিতে সজাগ হইয়া উঠিতে পারে তবে সমস্ত দেশ এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে যাহা কেবলমাত্র

শ্বেতকায় কমিশন (সাইমন কমিশন) বয়কটেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অখণ্ড ভারতের ভিত্তিমূলে যে স্বরাজ সংবিধান, তাহাই সৃষ্টি করিয়া মানবসমাজকে উপহার দান করিবে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯২৭

মতামত

ফরওয়ার্ড পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে ড. মুঞ্জের বিবৃতি প্রসঙ্গে বক্তব্য।

একমাত্র যে প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর সম্মুখে জাতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেই কংগ্রেসের গুরুত্বকে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করিয়া এবং তাহার গৃহীত প্রস্তাবকে নিন্দা করিয়া ড. মুঞ্জে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দান করিয়াছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার, বিশেষ করিয়া লর্ড বার্কেনহেড, যাহা চাহিতেছেন, তিনি অজানিতভাবে সেই অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে যে শ্লেষাত্মক সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কোনোমতেই হিন্দু-মহাসভার সভাপতির পক্ষে মর্যাদাকর নয়। আমি বুঝিতে পারিলাম না—যে মুহূর্তে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা এবং তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ঠিক সেই মুহূর্তেই মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার অথবা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া ড. মুঞ্জে, হিন্দু-মহাসভা অথবা ভারতবর্ষ কী লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দু-মহাসভার সভাপতি ড. মুঞ্জে পদাধিকার বলে একটি বিবৃতি দান করিয়া এই ধারণার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং হিন্দু-মহাসভার দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। ইহা মোটেই সত্য নয়। যদিও আমি মাদ্রাজ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলাম তবুও আমি বিশ্বাস করি যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং বিশিষ্ট হিন্দু-মহাসভা নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কিত এবং অন্যান্য প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন। উপরন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মহাসভাগুলি গোরু এবং সংগীত-বিষয়ক বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে সমমত পোষণ করে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা বিশেষ প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার দৃষ্টিভঙ্গি বলিয়া প্রচার করা অযৌক্তিক।

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল-বঙ্গ হিন্দু-মহাসভার মতকে উপেক্ষা করা অনুচিত হইবে। বাংলাদেশে হিন্দু জন-সংখ্যার ভিত্তিতে, এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহাদের বিশিষ্ট দান ছাড়াও ১৮৫৭ সালের পরবর্তী সময়ে হিন্দু জাগরণে তাঁহাদের বিশেষ ভূমিকার জন্যও পূর্বাপেক্ষা আরো গভীরভাবে তাঁহাদের স্বীকৃতি দান করিতে হইবে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। সামান্য সংখ্যক প্রদেশের হিন্দুর মতাদর্শকে হিন্দু ভারতের মতাদর্শ হিসাবে প্রচারের এ-যাবৎ প্রচলিত ব্যবস্থার আমি দৃঢ়তার সহিত বিরোধিতা করি। কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য এবং বিশ্বস্ত হিন্দু-মহাসভা কর্মীকে বলিতে শুনিয়াছি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা হিন্দু-মহাসভা বাংলাদেশে প্রভূত কাজ করিয়াছে। ইহা সত্য হইলে যথার্থভাবেই বলা যায় আমার প্রদেশে হিন্দু-মহাসভার বহুসংখ্যক সদস্য রহিয়াছে। আমি বাংলাদেশকে চিনি এবং কম সংখ্যক হইলেও বিশিষ্ট হিন্দু-মহাসভার নেতাদেরও জানি। আমি অনায়াসে ড. মুঞ্জেকে বলিতে পারি যে, অত্যন্ত সাধারণ হিসাবেও কমপক্ষে আশি শতাংশ বংগীয় হিন্দু-মহাসভার সভ্য ও সমর্থক আন্তরিকভাবে জাতীয়তাবাদী এবং ড. মুঞ্জের প্রদর্শিত দুঃখজনক মানসিকতার সহিত তাঁহাদের কোনোপ্রকার মিল নাই।

আমি একজন হিন্দু এবং যদিও হিন্দু-মহাসভার বিভিন্ন কর্মধারার সহিত আমার মতপার্থক্য আছে— তবুও আমি আন্তরিকভাবে ইহার সমাজ-উন্নয়নমূলক এবং ধর্মসংস্কার বিষয়ক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করি। যে-সকল জাতীয় সমস্যা মুখ্যত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক্তিয়ারভুক্ত, আমার অনুরোধ হিন্দু-মহাসভা যেন অহেতুক ভাবে তাহাতে জড়াইয়া না পড়ে।

আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে কংগ্রেসের ঐক্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ড. মুঞ্জে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন হিন্দু বাংলা তাঁহার সহিত একমত হইবে না। তাঁহার এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকিলে আমি তাঁহার সহিত সমস্ত বাংলাদেশ ভ্রমণ করিতে এবং একই মঞ্চ হইতে বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত আছি। তাহা হইলেই ভারতবর্ষ বিচার করিতে পারিবে যে কে বিশ্বস্ততার সহিত হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। ড. মুঞ্জের নিকট আমার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান রহিল।

১ জানুয়ারি ১৯২৮

স্মরণ : হাকিম আজমল খান

৪ জানুয়ারি ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রদত্ত ভাষণ।

একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক কর্তব্যের দায়িত্ব আমার উপর পড়িয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মাতৃভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত সেবক হাকিম আজমল খান-এর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ গভীর শোকমগ্ন। হাকিমজীর মৃত্যু জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের একটি অপূরণীয় ক্ষতি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সমস্যার সমাধানে তাঁহার অমূল্য সেবা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত থাকিবে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত ঐক্য প্রস্তাবের শুভ ফল হাকিমজী দেখিয়া যাইবার অবসর-টুকু লাভ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু সুখের মৃত্যু হইতে পারিত।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই যখন স্বরাজ দল ঘোষিত হয় তখন বহু নেতাকেই জনতার অসন্তোষ কুড়াইতে হইয়াছিল। সেই সময় জমায়েৎ-উল-উলেমার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বরাজ দলে যোগদান করিয়া হাকিম আজমল খান তাহার আদর্শের প্রতি অদম্য দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখিয়া-ছিলেন। হাকিমজী ছিলেন স্বরাজ দলের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। ভারতবর্ষ স্বরাজলাভ করিলে নিজেদের স্বার্থ যথার্থভাবে রক্ষিত হইবে না— বহু মুসলমান এই ধারণা পোষণ করিতেন। পক্ষান্তরে হাকিমজী সর্বদা বিশ্বাস করিতেন যে স্বরাজ ব্যতিরেকে ভারতের কোনো শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। ইউরোপ-পরিভ্রমণ কালে বিভিন্ন পশ্চিমী দেশের রাজনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হাকিমজীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে যদি মুসলমানেরা ইসলামকে যথার্থ সেবা করিতে চান তাহা হইলে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সত্যকার মুসলমান মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য হইতেছে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করা। হাকিমজীর জীবন হইতে এই শিক্ষাই গ্রহণ করা যায়।

রাজবন্দী তহবিল

বাংলার ছাত্রদের নিকট আবেদন

বাঙালীদের অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণ অবহিত আছেন। বাংলা সরকারের শেষতম বিবৃতিতে জানা যায় এখনো ১০১ জন রাজবন্দী জেলখানায় কিম্বা নিষেধাজ্ঞার কবলে রহিয়াছেন। রাজবন্দী, প্রাক্তন রাজবন্দী এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার জন্য সাহায্যদান আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের প্রদেশের যুবশক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের জন্য গভীর-ভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত আর কেহ মর্মপীড়া অনুভব করিবেন না। সেই কারণে বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজের যুবকগণ অগ্রসর হইয়া বর্তমান পরিস্থিতিতেই তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করিবেন, আমি এই প্রত্যাশা করিতেছি। প্রতিটি কলেজের ছাত্রের নিকট এক টাকা এবং প্রতিটি স্কুলের ছাত্রের নিকট আট আনা সাহায্যের বিনীত দাবি আমি জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস আছে যে এই দাবি মিটাইলে আমরা যে তহবিল গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহার একটি বৃহৎ অংশ এইভাবে সংগ্রহ করিতে পারিব।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের নিকট আমার আন্তরিক আবেদন তাঁহারা যেন রাজবন্দী তহবিলে অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিবার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

৫ জানুয়ারি ১৯২৮

বিবৃতি

স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় ৫ জানুয়ারি ১৯২৮ তারিখ প্রকাশিত এন. এন. সরকারের "গভর্নর ও ফরওয়ার্ড" শীর্ষক প্রবন্ধের জবাবে মিঃ সরকারের মসৃণ লেখনী আবার সরব হইয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব-অনুসৃত অভ্যাস অনুযায়ী যদি তাহা জাতীয় আদর্শের অনুকূলে নিয়োজিত না হইয়া আমাদের এই হতভাগ্য প্রদেশের আইন ও শৃংখলার প্রভুদের সেবায় নিয়োজিত হয়, তাহাতে আমাদের অবাক হইবার কিছু নাই। দেশবাসীর নিকট ইহাই অদ্ভুত মনে হয় যে সংবাদপত্রে মিঃ সরকারের বিবৃতি ভুলেও ঠিক পথ অনুসরণ করে না।

মিঃ সরকার সাধারণ বিলাতী রন্ধনের একজন বিশিষ্ট স্বার্থহীন সমঝদার কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার দেশবাসীগণ— তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদেশে বসবাস করিয়াছেন তাঁহারাও ভিনিগার-বর্জিত আদা, গোলমরিচ সহকারে প্রাচ্য প্রথায় তৈয়ারি আহার্য তৃপ্তির সহিত ভোজন করেন। সাহিত্য-শৈলী ভোজন-রুচির মাপকাঠি হইলে, মিঃ সরকার যে বলিয়া থাকেন তাঁহার রুচি বাস্তবিকই 'সাধারণ', ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ। বিদেশী ভাষায় যদি কেহ নির্ভুল ও অপ্রতিহতভাবে বলিতে লিখিতে না পারেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা এমন কিছু দোষের মনে করি না। সময়ের দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে এবং দুই-এক দশকের মধ্যে মিঃ সরকারের দেশবাসীগণ ইংরাজী ব্যাকরণ বা বাচনশৈলীর ভুল প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে না পারিলে ক্ষমার চোখে দেখিবেন। নেসফিল্ড অথবা মেমরডি মিঃ সরকারের অথবা আমার সমকালীনদের রুজি-রোজগারে সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিপথে যে নূতন প্রজন্ম বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহাদের জীবিকা উপার্জনে বিশেষ কিছু সহায়তা করিতে পারিবে না। আর যদি মিঃ সরকার মনে করেন যে তাঁহার ভাষা এবং লিখন-শৈলী শুভ্রতায় সমুজ্জ্বল, সেটা হয়তো একটু বেশি ভাবা হইয়া যাইবে, কারণ নির্মম সমালোচকেরা অতি সহজেই তাঁহার এই মোহ ভাঙিয়া দিতে পারিবেন।

৬ জানুয়ারি ১৯২৮

সাইমন কমিশন ও বয়কট

ভাষণ

১

১১ জানুয়ারি ১৯২৮ নারায়ণগঞ্জের আইনব্যবসায়ীদের সভায় প্রদত্ত।

১৯২৮ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং সাইমন কমিশন বয়কট সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। এই কর্তব্য সম্পাদন করিলে ভারতে অবশ্যই স্বরাজ আসিবে। বিলাতী বস্ত্র এবং লবণ বয়কট করিয়া বাংলা বিভাগ রদ করা হইয়াছিল সেই কথা আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

২

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সভায় প্রদত্ত।

মিলসার কমিশন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া যেমন মিশরবাসী সুফল পাইয়াছিলেন, তেমন তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া যে-কোনো ভাবেই হউক-না কেন রয়াল কমিশন (সাইমন কমিশন) বয়কট করিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার এবং সেই সূত্রে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রস্তাবের প্রসঙ্গে আমি দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বান্তঃকরণে সেই প্রস্তাব সকলকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। এই প্রস্তাবই দেশে স্থায়ী শান্তি আনিবে।

দেশের সম্মুখে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী তুলিয়া ধরিয়া কর্মীদের পুরানো কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আহ্বান জানাই এবং এই কাজের জন্য বিশেষভাবে বাংলাদেশের যুবশক্তির নিকট আবেদন করিতেছি। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতে চাই, ব্রিটিশ বস্ত্র ও লবণ বয়কটের জন্য প্রবল আন্দোলনের পথেই স্বরাজ আমাদের করতলগত হইবে, কারণ এই নীতিরই

প্রয়োগ চীনে সফল হইয়াছে। জনসাধারণ এই কর্মসূচী অনুসরণ করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের কঠোর সংগ্রাম অব্যর্থভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছে।

১৭ জানুয়ারি ১৯২৮

৩

খিদিরপুর সারস্বত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্যোগ পরিদর্শন উপলক্ষে প্রদত্ত।

জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মুক্তি (বন্ধন মোচন)। মুক্তি বা বন্ধনমোচনের আদর্শ যাহাই হউক-না কেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য অংশবিশেষ।

নিরপেক্ষ নয়

সাইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দ সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্বার্থ-সচেতন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে কমিশনকে কখনোই 'নিরপেক্ষ' বলা যাইতে পারে না। যদি নিরপেক্ষ মানুষের খোঁজ করা যাইত, ল্যাপল্যান্ডে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে তাঁহাদের সন্ধান মিলিত— যাঁহাদের অজ্ঞতাই তাঁহাদের 'নিরপেক্ষতার' কারণ হইত। আর এই পার্লামেন্টারি কমিশনের পক্ষে ভারতবর্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের উপযোগী কিনা অথবা তাঁহারা নিজেদের সংবিধান রচনা করিতে পারেন কিনা—এই বিচারের ক্ষমতা এবং অধিকারই বা তাহাদের কোথা হইতে আসিল।

২৯ জানুয়ারি ১৯২৮

৪

৩০ জানুয়ারি ১৯২৮ হ্যালিডে পার্কের সভায় প্রদত্ত।

আমরা সর্বতোভাবে সফল পূর্ণ 'হরতাল' পালন করিতে পারিলে ইংরাজ শাসকদের এবং বিশ্ববাসীর নিকট ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ করা হইবে। আমাদের সংগ্রামের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ। আমরা নিরস্ত্র এবং দুর্বল হইলেও সপ্রমাণ করিব যে আমাদের আত্মশক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে।

পরাধীনতার নিপীড়ন সম্বন্ধে আমরা সচেতন এবং আমরা স্বরাজ লাভে দৃঢ়-সংকল্প।

আমরা বিচার করিব

আমাদের কর্তব্য কী? আমরা সাইমন কমিশন বয়কট করিতে চাই কেন? একবার ভাবিয়া দেখুন বিদেশী সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি কমিশন— ধরুন, ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত— ইংরেজদের স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা তদন্তের জন্য ইংলন্ডে উপস্থিত হইলে, ইংরেজরা তাঁহাদের কিরূপ সম্বর্ধনা দিবেন? ইংরেজরা তাঁহাদের দেশে যে অধিকার ভোগ করেন আমরাও সেই অধিকার ভোগ করিতে চাই। তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য, তোমরা যেমন তোমাদের দেশে স্বাধীন আমরাও তেমনি আমাদের দেশে সেই স্বাধীনতা চাই। তোমরা আমাদের উপর তোমাদের মত চাপাইয়া দিতে চাও কেন? আমরা এই রকম উদ্ধত দাবি বরদাস্ত করিব না। পৃথিবীর সকল স্বাধীন জাতির মতোই জার্মান ফরাসী অথবা আফগানই হউক— তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে তাঁহাদের যে-সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ রহিয়াছে আমরা আমাদের দেশে স্বাধীন দেশের মতোই সেই-সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে চাই। আমরা ইহা হইতে বিন্দুমাত্র কমও চাহি না, বেশিও চাহি না।

নিরপেক্ষতার ধোঁকা

কমিশন নিয়োগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে অন্যত্র জনসাধারণের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবার জন্য নিরপেক্ষতার এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের ধোঁকা সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের স্বার্থ এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী। স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ইংলন্ড কখনোই ভারতের কোনো কল্যাণ করিবে না, লর্ড লিটনের এই উক্তিতে একটি সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরাজ আদায় করিয়া না লইতে পারিলে তাহা কখনোই ভারতীয়দের করায়ত্ত হইবে না।

বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান এবং শিখেরা সমবেতভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে কমিশনের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক থাকিবে না। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি, হিন্দু-মহাসভা, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং অন্যান্য সকল বৃহৎ সংগঠনগুলি একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে— তাহারা সাইমন কমিশন বয়কট করিবে।

১৯২১ সালের মতো হরতাল সফল হইবে কিনা যাঁহাদের মনে এই সন্দেহ রহিয়াছে, তাঁহাদের নিশ্চিন্ত করিয়া বলিতে চাই যে এইবারের হরতাল অধিকতর সফল হইবে, কারণ ১৯২১ সালে সকল দল ঐক্যবদ্ধ ছিল না। উদারপন্থীরা এইবার বয়কটের সপক্ষে রহিয়াছেন, ১৯২১ সালে তাঁহারা বয়কট হইতে দূরে রহিয়াছিলেন। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতীয় জাতি এই প্রকার সুযোগের সম্মুখীন হয় নাই।

আর অবশিষ্ট কয়েকদিনের মধ্যে, আপনারা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলে এক অভূতপূর্ব হরতাল পালন সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবেন।

ইংরেজদের প্রভাবিত করিবে

অনেকেরই প্রশ্ন, হরতাল পালন করিলে তাঁহাদের কী লাভ হইবে? ইহা ইংরেজদের কীভাবে প্রভাবিত করিবে? হরতালের সংবাদ ইংলন্ডে পেঁছাইবে তো? এই সংবাদ ইংলন্ডে অবশ্যই পেঁছাইবে। স্টেট্সম্যান পত্রিকা হয়তো লিখিবে, হরতাল ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা, যাঁহারা সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন, খাঁটি সংবাদই দিবেন। সেই রিপোর্ট সমুদ্র পার হইয়া বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাটের নিকট পেঁছাইবে। ঠিক যেমন 'প্রিন্স অফ ওয়েলস'-এর ভারত-পরিদর্শনের সময় হরতালের সংবাদ সম্রাটের নিকট পেঁছিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই হরতালের সংবাদ সমুদ্রপার হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। রবিবারের 'ফরওয়ার্ড'-এ প্রকাশিত একটি তারবার্তায় জানা যায়, লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে কলিকাতায় ব্যাপক হরতাল পালিত হইবে। সর্বতো-ভাবে সফল হরতাল পালিত হইলে ইংরেজদের, ব্রিটিশ সরকারের এবং বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের নিকট প্রমাণিত হইবে যে ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে ভারতীয়রা প্রতিবাদে সমবেতভাবে মুখর।

তাঁহাদের অস্ত্রের কোনো প্রয়োজন নাই, তাঁহারা সেদিন হিংস্রতার কিম্বা আইন ভাঙিয়া বিশৃংখলার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। সেদিন ছাত্রগণ স্কুলে যাইবেন না, দোকানদারগণ দোকান খুলিবেন না, আইনজীবিগণ আদালতে যাইবেন না; বস্তুতপক্ষে, তাঁহারা সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হরতাল পালনের উদ্যোগ করিবেন। এইভাবে তাঁহারা সপ্রমাণ করিবেন

নিরস্ত্র হইলেও তাঁহাদের আত্মিক শক্তি জাগ্রত হইয়াছে, পরবশতার পীড়ন সম্পর্কে তাঁহারা সচেতন এবং তাঁহারা এখন স্বরাজ অর্জনে বদ্ধপরিকর।

'স্টেট্সম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মতে হরতাল অবিবেচনাপ্রসূত কাজ। তাঁহারা হরতাল সম্পর্কে এত ভীত কেন? তাঁহারা (হরতালের সমর্থকরা) সেদিন ঘরে থাকিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং কাহারো কোনো ক্ষতিসাধন না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এই ভয়ের কারণ কী? ইহার কারণ, হরতাল স্বার্থহীনভাবে ঘোষণা করিবে যে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। যেদিন তাঁহারা (হরতালের সমর্থকরা) এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবেন, 'স্বরাজ'-ও তাঁহাদের করতলগত হইবে।

আমাদের মোহ

এত বৃহৎ দেশের উপর মুষ্টিমেয় ইংরাজের শাসনের চাবিকাঠিটা কী? চাবিকাঠিটি অন্য কিছু নহে, ভারতবাসীর মনে একটি মোহ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, ইংরেজরা শ্রেষ্ঠতর জাতি এবং ভারতীয়রা এমনই অপদার্থ, ঘৃণ্য, নিম্নস্তরের মানুষ যে তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকারেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। এই মোহ জনসাধারণের মনে দানা বাঁধিয়া থাকার ফলে ইংরেজদের পক্ষে শাসনব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। যেদিন ভারতীয়রা বুঝিবেন যে তাঁহারা, ইংরেজদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যদি না-ও হন, সমকক্ষ তো বটেই, ইংরেজরা বুঝিবেন তাঁহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই কারণেই 'হরতাল'-এ তাঁহাদের এত ভয়। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে, সকল দল ও শ্রেণীর মানুষ সেদিন প্রমাণ করিবেন তাঁহারা ব্রিটিশ শাসন চান না, চান স্বাধীনতা।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই বিক্ষোভের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত; তাঁহারা (ভারতীয়রা) শুনিতে পান যে তাঁহাদের চরম নির্দেশ দানের প্রস্তুতি চলিতেছে। ইহা সত্য হইলেও তাঁহারা সেজন্য মাথা ঘামাইবেন না। কারণ যদি গভর্নমেন্ট আগুন লইয়া খেলিতে চায়, সেই আগুনে তাঁহারা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবেন। জনসাধারণ এই আগুনে আহুতি দিবার মতো কোনো কাজ করিবেন না। কারণ তাঁহাদের কর্মসূচী শান্তিপূর্ণ।

গভর্নমেন্ট নির্ধারিত সময়ের দুই বৎসর পূর্বে করুণা দেখাইবার জন্য কমিশন প্রেরণ করেন নাই! ইহার কারণ দুইটি: প্রথমত, তাঁহাদের ধারণা

হিন্দু ও মুসলমানগণ বর্তমানে পরস্পর কলহে মত্ত রহিয়াছেন, এই সময় একটি কমিশন পাঠাইলে এই দুই সম্প্রদায় সেই কমিশনের নিকট কৃপাপ্রার্থীর মন লইয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ বাণিজ্যে বর্তমানে মন্দা চলিতেছে, প্রতিবেশী দেশগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। উপরন্তু যুদ্ধের আশংকা সর্বদাই মাথার উপর ঝুলিতেছে। কখন যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে, কেহই তাহা সঠিক বলিতে পারেন না। সুতরাং, ইত্যবসরে ইংরেজরা যে-কোনোরকম আপস-রফার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। সাইমন কমিশন কোনো মীমাংসায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে ইংরেজদের সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাঁহারা আরো নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

সুতরাং এখন ভারতীয়দের স্থির করিতে হইবে কী প্রকার মীমাংসায় তাঁহারা রাজী হইবেন। ইহা নির্ভর করিবে তাঁহারা কোন্ প্রকৃতির স্বরাজ চান তাহার উপর। দুই-আনার, চার-আনার, না ষোলো-আনার স্বরাজ? এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে যাহা দাবি করিবেন, তাহাই অনিবার্য ভাবে গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তাহা ভালোবাসার বা দাক্ষিণ্যের হইবে না, নিছক বাধ্য হইয়াই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রিটিশ জনসাধারণ আসন্ন ধ্বংসের মুখে দিন যাপন করিতেছেন, আত্মরক্ষার তাগিদেই তাঁহারা ভারতবর্ষকে শান্ত রাখিতে চাহিতেছেন। সাইমন কমিশন ভারতে আসিতেছে ভারতবাসীদের শান্ত রাখিতে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন স্বরাজ লাভের জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইলে ইংরেজদের পক্ষে তাহাতে সম্মতি দান ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। সমগ্র জনসাধারণ বর্তমান মনোভাব অটুট রাখিলে ইংরেজদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের সংবিধান রচনা করিতে পারিবে।

যে বৃহৎ সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে তাহার প্রথম ধাপ ভারতবর্ষে সকল নগরে, শহরে এবং গ্রামে 'হরতাল' পালন। ইহা বিশ্বের নিকট ঘোষণা করিবে ভারতীয়গণ সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনো বিবাদ, বিরোধ থাকিলে নিজেরা অবশ্যই তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন। ইংরেজরা বর্তমানে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের দেশে কি পারস্পরিক বিরোধ-বিসম্বাদ ছিল না? তাঁহাদের দেশে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের বিরোধ অস্বীকার করিবার পথ কোথায়? তাঁহাদের

আভ্যন্তরীণ বিরোধ-বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য কোনো বিদেশীদের তো তাঁহারা ডাকিয়া আনেন নাই, নিজেরাই ইহার মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। একই ভাবে ভারতবাসীরাও তাঁহাদের পারস্পরিক বিরোধ সমূহ মিটাইয়া লইবেন।

নিজেরা মিটাইয়া লউন

হিন্দু এবং মুসলমানেরা পরস্পর দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া কারাভোগ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ইংরেজদের আদালতে তাঁহাদের বিরোধ মিটে নাই। তাহা ঘটিলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইত। ইংরেজরা কখনোই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-সাধন করিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাদের স্বার্থের গোড়ায় নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেন। এই-প্রকার বিরোধ হিন্দু এবং মুসলমানগণ অতীতে নিজেরাই মিটাইয়া লইয়াছেন, ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন। বর্তমানে নিজেদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের ভাবিতে হইবে। বিধাতা তাঁহাদের সম্মুখে এক বিরাট সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা কখনোই এই সুযোগ হাতছাড়া করিতে পারেন না!

কলিকাতার জনসাধারণ আমাদের আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়াছেন। আগামী পাঁচ-ছয়দিন এই শহরের হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ নাগরিকগণ সমবেতভাবে কঠোর পরিশ্রম করিলে এমন ব্যাপক হরতাল সম্ভব করিয়া তুলিবেন যাহা ১৯২১ সালের মহতী হরতালকেও নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে বলিয়া শত্রুরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

৫

প্রচার সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন

৩০ জানুয়ারি ১৯২৮ হবিশ পার্কে প্রদত্ত।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহ কর্তৃক হরতালের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রবল ও অবিশ্রান্ত প্রচারের পর, যাহা পালনের জন্য সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একবাক্যে ভারতবাসীগণ আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি মনে করি না এ সম্পর্কে আর কোনো ব্যাখ্যার বা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

গভর্নমেন্ট বয়কট ও হরতাল সম্বন্ধে প্রকৃতই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা যে-কোনো-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিবেন। গুজব শোনা যাইতেছে যে শহরে ও মফঃস্বলে বিভেদ সৃষ্টির ও বিশ্বাসঘাতক চাটুকারদের উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিবার জন্য চরদের অর্থ দিয়া পাঠানো হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি ভারতবাসীই এই চতুরতা সম্পর্কে অবহিত আছেন। প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত-সফরের সময় এই প্রতারণার চেষ্টা হইয়াছিল। তথাকথিত নেতাদের নামে বড়বাজার অঞ্চলে এবং মুসলিমদের মধ্যে জাল ইস্তাহার বিলি করিয়া এই কার্যসূচীর (বয়কট ও হরতাল) মূর্খতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। একটি ইস্তাহারে প্রচার করা হইয়াছিল যে বয়কটকারীকে 'কাফের' রূপে চিহ্নিত করা হইবে। যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৯৪ ভাগই মুসলমান, সেই মিশরে কি মিলনার কমিশন বয়কট করা হয় নাই? মিশরীয়রা সেজন্য 'কাফের' বনিয়া গিয়াছিলেন? তুরস্ক এবং আফগানিস্তান কি স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সহিত সংগ্রাম করে নাই? তাহারা কি 'কাফের' বনিয়া গিয়াছে? হরতাল পালন করিয়া আমরা প্রমাণ করিতে চাই যে একদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধ। ইহা আমাদের দাবিতে শক্তি সঞ্চার করিবে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে নতি স্বীকার করাইবে।

মিথ্যা গুজব

ট্রাম কর্মচারীদের হরতালে যোগদানে বিরত করিবার জন্য এই মর্মে একটি মিথ্যা গুজব ছড়ানো হইতেছে যে করপোরেশন ট্রাম কোম্পানির ইজারার মেয়াদ ষাট বছর বাড়াইয়া দিয়াছে। করপোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে ইহা মিথ্যা। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রয় করিবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের জন্য নগরপিতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

একটি সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান শহর কলিকাতার নাগরিক আমরা। আমাদের পক্ষে ঐক্যের সহিত সংগতি রাখিয়া সফল হরতাল পালন গৌরবের হইবে। আমি সকলকে গৃহে অবস্থান করিয়া শান্তিপূর্ণ থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি আমার দেশবাসীদের নিকট এই সংগ্রামের সুযোগ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাইতেছি, যে-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে প্রবলভাবে বেগবান করিয়া তুলিবে।

৬

১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ উল্টাডিঙি বাজারে হরতাল ও বয়কটের জন্য আয়োজিত সভায় প্রদত্ত।

বাংলার প্রতিটি গ্রামে ও শহরে ৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হরতাল পালিত হইবে। শুধু বাংলায় কেন সমগ্র ভারতবর্ষেই। কংগ্রেস, খিলাফত, মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, লিবারেল ফেডারেশন এবং ভারতবর্ষের সকল দল ও সম্প্রদায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহাতে একমত হইয়া এই ঘোষণা করিয়াছেন।

বেকার সমস্যা, সরকারের ধ্বংসাত্মক নীতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনকে হীনবল করিয়া তুলিয়াছে। স্বরাজলাভ করিতে পারিলেই সর্বক্ষেত্রে আমাদের হৃত গৌরব ফিরিয়া পাইব। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই ব্রিটিশ শাসনের ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি বিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে সমগ্র জাতির সহিত একাত্ম হইয়া অসম্মানের বোঝা বহন করিতে তাহাদেরই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

আমি সেদিন বিকাল সাড়ে-চার ঘটিকা পর্যন্ত সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখিবার জন্য সকলের নিকট আবেদন করিতেছি। ছাত্ররা স্কুলে যাইবেন না, আইনজীবীরা আদালতে যাইবেন না, সকল-প্রকার যানবাহন গ্যারেজ হইতে বাহির হইবে না এবং দোকানদারগণ তাঁহাদের দরজা বন্ধ রাখিবেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানের মধ্য দিয়া যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহার তুলনায় এই ত্যাগও খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়া থাকিবে।

৭

১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ আমড়াতলায় গুজরাতী যুব সমিতি-আয়োজিত সভায় প্রদত্ত।

আমাদের পরাধীনতার ইতিহাসে একটি সর্বজনসম্মত পতাকাতলে সমবেত হইবার অভূতপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাতির ঐক্যবদ্ধ সংকল্প ব্যক্ত করিবার সর্বোত্তম মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। এমনই পরিস্থিতি যে উদারপন্থীদেরও মোহভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের সহিত সমমত হইয়া স্বীকার করেন, আমাদের মাতৃভূমিতে আমরাই দাসবিশেষ। ইংলন্ডে কোনো গোলমাল কিম্বা

বিরোধ দেখা দিলে তাহা মীমাংসার বা সালিশীর জন্য কোনো বিদেশীর ডাক পড়ে না। কিন্তু আমাদের দেশে পুলিস এবং বিদেশীরা বিচারক হইয়া দাঁড়ায়।

তাহারা আসে কেন

কমিশন আসিতেছে কেন? নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গলের জন্য নহে। আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য এবং দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার চাপে তাহাদের এই আগমন। আগামী চার বৎসরের মধ্যে ইংলন্ড, জার্মানী অথবা রাশিয়াকে জড়াইয়া যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হইবে না যে এই-প্রকার ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য পাইবে। সুতরাং তাহারা আমাদের তোয়াজ করিতে চায়। কিন্তু আমাদের দাবি আদায়ের জন্য কঠিন এবং দৃঢ়-সংকল্প হইতে হইবে। আর্থিক অবরোধ আমাদের হাতে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট অস্ত্র। এই নীতির প্রয়োগে তাহারা নতজানু হইতে বাধ্য হইবে কারণ এই আর্থিক অবরোধ দ্বারাই আমেরিকা, ইংলন্ড ও ফ্রান্স জার্মানীকে ১৯১৯ সালে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিয়াছিল। মাতৃভূমির জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। এই হরতাল দেশের আদর্শ পরিপূরণের জন্য, ইহার সাফল্যের গৌরব এবং আনন্দ আমাদের উপর বর্তাইবে। ১৯২১ সালের তুলনায় এই হরতাল ব্যাপকতর। ইহার সাফল্য আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম বিজয় আনিয়া দিবে।

৮

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে প্রদত্ত।

অদ্য আমরা ইংরেজের আইন ও শৃঙ্খলাবোধের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। আমরা অহরহ ব্রিটিশ শাসনে আরোপিত শান্তির কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু ইহা কি গ্রেট ব্রিটেনের অনুকরণ?

'ইংলন্ড নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া ভারতবর্ষের কোনো কল্যাণ করিতে পারিবে না' একদা লর্ড লিটনের এই উক্তি নিরেট সত্যকেই ব্যক্ত করিয়াছিল।

ব্রিটিশ রাজের নমুনা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ চরিত্রের

পরিষ্কার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আশা করি আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে প্রতিচিহ্নরূপে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। আমাদের নিকট হইতে সামান্য বাধা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাঁহাদের নিহিত পশুশক্তি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ভাষা তাহাকে ব্যক্ত করিতে ব্যর্থ হইবে। ইহাকে আমরা গুণ্ডা রাজ, পুলিস রাজ আথবা মিলিটারী রাজ বলিতে পারি।

আমি আইনজীবী নহি, রাজদ্রোহের আইনটা কী তাহা আমি জানি না। যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা ব্যক্ত করিতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। ব্রিটিশ-রাজ অদ্য যে-প্রকার রাজের নমুনা আমাদের দেখাইলেন, তাহা গুণ্ডারাজের পরিবর্ধিত সংস্করণ। ইংরেজের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নাই।

আমাদের নিকট সকল মানুষই ভ্রাতৃতুল্য। যদি ইংরেজদের স্বাধীন জাতি-রূপে বাঁচিবার অধিকার থাকে আমরাও সেই অধিকার দাবি করিতে পারি। ইংরেজ, ফরাসী, আফগানদের বাঁচিবার অধিকারের দাবি ব্যতিক্রম না হইয়া থাকিলে আমরা সেই অধিকার হইতে কেন বঞ্চিত হইব ?

ব্রিটিশদের ভয় করি না

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা অতঃপর ব্রিটিশদের ভয়ের চোখে দেখি না। তাঁহাদের বিমান, মেশিন গান, খাড়া বেয়নেট-এর সহিত যথেষ্ট পরিচিত, যদিও সাবমেরিনের সহিত নহে। আমি বরাবরই আশাবাদী। কোনো কোনো বিষয়ে আমরা ইংরেজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আমরা শক্তির আধারবিশেষ। আমি আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কখনোই ভাবি নাই যে, কলিকাতার নাগরিকগণ আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সহিত এই-প্রকার অসামান্য সাফল্য লইয়া কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন ; দেশ কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহা যুবক ও বৃদ্ধদের অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তরণ চূড়ান্তরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। দশ বছর পূর্বে এই-প্রকার বিপুল সাফল্য লাভ অসম্ভব ছিল। ভারতীয়দের মতো পরাধীনদের জীবনে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল বিরল সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই কমিশন ইংরেজদের কোনো দান নহে। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে আপস অবশ্যই সংঘটিত হইবে। যদি আমরা আমাদের পারস্পরিক বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ দাবি তাঁহারা সবই মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। আমাদের মিটমাটের সম্ভাবনায়

গভর্নমেণ্টকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। বাংলার পাঁচকোটি মানুষ নিশ্ছিদ্র-রূপে সংঘবদ্ধ হইলে, জয় আমাদের সহজলভ্য হইবে। এই মুমূর্ষু জাতি মেষের মতো মৃত্যুকে বরণ না করিয়া মানুষের মতো মৃত্যুকে বরণ করুক।

বিবৃতি

স্বেচ্ছাসেবকদের অতুলনীয় আচরণ

আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের গত কয়েকদিনের কাজ পর্যালোচনার পর আমার মনে তাঁহাদের প্রতি যে কৃতজ্ঞতাবোধ উদ্‌বেলিত হইতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহারা অতুলনীয় আচরণের, নিখুঁত শৃঙ্খলাবোধের, অব্যর্থ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। হরতালের সাফল্য মূলত তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফল এবং সেই জন্য আমি গর্ববোধ করিতেছি। দারুণ প্ররোচনায় এবং পুলিস সার্জেন্টদের হিংস্র পীড়নের মুখে তাঁহারা যে আত্মসংযম, মানসিক দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি আশা রাখি অতঃপর তাঁহারা আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর স্থায়ী সদস্যভুক্ত হইয়া কংগ্রেসের জন্য কাজ করিয়া যাইবেন।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ভারতবর্ষ কী চায়!

ফরওয়ার্ড-এর প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার।

স্যার জন সাইমনের বিবৃতি কাহাকেও স্বমতে আনিতে পারিবে না। রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে কোনো ভারতীয়কে বয়কটের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মত করাইবার মতো ইহাতে কিছুই নাই।

কমিশনের সহিত একই টেবিলে গোল হইয়া বসিয়া তাহার সভাপতিরূপে মিঃ জন সাইমনের বক্তব্য শুনিবার অধিকার অর্জনের জন্য আমাদের সংগ্রাম নহে।

ভারতীয় দাবি

স্যার জন ভারতীয় পরিষদের কমিটিগুলিকে কমিশনের সকল কাগজপত্র এবং দলিল দেখিবার এবং কমিশনের সকল বৈঠকে ও আলোচনায় যোগদানের অধিকারও দিবে না— কিন্তু এই অধিকারও আমরা যাহা দাবি করিতেছি, তাহা ব্যক্ত করে না। ভারতীয় পরিষদগুলিতে অথবা যুগ্ম পার্লামেন্টারি কমিটিতে, অথবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট দাখিলের অধিকারই আমাদের জাতীয় দাবি নহে। আমাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট এবং আমাদের মনোভাবও দ্ব্যর্থহীন। আমরা আত্মস্বাতন্ত্র্যের নীতিকে গ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা দাবি করি যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে এবং নিজেদের সংবিধান রচনা করিবে। মুদিম্যান কমিটির সংখ্যালঘু রিপোর্টের ক্ষেত্রে যে-রকম করা হইয়াছিল, সেই-রকম বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোনো রিপোর্ট দাখিল করা অবান্তর। ভারতবর্ষ নিজেদের সংবিধান নিজেরাই রচনা করিবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কর্তব্য হইবে পার্লামেন্টে আইন করিয়া তাহা হুবহু গ্রহণ করা অথবা এই সন্ধি চুক্তিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া। এই দাবি হইতে আমরা এক চুলও নড়িব না।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

জাতীয় ফিল্ম

ছায়া-ছবিতে 'দেবদাস'

আমেরিকায় এবং ইংলন্ডে বিদেশী ফিল্ম আমদানীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হইয়াছে। আমাদের দেশেও সেই ধরনের আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত। বাঙালীরা যদি সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা কোনো বিদেশী ফিল্ম দেখিবেন না, তাহা হইলে সিনেমা কোম্পানিগুলি দেশী ফিল্ম প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইবেন এবং বিদেশীদের পকেটে প্রচুর অর্থ যাওয়া বন্ধ হইয়া সেই অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইবে।

দেশে নৈতিক শৈথিল্য আনিয়া দেয় এই-প্রকার ফিল্ম যাহাতে না দেখানো হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের দেশের সেনসর বোর্ডের কর্তব্য। তাহার পরিবর্তে সেনসর বোর্ড যে-সকল ফিল্ম জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ করে সেইগুলি দেখানো বন্ধ করিতেছেন। ভারতীয় কোম্পানি গঠিত হইলে জাতীয় সাহিত্য হইতে ফিল্মের কাহিনী চয়ন করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে প্রভৃত সাহায্য করিবে।

আমি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যেন বিদেশী ফিল্ম না দেখেন। আমি ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট কোম্পানির সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

আবেদন

নারায়ণগঞ্জ পৌর নির্বাচন উপলক্ষে
ভোটদাতাদের প্রতি আবেদন

নারায়ণগঞ্জ পৌর নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ পৌরসভার বারোটি আসনের মধ্যে আটটি নির্বাচনের মাধ্যমে ও বাকি চারটি মনোয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। ইহা সুস্পষ্ট যে কংগ্রেস অন্তত পক্ষে সাতটি আসন দখল করিতে না পারিলে একজন বেসরকারী ভারতীয়কে ঐ পৌরসভার চেয়ারম্যান রূপে পাওয়া সম্ভব হইবে না, পৌরসভার ওয়ার্ড ও কমিশনারদের সংখ্যা বাড়ানোও সম্ভব হইবে না। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসনের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ও নারায়ণগঞ্জের করদাতাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়াইতে হইলে পৌর প্রশাসনের সংস্কার সাধনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া একদল সুশৃঙ্খল লোকের পৌরসভায় প্রবেশ করা আবশ্যক। কংগ্রেসই একমাত্র সংগঠন যাহা পৌর প্রশাসনের উন্নতি ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া একদল লোককে নির্বাচনে দাঁড় করাইতেছে। অতএব নারায়ণ-গঞ্জের ভোটদাতাদের কর্তব্য সব ওয়ার্ডেই কংগ্রেস প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট দান করা। তাহা করিলে করদাতাদের প্রকৃত স্বার্থ ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করা হইবে। আমি আশা করি এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল কংগ্রেস প্রার্থীই সাফল্য লাভ করিবেন এবং তাহার ফলে প্রশাসন জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে আসিবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

ভাষণ

১

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ চুঁচুড়া ময়দানে প্রদত্ত।

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হাতিয়াররূপে অসহযোগ আন্দোলনের মূল্য কমে নাই। অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যলাভ করিয়াছে কিম্বা ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বলার সময় এখনো আসে নাই। শীঘ্রই সে সময় আসিবে, সম্ভবত ১৯৩০ সালের পর, যখন নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে যে জাতীয় আন্দোলনের এই পন্থা আর অনুসরণ করা হইবে না পরিত্যাগ করা হইবে।

গত বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে যে স্বাধীনতা প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ প্রস্তাব বিশ্বের দৃষ্টিতে ভারতের মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছে ও মানুষের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। কোরিয়ার মতো একটি ক্ষুদ্র পরাধীন দেশও স্বাধীন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা একসঙ্গে দুইটি আন্দোলন চালাইতেছি— সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলন। আমরা ৩ তারিখে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করিব। আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া পুলিসের নিপীড়ন বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষ দিন দিন শক্তিশালী হইতেছে। অপরপক্ষে ব্রিটিশ শাসন দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র আমরা যদি সফল-ভাবে বয়কট করিতে পারি তবে বর্তমান আন্দোলনের চাপে এবং ইংলন্ডের শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের চাপে সরকার ভারতবাসীদের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসা করিতে বাধ্য হইবে।

২

কেন এই কমিশন

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ চুঁচুড়ার টাউন হলে জেলা-কর্মীদের সম্মেলনে প্রদত্ত।

বর্তমান মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য উদ্‌যাপনের এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই যে এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের যাহা কাম্য তাহা সবই পাইব। আমাদের জাতীয় শক্তি অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রুর শক্তির

সংগে তুলনা করিয়া আমি আমাদের শক্তি বিচার করি। শত্রু প্রতিদিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। আমার বিশ্বাস, সাইমন কমিশন এ দেশে আসিয়াছে এ দেশের জনসাধারণের সংগে কোনো এক-প্রকার বোঝাপড়ায় আসার উদ্দেশ্যে। ভারতকে চিরস্থায়ী অসন্তোষের মধ্যে রাখিবার মতো অবস্থা তাহাদের নাই। ইংলন্ডের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কে যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা ভালো করিয়াই জানেন যে ইংলন্ডের বিপদের কাল আসিতে আর বেশি দেরি নাই। সেই বিপদের কালে বিক্ষুব্ধ ভারত তাঁহাদের গলায় পাথরের মতো ঝুলিয়া থাকিবে। এখন ভারতবর্ষের লোকদের একতাবদ্ধ হইতে হইবে ও নির্ভীকভাবে তাঁহাদের দাবি ঘোষণা করিতে হইবে। এখন যুবকদের আগাইয়া আসিতে হইবে ও কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইতে হইবে। বিক্ষিপ্ত জাতীয় শক্তিগুলিকে সংহত করিয়া তাঁহারা এক বিপুল শক্তি গড়িয়া তুলিবেন। ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট আমাদের হাতে আক্রমণের একটি অস্ত্র। আমরা এই অস্ত্র এমনভাবে প্রয়োগ করিব যে অবিলম্বে ইংরেজরা একটা বোঝাপড়ায় আসিতে বাধ্য হইবেন।

৩

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ হুগলি টাউন হলে প্রদত্ত।

হুগলি জেলার মানুষ এইমাত্র আমাকে যে বিপুল সম্মান জানাইলেন, আমি যে নিজেকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করি তাহা বলাই বাহুল্য। আমাকে সম্মান জানাইয়া যে মহান প্রতিষ্ঠান ও আদর্শের আমি একজন সামান্য সেবক মাত্র তাহাকেই আপনারা সম্মান জানাইয়াছেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু বহু শতাব্দীর সুষুপ্তির পর বাঙালী আজ জাগিয়া উঠিতেছে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই জাগরণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিতেছেন যে ইহা প্রকৃত জাগরণ, না, জাতির দেহে বিদেশী প্রভাব বিস্তারের ফলে সাময়িক চাঞ্চল্য মাত্র, যাহা সময় অতিবাহিত হইবার সংগে সংগে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু এই জাগরণ প্রকৃত, সাময়িক নয়। জাতির গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস অভ্রান্তভাবে এই সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙালী জাতির একটি মিশন আছে যাহা তাহাকে পূরণ করিতে হইবে। এবং তাহা না করা পর্যন্ত

এই জাতি মরিবে না। আধ্যাত্মিকতা আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য। কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রেও, যথা কলা, সাহিত্য, বাণিজ্য ও শিল্প-ক্ষেত্রেও বাঙালীকে স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল অবদান রাখিতে হইবে।

বাঙালীর আবেগপ্রবণতা

প্রায়ই বলা হয় যে বাঙালীরা আবেগপ্রবণ ও আদর্শবাদী। হাঁ, তাহারা তাহাই। যদি তাহারা ঐরূপ না হইত তবে তাহারা দুঃখ, দুর্ভাগ্য, বিপদ ও অসুবিধা— যাহা চারিদিক হইতে লোকেদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে— তাহার ভিতর দিয়া দূর দিগন্তে যেখানে তাহাদের জন্য গৌরবময় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিত কিভাবে? এই আদর্শবাদ ও আবেগপ্রবণতা— ইহাই ভারতবর্ষের জাতিসমূহের মধ্যে বাঙালীকে গৌরবময় স্থান দিয়াছে।

পৌর প্রশাসন

পৌরসভা ও অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থার দক্ষ প্রশাসনের জন্য অসামান্য গুণাবলীর অধিকারী হইবার দরকার নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে যাহা আবশ্যক তাহা হইল অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর নিরপেক্ষতা। জনসাধারণের মধ্যে এই কুসংস্কার আছে যে ঐ-সব সংস্থার দক্ষ প্রশাসনের জন্য আই.সি.এস. অফিসারদের দরকার। অক্লান্ত পরিশ্রম করিব ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইব এই প্রতিজ্ঞা যাহারা করিবে তাহারা ঐ-সব সংস্থার কাজকর্ম আই.সি.এস. অফিসারদের অপেক্ষা উত্তমরূপে সমাধা করতে পারিবে।

আঞ্চলিক সংস্থাগুলি সুসংগঠিত উপায়ে না চালাইলে উল্লেখযোগ্য কিছু লাভ করা সম্ভব নয়। পৌরসভা-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তারস্বরে যে কথা বলা হয় উহা মিথ্যা উক্তি ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই উহার উদ্দেশ্য। যাঁহারা ঐ-সব কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজেদের দেশে এই বিষয়ের প্রতি একবার দৃক্‌পাত করুন— বর্তমান কার্য-পদ্ধতির যৌক্তিকতা সেখানে মেলে কিনা। যদি একটি কর্মসূচী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইয়া তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হয় তবে জনসাধারণকে সংগঠিত ও সম্মিলিতভাবে তাহা করিতে হইবে। পৌর সংস্থাগুলি দখল করিতে পারিলে ঐ-সব ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচীর রূপদান করার সুবর্ণ সুযোগ তাঁহারা পাইবেন।

বেকারিত্ব ও অন্নাভাব— এই দুইটি সমস্যা জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই-সব সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ভারতকে স্বাধীন হইতেই হইবে। যে বিদেশী বণিকরা এ দেশে তাঁহাদের প্রাধান্য কায়েম করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের স্বজাতির হাতে এ দেশের শাসনভার না থাকিলে তাঁহারা আর শোষণ চালাইয়া যাইতে পারিবেন না। ভারতের জনসাধারণও জানেন যে তাঁহাদের হাতে শাসনরজ্জু না আসিলে জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি হইবে না এবং তাহা না হইলে দেশের অন্ন সমস্যা ও বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

ছাত্রদের ভূমিকা

বর্তমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্রদের বিরাট কাজ রহিয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে যুবকরাই স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়াছেন। কারণ যুবকদের দৃষ্টি-ভঙ্গি স্বচ্ছ, স্বার্থচিন্তা বা ব্যক্তিগত মতলবের দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

আমি সকলকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানাই।

৪

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় প্রদত্ত।

আমি আমার সামনে এই যে বিশাল জনসমাবেশ দেখিতেছি, সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনগণের মনোভাবের গভীরতা ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় দাবি সরকার না মানিয়া লওয়া পর্যন্ত আপনারা ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র, বয়কট করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন। ইংরেজদের মাথার উপর একটি বিদেশী কমিশন বসুক ও তাঁহাদের স্ব-শাসনের যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিচার করুক ইহা যেমন ইংরেজরা চান না তেমনই ভারতবর্ষের জনগণও সাইমন কমিশনকে চান না। এই কমিশন বিদেশীদের লইয়া গঠিত হইয়াছে ও ভারতবাসীদের স্ব-শাসনের যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিচার করিতে আসিয়াছে।

ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এমন-কি, ক্ষুদ্র আফগানিস্তানের জনগণও নিজ

নিজ দেশে যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন ভারতীয়রা শুধু সেই স্বাধীনতাটুকুই ভোগ করিতে চান। তাঁহাদের দাবি ইহার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। ভারতের দাবি ছিল তাহার প্রতিনিধিরা ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করিবেন, ইংলণ্ডও সেই সংবিধান মানিয়া লইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের দাবির স্বপক্ষে তাঁহারা সর্বপ্রযত্নে সংগ্রাম করিবেন।

ভারতবাসীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র নাই, কিন্তু তাঁহাদের কাছে একটি মারাত্মক অস্ত্র আছে, যাহা দক্ষতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে, অন্যান্য অস্ত্রের তুলনায় বেশি শক্তিশালী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই অস্ত্র হইল অর্থনৈতিক বয়কট। ইংরেজরা তাঁহাদের দাবি মানিতে অস্বীকার করিলে তাঁহারা ঐ অস্ত্র নির্মমভাবে প্রয়োগ করিয়া ইংরেজদের একটা মীমাংসায় আসিতে বাধ্য করিবেন।

আমি দেশের যুবকদের কাছে আকুল আবেদন জানাই : আপনারা হাজারে হাজারে আসিয়া জাতীয় কার্য গ্রহণ করুন। যদি আগামী দুই বৎসর দশ সহস্র যুবক জাতীয় কর্মসূচীকে রূপ দিবার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন, তবে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা 'স্বরাজ' লাভ করিতে পারিবেন। অবিরত ও অক্লান্ত ভাবে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার বাণী প্রচার করাই হইল সেই কর্মসূচী। তাঁহারা যদি জনসাধারণকে এই বোধে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন যে দাসত্বময় জীবন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়, তাহা হইলে আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব।

৫

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ দেশবন্ধু পার্কের সভায় প্রদত্ত।

আমরা অনুভব করিতেছি যে স্বরাজ আসিতেছে এবং ইংরেজরাও ইহা ভালোভাবে অনুভব করিতেছেন। সেইজন্যই ডুবন্ত লোক যেমন খড়কুটা ধরিয়া বাঁচিতে চায় তাঁহারাও সেইরূপ শেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই আক্রমণ, এই নিপীড়ন আমাদের দাসত্বের ইতিহাসে শেষ অধ্যায় মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার স্পৃহার অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে। আমরা দাসত্বের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের মনে এই বিশ্বাস গভীর হইয়াছে যে এই দাসত্বের জীবন কোনোদিন শেষ হইবে না এবং এশিয়ার উপর ইউরোপ রাজত্ব করিবে ইহাই বিধিলিপি। রোম গ্রীসকে জয় করিয়াছিল, কিন্তু গ্রীস পুনরায় রোম জয়

করে। কে বলিতে পারে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না? আমি এ কথা বলি না যে আমরাও ইংলণ্ড জয় করিব। আমরা যে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছি সেজন্য তাঁহারা দায়ী। তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশে যে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপভোগ করেন আমাদের তাহা ভোগ করিতে দিবেন না। রাশিয়া, জাপান, তুরস্ক এমন-কি ক্ষুদ্র আফগানিস্তানও স্বাধীন, কিন্তু ত্রিশ কোটি মানুষের জাতি আমরা— স্বদেশে আমরা দাস হইয়া আছি। তাঁহারা যদি আমাদের স্বাধীন হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া না লন তবে তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে এ কথা বলিয়া দিবার সময় আসিয়াছে যে আমাদের কাছে যত উপায় আছে, স্বাধীন হইবার জন্য সে-সমস্তই আমরা প্রয়োগ করিব।

একটি বিদেশী জাতি কিভাবে অপর একটি জাতির বিচারক হইতে পারে তাহা ভাবাই যায় না। ইংলণ্ড স্ব-শাসনের যোগ্য কিনা তাহা নির্ণয় করার জন্য আমরা যদি আমাদের দেশ হইতে সাত জন ভারতীয়কে ইংলন্ডে পাঠাই তাহা হইলে ইংলন্ডবাসীদের কী মনোভাব হইবে— এ বিষয়ে আপনাদের ধারণা কী? আমরা তাই একটি সংবিধান পেশ করিয়া এই অপমানজনক ও অবমাননাকর চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দিব। দিল্লীতে সেই সংবিধান প্রণয়ন করা হইতেছে। যদি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের স্বাধীনতার মান কী, আমাদের দ্বিধাহীন ও নির্ভীক জবাব হইবে: 'মুক্ত হইবার ইচ্ছা।'

নিরক্ষরতার অভিযোগ

আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা বলিয়া থাকেন যে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা বর্তমান। কিন্তু আফগানিস্তানে ও নেপালে শিক্ষিতের হার কত? বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় শিক্ষিতের হার কত ছিল? তুরস্কে রবীন্দ্রনাথের মতো কত জন কবি আছেন, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো কত জন বৈজ্ঞানিক আছেন এবং সে দেশে ইতিহাস, সাহিত্য, চারুকলা ও সংগীত কতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে? ইউরোপের একজন লেখক একবার বলিয়াছিলেন যে, যদি কোনো বিদেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে তবে প্রতিটি আফগান নারী, পুরুষ ও শিশু তাঁহাদের স্বদেশকে রক্ষা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইবেন ও অস্ত্র হাতে লইবেন। তাঁহাদের এই যে মুক্ত থাকিবার দুর্দমনীয় সংকল্প ইহাই বিদেশীদের পক্ষে আফগানিস্তানকে জয় করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। বন্ধনের বেদনা প্রত্যেক ভারতবাসীরও তেমনই অনুভব করা উচিত।

প্রতি বছর কত জন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকার হন? ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে প্রতি বছর বহু লোক মারা যান। এবং যখন মহামারী নিরসনের জন্য টাকা চাওয়া হয় তখন তাঁহারা বলেন : টাকা নাই। আবার, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের জন্য টাকা চাহিলেও এই অপমানজনক জবাব মেলে : সরকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। স্বাধীনতা ভিন্ন এই-সকলের আর কোনো প্রতিকার নাই।

একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন যে বয়কট শুধু একটি শিল্পকেই পঙ্গু করে না, উহার স্থায়ী পরবর্তী ফলাফল এমনই হয় যে ঐ শিল্পের বাজার পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

ব্রিটিশ-বস্ত্র বয়কট ইংরেজকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিবে। (একটি কণ্ঠস্বর : মারোয়াড়ীদের রুখুন) কিন্তু মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা তো আমাদের জন্যই বস্ত্র কিনিয়া আনেন। আমরা যদি ব্রিটিশ-বস্ত্র না কিনি ও না পরি তাহা হইলে তাঁহারা ব্যর্থ হইবেন ও ভাঙিয়া পড়িবেন। গত যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক অবরোধের ফলেই জার্মানী ফরাসীর কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিল। ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আজ এমন যে আমাদের সেই দুর্লভ সুযোগ আসিয়াছে যখন এই বয়কটের অস্ত্র আমরা ব্যবহার করিতে পারি। মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু বরণ করাই কি শ্রেয় নয়?

৬

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ হবিশ পার্কের জনসভায় প্রদত্ত।

যে মুহূর্তে মহান ভারতীয় জাতি স্বাধীন হইবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইবে সেই মুহূর্তেই তাহাদের বন্ধন শৃঙ্খল স্বতই খসিয়া পড়িবে। আমাদের বিদেশী প্রভুরা ভারতের জনসাধারণের ঐক্যকে যত ভয় পান এমন আর কিছুকেই নয়। সেইজন্যই 'হরতাল' দিবসে তাঁহারা এমন ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন যে জনসাধারণের মনোবল ভাঙিয়া দিবার উদ্দেশ্যে দমন-পীড়নের যাবতীয় কলাকৌশল তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপন শক্তি সম্পর্কে সচেতন জাগ্রত জাতি সকল রকম দমন-পীড়ন সহ্য করিয়াছে। তাহারা দুর্বল ও নিরস্ত্র; কিন্তু তাহাদের হাতে একটি বিরাট অস্ত্র আছে, যাহা দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিতে

পারিলে তাহাদের প্রাপ্য ফিরাইয়া দিতে প্রভুদের বাধ্য করিতে পারিবে। এই অস্ত্র হইল অর্থনৈতিক বয়কট। প্রথম পর্বে তাহাদের উচিত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করা।

এই অর্থনৈতিক যুদ্ধ নির্মম ও নিরন্তরভাবে চালাইতে হইলে দশ সহস্র নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত শক্তির অধিকারী যুবক চাই। তাঁহারা সারা প্রদেশ জুড়িয়া বয়কটের পক্ষে নিবিড় প্রচার চালাইবেন। তাঁহারা যদি নিরন্তর মনপ্রাণ দিয়া খাটেন— এমন-কি, তাঁহাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হইলেও যদি তাঁহারা পিছাইয়া না যান— তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিদেশী বস্ত্র বিতাড়ন করিতে পারিবেন।

যদি তাঁহারা এই কর্মসূচী উদ্‌যাপন করিতে পারেন তবে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর উহার ফলাফল এমন হইবে যে ইংরেজ জনসাধারণ তাঁহাদের রাজনৈতিক নেতাদের যে-কোনো মূল্যে ভারতের শুভেচ্ছা লাভ করিতে বাধ্য করিবেন।

মহিলাদের প্রতি আবেদন

বয়কট কর্মসূচীকে সফল করিতে মহিলারা অনেক কিছু করিতে পারেন। মহিলারা যদি সংকল্প করেন যে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহে ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবেন না, তবে আমাদের দেশে মহিলারা যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী, তাহাতে কোনো পুরুষ বিদেশী বস্ত্র কিনিতে সাহস করিবেন না।

আমি আবার একবার বলিতেছি যে ভারতের শাসনভার নিজেদের হাতে না পাইলে ভারতীয়রা কোনোদিন তাঁহাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটাইতে পারিবেন না এবং বেকার সমস্যারও সমাধান করিতে পারিবেন না। প্রতিদিন বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। আমি এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি যাহাতে দেখা যাইবে যে সরকারী সমর্থনের অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যতদিন সরকার বিদেশীদের হাতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই বিষয়ের কোনো সুরাহা হইবে না। কারণ বিদেশীদের স্বার্থ এ দেশের লোকেদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের শিল্পের বিকাশের অর্থই হইল বিদেশী শিল্পপতিদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার হ্রাস।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের হার কোনো দেশের স্ব-শাসন লাভের

মাপকাঠি হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাশিয়া ও আফগানিস্তানের কথা ধরুন। স্ব-শাসনের একমাত্র মাপকাঠি হইল স্বাধীন হইবার ইচ্ছা আছে কিনা।

৭

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ টালা পার্কের জনসভায় প্রদত্ত।

আমাদের দাবি পূরণের জন্য আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা রহিয়াছে। একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান, অপরটি অর্থনৈতিক অবরোধ। আমরা নিরস্ত্র জাতি, সেই কারণে প্রথমটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং দুইটি পথের মধ্যে যাহা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সেই দ্বিতীয় পথটিই আমাদের নিকট খোলা রহিয়াছে। এই পথের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে যে, বিগত যুদ্ধে জার্মানী আপাত বিজয়ী হইয়াও এবং বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের বৃহত্তর অংশ তাহার দখলে থাকিলেও, অর্থনৈতিক সংকটের ফলে জার্মানী ফ্রান্সের সহিত শান্তির আলোচনা-প্রার্থী হইয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল মহাদেশীয় অবরোধের ফলে। বাহির হইতে খাদ্য আমদানী অবরোধের ধাক্কায় জার্মানী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জীবনধারণের জন্য বর্তমানে সাড়ে-পাঁচকোটির অধিক ইংলন্ডবাসীদের ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বয়কটের মারণাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিলে, ইংলন্ডে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যাইবে এবং তাঁহাদের কর্তৃপক্ষকে ভারতবর্ষের সহিত আপস-রফার জন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিবে। আধুনিক সমর-বিজ্ঞান অনুযায়ী এই কৌশলটি সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ঘরে বসিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগই কি অপেক্ষাকৃত সহজ নহে ?

অসম প্রতিযোগিতা

ইংলন্ডে প্রস্তুত পণ্য ক্রয় করিয়া বর্তমানে আমরা কার্যত ইংলন্ডবাসীদের খাওয়াইতেছি। আমাদের শিল্পোৎপাদনে উৎসাহ জোগাইয়া এবং আমাদের দেশবাসীদের সাহায্য করিয়া যথাসম্ভব জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধনই কি উপযুক্ত এবং বাঞ্ছিত কাজ নহে ? বর্তমানে এ-বিষয়েও আমরা

অসুবিধার মধ্যে রহিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ব্যবসায়ের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা ভারতীয়দের পক্ষে কষ্টকর হইলেও একজন ইউরোপীয় তাহা চাহিলেই পাইবে। যদি কেহ কোনো ব্যবসা আরম্ভ করেন, যেমন, দিয়াশলাই উৎপাদন, তখনই কোনো ইউরোপীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অপর একটি ব্যবসা দাঁড় করাইবে এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রথম ব্যবসাটি ধ্বংস করিবে। টাটার মতন এত বৃহৎ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকেও এই-প্রকার অসম প্রতিযোগিতার ফলে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে এবং সেই কারণে স্যার ডোরাব টাটাকে সাহায্যের জন্য দিল্লী দৌড়াইতে হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অসহায় অবস্থা আর কী তীব্রতর হইতে পারে? বর্তমানে বেকার সমস্যা সমাজের পক্ষে মারাত্মক উপদ্রব স্বরূপ, শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ব্যতীত যাহার সমাধান সম্ভব নয়। স্বরাজলাভ না করা পর্যন্ত এই-সকল সংকটের প্রতিকারও সম্ভব নয়।

যুবশক্তির দায়িত্ব

এই জাতীয় সংকটের দিনে যুবশক্তির দায়িত্ব দেশের জন্য কর্তব্যসাধন করা। আমাদের নিকট সর্বোত্তম হাতিয়ার রহিয়াছে। আমরা যদি শ্রেষ্ঠতম কর্মীদের— দেশের যুবশক্তির— সমাবেশ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি, তবে সুনিশ্চিতভাবে যথা শীঘ্র সম্ভব আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিব। আমাদের নারী জাতিরও কর্তব্য কম নহে। এই অধঃপতনের দিনেও তাঁহারাই আমাদের গৃহকর্ত্রী। তাঁহারাই আমাদের জাতীয় আদর্শ রক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং বিলাতী দ্রব্য বয়কটে দৃঢ়-সংকল্প হইলে পরিবারের পুরুষরাও তাঁহাদের নিকট নতি স্বীকার করিবেন এবং প্রতিটি গৃহ এই ব্যাধিমুক্ত হইবে। আমাদের সামনে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না। আপস-রফার আলোচনার সময় আসিলে, বলড্উইন যেমন বলিয়াছিলেন, আমাদের মুখপাত্র হইবার জন্য রাজানুগতবৃন্দের ডাক পড়িবে না। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক ও বয়কটকারীদের জাতীয় প্রতিনিধিরূপে আলোচনায় যোগ দিবার ডাক পড়িবে।

১৯২১ সালে যুবরাজের ভারত আগমনকালে যখন এইরূপ সুযোগ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় লর্ড সিংহের খোঁজ পড়ে নাই, দেশবন্ধুর

প্রয়োজন হইয়াছিল। যেজন্য জেলের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবার পর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পণ্ডিত মালব্য দেশবন্ধুর সহিত জেলখানায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা যদি এই নীতিতে অন্তত কিছুকাল অনমনীয় থাকি, আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবেই।

৮

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ অক্টারলোনি মনুমেন্টে মিঃ এ. এল. থার্টেল এম. পি. এবং মিসেস থার্টেল-এর সম্বর্ধনা-সভায় প্রদত্ত।

দেশের রাজনীতিবিদ ও শ্রমিক কর্মীরা দেশকে শোষণমুক্ত করিবার ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য লইয়া সংগ্রাম করিতেছেন। রাজনীতিবিদেরা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-সাধারণের স্বরাজের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কর্মীদের এবং রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করিতে হইবে।

আমি নিজেকে একজন কর্মী মনে করি— শক্তধাতের কর্মী, যদিও নিজের অন্ন সংস্থানের জন্য আপাতত কোনো কাজ করি না। এই কারণেই শ্রমিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে নিজেকে সম্মত করাইতে সক্ষম হইয়াছি।

ইতিপূর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার শ্রদ্ধেয় নেতা লোকান্তরিত মহান দেশবন্ধু দাশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গের উত্থাপন তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমাদের দেশে শ্রমিক ও কংগ্রেসের মধ্যে যে ঐক্য বজায় রহিয়াছে এবং সর্বদাই বজায় থাকিবে তাহা অন্য কোনো নেতা অপেক্ষা তাঁহার মধ্যেই অধিক মূর্ত হইয়াছিল। লোকান্তরিত দেশবন্ধু তাঁহার অনুপম ভাষায় বলিতেন : 'জনগণের জন্য স্বরাজ'। আমরা যাহারা তাঁহার আদর্শের অনুগামী, সেই একই নীতিতে বিশ্বাস করি। এমন-কোনো সভায় তিনি ভাষণ দেন নাই যেখানে কংগ্রেস ও শ্রমিক-আন্দোলনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উপর তিনি জোর না দিয়াছেন।

তিনি সর্বদাই এই মত পোষণ করিতেন যে, যেহেতু দেশের অগণিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্র, তাই ধনী অথবা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অপেক্ষা দরিদ্রদেরই

দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য। এই দুর্ভাগা দেশে রাজনীতি এবং শ্রমিক-স্বার্থ অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চূড়ান্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়া কাজ শুরু করিতে হইবে। তিনি সর্বদাই এই বিশ্বাস নিয়া চলিতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ধাপরূপে কাজ করিবে। আমরা এখন পরাধীন থাকিবার ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সকল রকম প্রচেষ্টা গভর্নমেন্টের চাপ ও বিরোধিতার সম্মুখীন হইতেছে দেখিতে পাই।

মূল সমস্যা রাজনৈতিক

মিঃ ও মিসেস থার্টলকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাইতেছি। ভারতবর্ষে আমাদের পরিস্থিতিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয়, যে-কোনো প্রকার বন্ধন মুক্তির সমস্যাই পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গ ও অবিভাজ্যরূপে জড়াইয়া আছে। আমাদের বিদেশী মুরুব্বীরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে আমরা সামাজিক দিক হইতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার জাতি। কিন্তু যখনই স্থানীয় কাউন্সিলে কিম্বা বিধান সভায় কোনো প্রগতিমূলক সামাজিক আইন রচনার উদ্যোগ হইয়া থাকে, গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রথম বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের সমস্যা মূলত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানের পূর্বে ইহার সমাধান চাই।

৯

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ খিদিরপুর ভূ-কৈলাস রাজবাটীতে প্রদত্ত।

ব্রিটিশ বস্ত্র ক্রয় বাবদ এ দেশ হইতে বছরে পঞ্চাশ কোটিরও বেশি টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। অথচ এ দেশের তন্তুবায়গণ অনশন করিতেছেন। আমরা আমাদের স্বদেশবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া বিদেশীদের মুখে তুলিয়া দিতেছি। যদি ভারতের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সকল বস্ত্র ভারতেই নির্মিত হইত তাহা হইলে এই দরিদ্র সম্প্রদায় জীবনধারণের একটি উপায় খুঁজিয়া পাইতেন।

কোনো ভারতীয় এই দেশে লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না এই আইন

প্রণয়নের কারণ কী ? ইহা কি ইংলন্ড হইতে লবণ পাঠাইবার জন্য ও একচেটিয়া বাজার দখলের জন্য করা হয় নাই ? লবণ খাতে ভারত হইতে যে টাকা বাহির হইয়া যায় তাহাও এ দেশে থাকা চাই।

দেড় শত বৎসর আগে এ দেশে নির্মিত বস্ত্র ইংলন্ডে রপ্তানী হইত। তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সে দেশে আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের উপর চড়া কর ধার্য করেন। আমাদেরও এখন দেখা দরকার যে ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানী যেন বন্ধ হয় ও ঐ বস্ত্রের উপর কর ধার্য করা হয়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ইচ্ছা বলবৎ করা সম্ভব নয় বলিয়া আমরা ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের পথ ধরিব। তাঁহারা তো আমাদিগকে উহা কিনিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না। প্রথম প্রথম আমাদের বেশি মূল্য দিতে হইতে পারে, কিন্তু পরে উহা সস্তা পড়িবে।

১০

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ হাওড়ায় ক্ষীরেরতলা ময়দানে প্রদত্ত।

কোনো কোনো জেলা কংগ্রেস কমিটিতে যে-সব মতবিরোধ ছিল তাহা মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সংকটজনক মুহূর্তেও হাওড়ায় কিছু কিছু মতবিরোধ রহিয়া গিয়াছে। আমি সকলের কাছে এই অনুরোধ জানাইব, মাতৃভূমির স্বার্থে ও সাধারণ আদর্শের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনে পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝি যেন মিটাইয়া লওয়া হয়। হাওড়ায় পৌর নির্বাচন আগাইয়া আসিতেছে এবং সকল নাগরিকেরই ইহা দেখা কর্তব্য যেন কেবলমাত্র কংগ্রেস প্রার্থীরাই জয়লাভ করেন।

বয়কটই একমাত্র কার্যকর অস্ত্র

দরখাস্ত ও আরজি ব্যর্থ হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ অনমনীয়ই রহিয়াছেন। এখন, ভারতবাসীর মতো নিরস্ত্র জাতির পক্ষে একমাত্র যে পথ খোলা আছে তাহা হইল ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করা। ইংরেজকে নতজানু করিবার জন্য এই দুর্বল স্থানেই সহজে আঘাত করা যায় এবং তাহাও বিশেষ প্রচেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকার ছাড়াই করা সম্ভব।

ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে যদি অর্থনৈতিক অবরোধ কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে উহাতে বিমান, হাউইৎজার বা সাবমেরিনের

চেয়ে বেশি ফল পাওয়া যায়। ইউরোপের গত যুদ্ধে জার্মানী সুনিশ্চিতভাবে জয়লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের গোড়া হইতেই তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের কৌশল সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার ফলে তাহাকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফলত জার্মানী সমাজ-বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। রুশদের হাতে নেপোলিয়নের কী মারাত্মক দুর্বিপাক ঘটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা সুবিদিত। তাহারা তাঁহার সৈন্যদলের রসদ সরবরাহ পুরাপুরি বন্ধ করিয়া দেয়, পরিণামে তাহাতেই তাঁহার সর্বনাশ ঘটে।

তাই আমরা যদি এই নিদারুণ অস্ত্রটি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করি সে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসিতে বাধ্য হইবে। এই বয়কটের ফলে ল্যাংকাশায়ারের সব কয়টি কাপড় কল বন্ধ হইয়া যাইবে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবে ও সেখানে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে ইংরেজরা আমাদের মতো ভাগ্যবাদী নন। যখন তাঁহারা অনশনের মুখে পড়িবেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের সরকারকে ভারতীয়দের দাবি মিটাইতে বাধ্য করিবেন। পার্লামেন্টের একজন সদস্য, মিঃ ক্লাইনস, ইতিমধ্যেই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে ও চীনে তাঁহাদের বাণিজ্য হ্রাসের কারণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নয়, পরন্তু ঐ দুই দেশের রাজনৈতিক অসন্তোষই সেজন্য দায়ী। ব্রিটেন ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনেকদূর পিছাইয়া পড়িয়াছে এবং ল্যাংকাশায়ারে কতকগুলি কাপড় কল ইতিমধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভারত ও আগামী যুদ্ধ

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আরো একটি মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ যুদ্ধ বাধিলে সারা বিশ্ব তাহাতে জড়াইয়া পড়িবে। নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছে। ভারতের সাহায্য ছাড়া ব্রিটেন ঐরূপ যুদ্ধে জড়াইতে পারিবে না। সে তাহা জানে। তাই ভারতকে খুশি করিতে বর্তমানে আর-এক দফা শাসন-সংস্কার মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমার মতে, সাইমন কমিশন নিয়োগের উহাই মূল কারণ। প্রত্যেকের জানা উচিত যে ঐরূপ সংকটকালে ভারত একটি পয়সা বা একটি লোক দিয়াও ব্রিটেনকে সাহায্য করিবে

না। কংগ্রেসও এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছে। তাই ভারতবাসীরা যদি এখন তাঁহাদের সংকল্পে অটুট থাকিতে পারেন তাহা হইলে ইংরেজরা ভারতের দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন।

যুবকদের কর্তব্য

এই কার্যভার গ্রহণ করাই যুবকদের কর্তব্য এবং সেজন্য দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দরকার। আমি তাঁহাদের অনুরোধ করিব স্বদেশী পণ্য লইয়া দূর দূরান্তে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত যাইতে— যেখানে ঐসব পণ্য পাওয়া যায় না, এবং সেই-সব স্থানের বাজার হইতে ব্রিটিশ পণ্য বিতাড়িত করিতে হইবে। স্ত্রীজাতির কর্তব্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁহাদের দেখা উচিত যেন তাঁহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কোনো ব্রিটিশ পণ্য না কেনা হয়।

বাংলা কী করিবে

আমরা বাঙালীরা ভারতের শাসন-রজ্জু গ্রহণ করিতে ইংরেজদের সাহায্য করিয়াছিলাম। এখন আমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাঁহারা এখানে বণিক রূপে আসিয়াছিলেন— তাঁহারা নবাবকে কুর্নিশ করিয়া এ দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন। নবাবকে তাঁহারা সেলাম জানাইতেছেন এরূপ একখানি চিত্র মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে টাঙানো ছিল। আমি শুনিয়াছি, পাছে ঐ চিত্র ভারতবাসীর চোখে ইংরেজের মর্যাদা খাটো করিয়া দেয় তাই লর্ড কার্জন ঐ চিত্রখানি লইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভূমির জন্য আপনারা কিছু আত্মত্যাগ স্বীকার করুন। আপনারা আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া স্বদেশীর শপথ বাক্য উচ্চারণ করুন।

স্বাধীনতার যুদ্ধ

১ মার্চ ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে ছাত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণত একটি অভিযোগ করা হইয়া থাকে। তাহা এই যে, আমরা দেশের যুবকদের প্ররোচিত করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস করার সংগত হেতু আছে যে এই মুহূর্তে ঐ অভিযোগ অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সে দিন দূরে নহে যেদিন তাঁহাদের প্ররোচিত করার দরকার দেখা দিবে। অনেকেই জানিতে উৎসুক যে এই আন্দোলনকে আমি কী চোখে দেখি। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশের যুবকদের সঙ্গে আমি একাত্ম। দেশের যাঁহারা আশার পাত্র তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত যে-কোনো আন্দোলনে আমি তাঁহাদের চরণে নিজের জীবন ডালি দিব। ইহা দেখিয়া আমার সন্তোষ জন্মিয়াছে যে বাংলায় এক নব জাগরণ আসিয়াছে— জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদের ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করিয়া যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই ফলে সিটি কলেজের ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলন উদ্‌ভূত হইয়াছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার উষ্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন আছে।

কর্তৃপক্ষ যে সম্মানজনক আপস-মীমাংসায় আসা উচিত মনে করিবেন আমি তাহাতে বাধা দিব না। কিন্তু তাহা তো অসম্ভব আশা বলিয়া মনে হয়।

আপনারা পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না হইয়া, আবেগের জোয়ারে ভাসিয়া কোনো আন্দোলনে ঝাঁপ দিবেন না। সিটি কলেজের গণ্ডগোল সম্পর্কে আমার সুচিন্তিত মতামত জানিতে যে ছাত্ররা আমার কাছে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের আমি এই পরামর্শ দিয়াছিলাম যে হতোদ্যম না হইয়া তাঁহাদের আন্দোলনকে সফল পরিসমাপ্তিতে লইয়া যাইতে হইবে।

সিটি কলেজের বিষয়টির সমাধান করা খুবই সহজ। কোনো কোনো মহলে এই বিষয়টিকে খুবই জটিল বলিয়া চালাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে তিলকে তাল করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপরের উপর চাপাইয়া দিতে আমি অনিচ্ছুক। আমরা হিন্দুরা বহু মাত্রায় সহনশীল। এই সহনশীলতা অনেক সময় নিষ্ক্রিয়তা ও জড়ত্বের দিকে লইয়া যায়। ইহা আমার ধারণার বাহিরে যে কিরূপে আলোকপ্রাপ্ত ও অগ্রগামী ব্রাহ্ম মহোদয়রা তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম-

বিশ্বাস হিন্দু ছাত্রদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার মতো নিচু কার্য করিতে পারেন।

যুবকদের উপর আমার আস্থা আছে। আমি সুনিশ্চিত যে এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য হইতে সাফল্যের সঙ্গে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের বারংবার মনে করাইয়া দিতেছি তাঁহারা যেন সব কাজেরই ফলাফল সম্পর্কে অবহিত হন।

১

২ মার্চ ১৯২৮ মহীশূর পার্কে মহিলা সমাবেশে প্রদত্ত।

মাতৃভূমির যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে সে-বিষয়ে মহিলারা অবহিত হইয়াছেন ইহা বর্তমান কালের একটি আশাব্যঞ্জক সূচনা। ভারত এক সময়ে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি— বস্ত্র, জ্বালানী, লবণ ও তৈল উৎপাদনে গৌরবজনক অবস্থায় ছিল। সে তখন ঐ-সব বিষয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশেও পণ্য রপ্তানী করিত। এমন-কি, একশত বৎসর আগেও আমাদের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ছিল। সরকার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরও 'টাকা নাই' এই সস্তা অজুহাতের ফলে ভুগিতেছে— অথচ তাহাদের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে তাহারা খোলা হাতে খরচ করে। আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবার ফলে কর্মসংস্থানের প্রশস্ততর ক্ষেত্র রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র পথ স্বরাজ লাভ। নিরস্ত্র জাতির হাতে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের চেয়ে উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক অস্ত্র নাই।

আমি মায়েদের কাছে এই আকুল আবেদন জানাইতেছি যে আপনারা ব্রিটিশ পণ্য স্পর্শ করিবেন না এই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া আরো একবার প্রমাণ করুন, যে-হাত শিশুর দোলনায় দোল দিয়াছে সেই হাতই জগৎ শাসন করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, স্বদেশীর শপথ আপনারা যদি রক্ষা করেন তাহা হইলে স্বরাজ লাভ করিতে দেরি হইবে না।

২

যুবকদের কর্তব্য

৪ মার্চ ১৯২৮ বাঁকুড়ায় যুবকদের সম্বর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত।

তোমরা আত্মশক্তির উপর আস্থা রাখো। তোমাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য বিরামহীনভাবে ও ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও। এই দুটি শর্ত পালন করিতে পারিলে, গড়পরতা সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হইয়াও যে-কেহ বিস্ময়কর কার্য সাধন করিতে পারে। সৃষ্টিক্ষমতা ও যৌবন সমার্থক শব্দ।

জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার স্থলে নবীন ও প্রাণদায়ী কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও সাহস যাহাদের আছে একমাত্র তাহারাই নিজেদের যুবক বলার অধিকারী।

মাতৃভূমিকে বন্ধনমুক্ত করার দায়িত্ব যুবকদের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। মুষ্টিমেয় বিদেশী কোটি কোটি ভারতবাসীকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদের পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ভারতবাসী আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে। এই মোহাবিষ্টতা চূর্ণ করিয়া আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহাই যুবকদের সুস্পষ্ট কর্তব্য।

আমাদের যে ব্যবসা ও বাণিজ্য একদা সমৃদ্ধ ছিল এখন তাহা মৃতবৎ। তাহার ফলে ব্যাপক বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও রোগ দেখা দিয়াছে ও প্রতিদিন জাতির জীবনীশক্তি গ্রাস করিতেছে। আমরা বিদেশীদের শোষণের অসহায় শিকার। যদি পৃথিবীর বুক হইতে ভারতীয় জাতিকে লুপ্ত হইতে না হয় তবে এই অবস্থার অবসান ঘটাইতেই হইবে। এইরূপ স্থলে নবীনদিগের কোনোরকম আত্মত্যাগ বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। এমন-কি, লক্ষ্যবস্তুর অনুসরণ করিতে গিয়া যদি আত্মবিলুপ্তি ঘটে তবে তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আমি মনে করি, বর্তমানে প্রকৃষ্ট সুযোগের মুহূর্ত আসিয়াছে। মনে হয় ইহা যেন ভগবৎ-প্রেরিত সুযোগ। এখন জাতীয় অমর্যাদার সম্মুখীন হওয়ায় সকল ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। যদি আগামী দুই বৎসরের জন্য দশ সহস্র যুবক, তাঁহাদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটিলেও, মাতৃভূমির সেবা একান্ত-ভাবে বরণ করিয়া লন তবে যে গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন তাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদেরই প্রয়াসের ফলে সেই দিন নিশ্চয়ই সমাগত হইবে।

৩

শৌখিন বস্ত্রের ফাঁদ

৪ মার্চ ১৯২৮ মহিলা সভায় প্রদত্ত।

আমি আপনাদের কাছে বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি। মহিলারা যদি আন্তরিকভাবে বয়কট আন্দোলনের ভার গ্রহণ না করেন তবে এই আন্দোলনকে সফল করিয়া তোলার পক্ষে যাঁহাদের

যোগ্যতা সর্বাধিক তাঁহাদেরই সমর্থনের অভাবে আমাদের সকল প্রয়াস পংগু হইয়া যাইবে। আপন সংসারে বাঙালী নারী মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁহাকে অমান্য করিয়া ব্রিটিশ বস্ত্র লইয়া আসিবে এমন পুরুষ কোথায়? স্বদেশীর শপথে অবিচল থাকিয়া শৌখিন বস্ত্রের ফাঁদ মহিলাদের পরিত্যাগ করা উচিত। স্বদেশে তৈরি মোটা কাপড় তাঁহারা পরিধান করিবেন, ইংলন্ডে তৈরি শৌখিন বস্ত্র— যাহা দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ— তাহা পরিধান করিবেন না।

আমাদের সমৃদ্ধ ব্যবসা ও বাণিজ্য আমরা হারাইয়াছি। আজ আমরা অর্থনৈতিক দিক হইতে অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আপনারা কেবল স্বদেশী কাপড়ই ব্যবহার করুন। তাহাতে দেশের দুর্দশা লাঘব হইবে। আমাদের দুর্বিনীত প্রভুরাও আমাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে শিখিবেন।

৪

স্বদেশী ও স্বাধীনতা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত

৫ মার্চ ১৯২৮ বাঁকুড়ার জনসাধারণ, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

জাতীয় ভাবধারায় দীক্ষিত কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা স্থানীয় সংস্থাগুলি পরিচালিত হইবার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা বলেন যে পার্টির নীতি অনুসারে এই সংস্থাগুলি পরিচালনা করা অনুচিত তাঁহারা ভুল বলিতেছেন। ইংলন্ডে এই সংস্থাগুলি স্পষ্টতই পার্টির নীতি অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। বাঁকুড়ার জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি যে সুন্দর কাজের নজির রাখিয়াছেন সেজন্য আমি তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই। ভুল করিয়া থাকিলে নিরুৎসাহিত হইবেন না। ভুল হইবেই ও ভুলের মধ্য দিয়াই মানুষকে শিখিতে হয়।

বাঙালীরা জাতি হিসাবে তাহাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। বিদেশী প্রভুরা আমাদের মিথ্যা ইতিহাসের পাঠ দিয়াছেন ও তাহার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। দেশের মুক্তির জন্য আমাদের কাজ করিতে হইবে। বিদেশীর অধীনতার ফলে আমরা কতদিকে কত দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছি।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে— তাহার ফলে দেখা দিয়াছে ব্যাপক বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও ব্যাধি।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। শাসকদিগকে আমাদের দাবি মানিয়া নিতে বাধ্য করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হইল ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করা। যদি দেশ সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয় তবে আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। বয়কটের কর্মসূচীকে পালন করিতে হইলে চাই দশ হাজার যুবক, যাঁহারা বয়কট ও স্বদেশীর বাণী প্রদেশের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিবেন। এই জাতীয় কর্মীবাহিনী চরকা ও খদ্দরের প্রসার ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য কাজ করিবেন। তাঁহারা ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাইবেন ও তাহার সাহায্যে এমন শক্তিশালী জনমত গড়িয়া তুলিবেন যে, যে-ব্যক্তি ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবহার করার স্পর্ধা দেখাইবেন তিনি জাতির স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া চিহ্নিত হইয়া যাইবেন। শক্তিশালী জনমত গড়িয়া তুলিয়াই ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করা যাইবে। স্বদেশী ও স্বাধীনতা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমি কর্মীদের নিকট আবেদন করিতেছি, আপনারা আগুয়ান হইয়া দেশের স্বাধীনতার কার্যভার গ্রহণ করুন। জাতীয় কর্মীবাহিনীর অভাব পূরণ করিবার জন্য একদল নবীন কর্মী দরকার।

•

৫

সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি

৫ মার্চ ১৯২৮ বাঁকুড়ায় অভয় আশ্রম কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তর।

যুবকদের শারীরিক ক্রিয়াকৌশল দেখিয়া আমার কিছুকাল পূর্বের 'ইউনিভার্সিটি কোর'-এর শিক্ষণ সম্বন্ধীয় একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। শিক্ষণ সমাপ্ত হইবার পর সেখানে শিক্ষক (সকলেই ব্রিটিশ রেজিমেন্টের) ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতায় বহু ক্ষেত্রেই বাঙালী যুবকেরা তাঁহাদের শিক্ষকদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ করিয়াছিলেন। যখন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে অফিসারদের মতামত আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন

তাঁহারা বলিয়াছিলেন শিক্ষাদান নিঃসন্দেহে খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে, তবে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার উপযোগিতা কতদূর সে-সম্পর্কে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল। প্রায়ই বলা হয় যে বাঙালীর শারীরিক কষ্টস্বীকারের ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক যুবকেরই শারীর চর্চায় এবং কষ্টসাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আমার একজন আমেরিকান লেখকের উক্তি মনে পড়িতেছে যিনি ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন সমালোচক ছিলেন না এবং যিনি কোনো জাতির অভ্যুত্থানের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের ব্যাপারে ভারতীয় যুবকদের পাশ্চাত্য যুবকদের অপেক্ষা উচ্চতর না হইলেও অন্তত সমান আসনে বসাইয়াছিলেন, কিন্তু নৈতিক গুণে অর্থাৎ কর্তব্যনিষ্ঠায় হীন বিবেচনা করিয়াছিলেন। যদি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটে তাহা হইলে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির উদ্ভব হয়। ইংরাজদের সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি হইল তাহাদের প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা এবং স্বজাতির প্রতি দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বোধ। যদি ভারতীয় যুবকদের এই দুইটি গুণ থাকিত, তাহা হইলে এক অপরাজেয় জাতি গড়িয়া উঠিত।

এখনকার প্রয়োজন

বর্তমানে সারা দেশ জুড়িয়া যুবকদের শিক্ষণার্থে এই ধরনের অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। যদি দেশে ইতিমধ্যেই স্থাপিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে একটিমাত্র সাধারণ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত করা যাইত, তাহা হইলে তাঁহারা জাতির উন্নয়নের কার্যে বিপুল একটি শক্তি হইতেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ঐ ধরনের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ভুলিলে চলিবে না যে সকলের উপরে জাতির প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি বিপদ হইতে নিজেদের আত্মরক্ষার কথা মনে রাখিতে হইবে, যে, ইহার মঙ্গলপ্রচেষ্টায় ইহা কখনোই জাতির চেয়ে মহত্তর বিবেচিত হইবে না।

অভয় আশ্রমের প্রতি অভিনন্দন

সর্বাঙ্গীণ সমাজকল্যাণ কার্যে চমৎকার সাফল্যের জন্য অভয় আশ্রমকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। দুই ধরনের কর্মীর অত্যাবশ্যক উপযোগিতা রহিয়াছে ; একদল বয়কটের বার্তা বহন করিয়া চলিবেন, অপর দল, কুটিরশিল্প

পুনরুজ্জীবনে সকল শক্তি নিয়োজিত করিবেন। ভাবাবেগ যদি কঠিন কর্মসূচী দ্বারা পরিপূরিত না হয় তাহা হইলে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইবে।

আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠনের আবশ্যিকতার উপর জোর দিতে আবেদন করিতেছি যাহাতে বয়কট আন্দোলন সফল হয়। দেশে বস্ত্র বিক্রয় ও উৎপাদনের একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা তাঁহাদের অবশ্যই করিতে হইবে। বিদেশী সুতা ব্যবহারে তাঁহারা তাঁতীদের অবশ্যই নিরস্ত করিবেন।

আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে

দেশের সাড়া দেখিয়া আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে আপনারা এক বৃহৎ আন্দোলনের দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত যাহা সারা দেশে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইবে। আমি পুনরায় জোরের সহিত বলিতেছি আগামী দুই বৎসর অত্যন্ত জরুরী সময় এবং তাহার যথাযথ ব্যবহার হইলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই পঁচিশ বছরের কাজ নিষ্পন্ন হইবে।

৬

স্বরাজ লাভই আমাদের একমাত্র সমস্যা

৬ মার্চ ১৯২৮ রামচন্দ্রপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত মানভূম জেলা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

আমাদের দেশের জনসাধারণের বর্তমান অবস্থা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য অবাধে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তাহার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। আমাদের একদা সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য আজ লুপ্ত হইয়াছে। ফলে বেকার সমস্যা খুবই কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে। বেকার সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করা দরকার।

আগে ভারত হইতে ইংলন্ডে বস্ত্র রপ্তানী হইত। ভারতের এই বাণিজ্যটি ছিল সমৃদ্ধ। কিন্তু ইংলন্ড আমদানীর উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করিয়া, সামাজিক চাপ সৃষ্টি করিয়া ও আইনের সাহায্য লইয়া গ্রেট ব্রিটেন হইতে ভারতীয় পণ্য বিতাড়িত করিয়া ছাড়িয়াছে। ইংলন্ড নিজের দেশেই শিল্প গড়িয়া তোলে। স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইবার ফলে তাহাদের শিল্পায়নের

ধারা ত্বরান্বিত হয়। তাহার পর ইংলন্ড ভারতের বাজারে তাহার পণ্য ঢালিয়া দেয়। ভারতবাসী তখন আত্মসচেতন জাতি ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে রাজনৈতিক শক্তিও ছিল না। তাই ব্রিটেন যে মনোভাব লইয়া তাহার বাজার হইতে ভারতীয় পণ্যকে বিতাড়িত করিয়াছিল, ব্রিটিশ পণ্যের ক্ষেত্রে ভারত সেই মনোভাব লইতে পারেন নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, ভারতের কুটির শিল্প, চরকা প্রভৃতি, ম্যাঞ্চেস্টারে উৎপন্ন পণ্যের কাছে হারিয়া গিয়া ক্রমে অকেজো হইয়া গিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ লোক কর্মচ্যুত হইয়াছেন। কেরোসিন তৈল, চিনি, লবণ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভারতের বাজারে ক্রমশ চাপাইয়া দেওয়া হইতে থাকে ও দেশীয় শিল্পগুলি ক্রমশ ধ্বংস হইয়া আসে। এখন ভারতবাসী একটি আত্ম-সচেতন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহারা আর বেশিদিন এই অবস্থা বরদাস্ত করিবেন না। ভারতের সম্পদ বাহিরে চলিয়া যাওয়া বন্ধ করিতে তাঁহারা এখন কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা শুধু ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানী খাতেই ভারত হইতে বাহির হইয়া যায়। এখন ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করার সিদ্ধান্ত আমরা লইয়াছি। আমাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইতে হইবে। আমাদের মতো নিরস্ত্র জাতির পক্ষে অর্থনৈতিক বয়কটের অস্ত্রই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

সাইমন কমিশন

সরকার সাইমন কমিশন গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীর বিচার করার অধিকার তাহাদের আছে এ কথা ভারতের লোক মানিয়া লয় নাই। আমাদের নিজেদের ঘরোয়া বিবাদ আমরা নিজেরাই মিটাইয়া লইব; তৃতীয় পক্ষকে সেই বিবাদের সুযোগ লইতে দেওয়া হইবে না। আমাদের ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিলে আমরাও নব্য তুর্কী, জাপানী বা আফগানদের মতো নবীন, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর জাতি গড়িয়া তুলিতে পারি। ইহা এমন কাজ যাহা সাইমন কমিশনের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, ইহা তাহাদের কাজই নয়।

আমাদের একমাত্র সমস্যা হইল স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সমস্যা। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত— আমরা সকলেই একত্রে এই কাজ কাঁধে তুলিয়া লইব। ভারতবর্ষ দরিদ্রদের দেশ। তাই স্বাধীনতার সংগ্রামে দরিদ্র ও নিপীড়িতদেরই, অপর কাহারো তুলনায়, এই দায় বেশি বহন করিতে হইবে।

মানভূমের বিশেষ সমস্যা

মানভূম জেলার নিজস্ব সমস্যার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই দেখি এই জেলার জনসংখ্যার অধিকাংশই শ্রমিক। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা খুবই জরুরী। এই-সব ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করিয়া নিজেরাও যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকেও সাহায্য করিতে পারিবে।

জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, আপনারা মদ্যপান, মামলা ও অনুরূপ যে-সব অভিশাপ আপনাদের শক্তি খর্ব করিয়া দেয় তাহা হইতে বিরত থাকুন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার হওয়া দরকার।

ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট

বর্তমান মুহূর্তে সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রয়োজন হইল দলে দলে কর্মী সৃষ্টি—যাঁহারা মুক্তির মশাল লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামে যাইবেন ও জনসাধারণকে এই সত্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবেন যে পরাধীনতাই তাহাদের সকল দুর্দশার মূল। এই বিদেশী জোয়াল ছুঁড়িয়া ফেলার একমাত্র যে উপায় আমাদের আছে তাহা হইল ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের একটি ফলদায়ী কর্মসূচী পালন। আপনারা সকলেই আসুন এবং অবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য কাজ করুন।

•

৭

ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলন

১০ মার্চ ১৯২৮ ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

একজন প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীকে সম্মান জানাইয়া আপনারা শুধু ব্যক্তিগত-ভাবে আমাকেই সম্মান জানান নাই, সকল রাজনৈতিক বন্দীদেরই সম্মান জানাইয়াছেন।

ভারতে গণতন্ত্রের ধারণা নতুন আসিয়াছে আমি এ কথা স্বীকার করি না। অতীতেও ভারতে গণতন্ত্র ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। তাহারই প্রস্তুতিকল্পে

স্থানীয় সংস্থাগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের প্রবেশ করা দরকার। সেখানে ভালো কাজ করিবার কিছু বাস্তব ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে।

কিন্তু আইন সভায় আমাদের ভালো কাজ করার বিশেষ ক্ষমতা নাই। আমরা সেখানে কিছু ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করিতে পারি মাত্র। যখন জনগণের হাতে প্রকৃতই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে, তখন আমরা সকল বাধা অপসারিত করিয়া সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না।

৮

স্বদেশী ও বয়কট

১০ মার্চ ১৯২৮ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে প্রদত্ত।

ভারত নাকি স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য নয়। আমি ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম রহিয়াছে, শিক্ষার প্রসার নাই— এই অজুহাতে ঐ কথা বলা হয়। কিন্তু এই যুক্তি ভ্রান্ত। আয়ার্ল্যান্ড, এমন-কি, ইংলন্ড ও আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ময়মনসিংহ জেলার জনসংখ্যার সমান। তাহারা স্বাধীন, কেননা তাহারা পরাধীনতা সহ্য করে না।

কেন এই দুঃখ-দুর্দশা

ভারতবাসীকে মুষ্টিমেয় বিদেশী পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার কারণ আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি, অতীতের গৌরবজনক কীর্তি আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। বিদেশী প্রভুরা চতুর কৌশলে আমাদের এই মানসিক অবস্থা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখন ভারতবাসী একটি আত্মসচেতন জাতি, তাহারা তাহাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং স্বাধীন হইতে কৃতসংকল্প।

গত পঁচিশ বছরের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস লক্ষ করিলে দেখিব যে ইহার প্রথম অধ্যায় ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও তৎসঙ্গে আসিয়াছিল মর্লে-মিন্টো সরকার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়াছে বোমা-পিস্তলের যুগ ও তৎসহ ভারত সরকার আইন। তৃতীয় অধ্যায় শুরু হইয়াছে অসহযোগ আন্দোলনে। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে এ কথা বলার সময় এখনো

আসে নাই। সম্ভবত আমরা এই অধ্যায়ের সমাপ্তি দেখিব ১৯৩০ সালে। তখনই এই আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত বিচারের রায় ঘোষণা করা যাইবে।

আমাদের জাতীয় জীবনে আগামী দুই বৎসর একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে পঁচিশ বৎসরের কাজ সারিয়া ফেলা যাইবে।

নির্দিষ্ট সময় আসিবার দুই বৎসর আগেই রয়্যাল কমিশন গঠন করা হইয়াছে। তাহার কারণ, যে মহা দুর্যোগ বিশ্বদিগন্তে ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহা ইংরেজদের ঘাড়ে পড়িবার আগেই তাহারা ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে রফা করিতে চায়। তাহারা বর্তমান মুহূর্তকে বাছিয়া লইয়াছে, কেননা তাহারা মনে করে যে ভারত যখন অন্তর্কলহে দীর্ণ তখনই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে দর-কষাকষি করিয়া তাহারা ভালো ফল আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা বিস্মিত হইয়া গিয়াছে যে সাইমন কমিশনের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে ভারতের জনমত আশ্চর্য রকম ঐক্যবদ্ধ।

হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থও এক, তাহাদের সমস্যাও এক। খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। দেশের শাসনভার হাতে না পাইলে এই সমস্যার ঠিক ঠিক সমাধান করা যাইবে না।

ভারতবাসীর জাতীয় দাবি পূর্ণ না হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না। আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে শাসকদের বাধ্য করিতে না পারিলে তাহারা জনসাধারণের দাবিতে কর্ণপাত করিবে না। আর সেজন্যই কংগ্রেস অর্থনৈতিক বয়কটের অস্ত্রটি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে।

হে আমার যুবক বন্ধুগণ, এই বয়কট আন্দোলনকে সফল পরিসমাপ্তির দিকে তোমাদের লইয়া যাইতে হইবে। তোমরাই দেশের আশাস্থল। ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচনের গুরু দায়িত্ব তোমাদেরই উপর বর্তিয়াছে।

নারীসমাজের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়াও বয়কট আন্দোলন সফল হইবে না। দশ সহস্র যুবক প্রয়োজন, যাহারা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়কট প্রচার করিবে— তাহারা দুই বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ বস্ত্র পুরাপুরি বয়কট করাইবে। আমি সর্বত্র যে সাড়া পাইতেছি, যে জাগরণের লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আমার মনে কোনো সংশয় নাই— আমরা আবার এক যুগসন্ধির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি।

৯

স্বাধীনতার পতাকাবাহী

১৩ মার্চ ১৯২৮ কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে প্রদত্ত।

দেশের যুবকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে তাহারা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হইবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে এই যুবশক্তিকে সংগঠিত করিতে হইবে। বর্তমানে সারা দেশে অগণিত যুব সংস্থা ছড়াইয়া আছে। এগুলি কোনো-না-কোনো আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। যদি এগুলিকে একটি সাধারণ লক্ষ্য ও আদর্শের অধীনে আনা যায় তবে জাতির সেবায় একটি বিশাল শক্তিরূপে ইহাদের ব্যবহার করা যাইবে। যাঁহারা ঐ সংস্থাগুলির পরিচালনায় রহিয়াছেন তাঁহাদের একটি কথা ভোলা উচিত নয় যে তাঁহাদের আনুগত্য সর্বোপরি মাতৃভূমির প্রতি। কোনো প্রতিষ্ঠান যত শক্তিশালী ও যত বড়োই হোক-না-কেন তাহার স্থান দেশের উপর হইতে পারে না। এমন ঘটনা বিরল নয় যখন দেখি যে যাঁহারা কোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের ভালোবাসা দেশভক্তিকেও ছাড়াইয়া যায়। ইহাও একটি চোরাগর্ত, এ সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ব্যক্তির কোনো মূল্য নাই। দরকার হইলে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র যে প্রতিষ্ঠানের পতাকার নীচে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে আনিতে হইবে তাহা হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। উহাই দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

বিশ্বের সকল দেশে যুবকরাই স্বাধীনতার পতাকাবাহী। তাই বর্তমান সংগ্রামেও ভারতের যুবকরাই থাকিবে সংগ্রামের পুরোভাগে। আমাদের বর্তমান সমাজ শাস্ত্র ও লোকাচারের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। বহু ক্ষেত্রে শাস্ত্রের উপরও লোকাচারকে স্থান দেওয়া হয়। শাস্ত্র শাশ্বত, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকাচার ও প্রথা বদলায়। আমরা যদি প্রগতিশীল সমাজের দাবি করি তবে যুগের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকাচার ও প্রথার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

আমি বুঝিতে পারি না যে-দেশের লোক বিশ্বাস করে ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন সে দেশের লোক অস্পৃশ্যতার মতো একটি প্রথা কেমন করিয়া সহ্য করে।

আমরা যদি স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই তাহা হইলে সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া আচার ও প্রথার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। সামাজিক গণতন্ত্র ভিন্ন রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন। যদি আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্র চাই তবে সামাজিক গণতন্ত্রের মূল্যেই তাহা কিনিতে হইবে। যাহা জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু তাহা ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বাস্থ্যকর ও প্রাণপ্রদ পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। অতীত কালে হয়তো বর্ণপ্রথার সার্থকতা ছিল কিন্তু এখন উহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে এবং বর্তমানে যে-রূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে উহা যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয় সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল।

নমঃশূদ্রদের কাছে আমার আবেদন, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দোষের জন্য সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে আপনারা ক্ষোভ পোষণ করিবেন না। যে নতুন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে তাহা সকল প্রকার অন্যায় দূর করিয়া দিবে। সমাজে প্রত্যেকেই তাহার যোগ্য স্থান পাইবে।

আর-একটি কথা। যুবকদের মধ্যে ধূমপানের বিপজ্জনক প্রবণতা বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা এখনই বন্ধ করিতে হইবে।

১০

১৭ মার্চ ১৯২৮ উডবার্ন পার্কে সরলা দেবী চৌধুরানীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত মহিলাদের সভায় প্রদত্ত।

পুরুষগণ স্বদেশী শপথ পূর্ণ করিতে চান। তাই আমি মহিলাদের কাছে এই আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি যে আপনারা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারের শপথ নিন ও দেখুন যেন পারিবারিক ব্যবহারের জন্য অন্যান্য বিদেশী পণ্যও কেনা না হয়— যাহাতে একটি ফলপ্রসূ ও সামগ্রিক বয়কট সম্পন্ন করা যায়। তাহা হইলে দাসত্বের শৃঙ্খল শীঘ্রই খসিয়া যাইবে। তুরস্ক, রাশিয়া, চীন ও আফ-গানিস্তানে যেরূপ ঘটিয়াছে এ দেশেও তেমনই পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শক্তি এমন দুর্দমনীয় হইয়া উঠিবে যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

বেকার সমস্যা আজ দেশে ভয়াবহ রূপ নিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনে অর্থনৈতিক শোষণ চলিতেছে, ভারতের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটিয়াছে। অসহ-যোগ ও বয়কট ভিন্ন প্রতিকারের আর কোনো পথ আমাদের কাছে খোলা নাই।

গুজবের প্রতিবাদ

গতকাল সন্ধ্যায় হাওড়ায় ৭নং ওয়ার্ডে আমি কংগ্রেসের একটি সভায় গিয়াছিলাম। আমি পেঁছিয়াই শুনিলাম যে কয়েকজন গুণ্ডা লাঠি লইয়া সভাস্থল আক্রমণ করিয়াছিল ও তাহারা তখন চলিয়া যাইতেছে। আমি দেখিলাম যে একজন লোক গুরুতর আহত হইয়া প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুইয়া আছে। আরো তিনজন খুবই আহত হইয়াছে ও তাহাদের হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে। বিনা প্ররোচনায় এই উচ্ছৃংখল আক্রমণ ঘটিয়াছে। শুনিলাম যে লোকগুলি 'আল্লা-হো-আকবর' ও 'চারু-বাবু-কি-জয়' ধ্বনি দিতে দিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। কংগ্রেসের কৃতিত্ব হিসাবে উল্লেখ করিতেছি যে তাহাদের কেহই, এমন-কি, মার খাইয়াও, প্রতি-আক্রমণ করে নাই। আমি সভাস্থলে পেঁছিয়া সভায় বক্তৃতা করি ও বুঝাইয়া বলি যে কংগ্রেস দলকে আক্রমণ করিয়া কংগ্রেস-বিরোধীরা বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছে। ইহার ফল তাহাদের পক্ষে শুভ হইবে না।

আমি দেখিয়া দুঃখ পাইলাম যে কংগ্রেস-বিরোধীরা কংগ্রেসের নিকট হইতে মুসলমান ভোট ভাগাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ইন্ধন জোগাইতেছে। হাওড়ায় শেষ মুহূর্তে যত রকম বাজে গুজব ছড়ানো হইতেছে যাহাতে কংগ্রেস অসুবিধায় পড়ে। সর্বশেষে গুজবটি এই যে গত রবিবার একটি কংগ্রেস শোভাযাত্রা যাইবার সময় উহার পাশ দিয়া বর্তমান চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র সিংহের জননী ও স্ত্রী একটি গাড়ি করিয়া যাইতেছিলেন, ঐ সময় ভোলানাথ রায় উঁহাদের অপমান করেন। চারুচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার দলবল ইহা হইতে রাজনৈতিক মুনাফা উঠাইতেছেন এবং এই ঘটনা লইয়া কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। আমি গতকাল রাত্রে ভোলানাথ রায়ের বাড়ি গিয়া তাঁহার সংগে দেখা করি। শ্রীযুক্তা সিংহ গাড়ি করিয়া যাইবার সময় শোভা-যাত্রায় যাঁহারা ছিলেন তেমন অনেকের সংগেও দেখা করি। আমি যে অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে নির্দ্বিধায় বলিতে পারি কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় সম্পর্কে যে গুজব রটাইয়াছেন তাহার কোনো ভিত্তি নাই। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় কিংবা কোনো কংগ্রেস কর্মী কিংবা কোনো স্বেচ্ছাসেবক চারুচন্দ্র সিংহের পরিবারের কোনো মহিলাকে অপমান করেন নাই। আমি হাওড়ার জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে প্রচারিত কোনো বিবৃতিতে

আদৌ কর্ণপাত না করেন। কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠী শেষ মুহূর্তে আরো যে-সব সন্দেহজনক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে সে সম্পর্কেও যেন তাঁরা হুঁশিয়ার থাকেন। কংগ্রেস-প্রার্থীদের সাফল্য সন্দেহাতীত ভাবে সুনিশ্চিত।

২৬ মার্চ ১৯২৮

হাওড়ার ভোটারদের প্রতি

হাওড়ার কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীর অন্তিম সময় আসিয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে তাহাদের খেলা সাঙ্গ হইতে চলিয়াছে। তাই শেষ অস্ত্র হিসাবে তাহারা সব রকম সন্দেহজনক কৌশল অবলম্বন করিতেছে। নৈতিক প্রচার ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা লোককে ভয় দেখাইতেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ৭ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত একটি সভায় একদল গুন্ডা লাঠিসোটা সহ আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু এই হীন ও উচ্ছৃঙ্খল আক্রমণের ফলে সব ভোটদাতাই কংগ্রেস পতাকার নীচে জমায়েত হইয়াছেন। হাওড়া ও সালকিয়ার সব ওয়ার্ডেই আশ্চর্যজনক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে। আমার সন্দেহ নাই যে কংগ্রেসপ্রার্থীরা বিপুল সাফল্য লাভ করিবেন। আমি ভোটদাতাদের কাছে আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন ২৮ ও ২৯ তারিখে হাজারে হাজারে ভোট দিতে আসেন ও কংগ্রেস প্রার্থীদের অনুকূলে নির্ভীকভাবে ভোট দেন।

২[illegible] মার্চ ১৯২৮

স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রসঙ্গ

২৬ মার্চ ১৯২৮ স্কটিশ চার্চ কলেজের সভায় প্রদত্ত।

স্কটিশ চার্চ কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ মিত্রের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা হইল, সে ৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালন করিয়াছে ও তাহার কলেজের ছাত্রদের কাছেও ঐদিন হরতাল পালনের আহ্বান জানাইয়াছে। আরো অভিযোগ, প্রমোদ ঘোষাল ও অন্য কয়েকজন মিলিয়া যে ছাত্র সমিতি গড়িয়াছেন শচীন তাহাতে যোগ দিয়াছে। স্কটিশ চার্চ কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ সমিতিকে সুনজরে দেখেন না। যদি মাত্র এই দুটি অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিতে পারেন তবে আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে কর্তৃপক্ষের আচরণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

রাজনীতি কী

আমাদের প্রায়ই পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে যে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নয়। যদি কোনো মিউনিসিপ্যালিটি কোনো স্বরাজ্যদলের লোককে সম্বর্ধনা দেয় তবে বলা হইয়া থাকে যে মিউনিসিপ্যালিটি রাজনীতি করিতেছে। লাটসাহেব কোনো সভার সভাপতিত্ব করিলে তাহা রাজনীতি হয় না, কিন্তু আমরা ঐ সভায় উপস্থিত হইলে তখনই তাহা রাজনীতি হইয়া যায় এবং তখন ঐ সভায় ছাত্রদের হাজির থাকা নেহাতই অপরাধ হইয়া পড়ে। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা যদি রাজনীতি হয়, জন্মভূমির উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা যদি রাজনীতি হয়, তবে ছাত্রই হোক আর শিক্ষকই হোক, সেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর নাই।

সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় একজন মিশনারী এম.এল.সি. ঘোষণা করিয়াছেন যে বাঙালী ছাত্ররা সবাই ভালো ও ভদ্র, কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা তাহাদের ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই তাঁহার স্বদেশের অবস্থাটা কী। ইংলন্ডে প্রত্যেক ছাত্রই হয় রক্ষণশীল, নয় শ্রমিক, বা লিবারাল পার্টির সদস্য। প্রত্যেক শহরেই ছাত্রদের নিজস্ব রাজনৈতিক ক্লাব আছে। সেই-সব ক্লাবে তাহাদের যোগ দিতে বলা হয়। ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউনিয়ন আছে, সেখানে পার্লামেন্টের বিশিষ্ট

সদস্যগণ রাজনৈতিক বিষয়েরই আলোচনায় ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিতে আসেন। এইভাবে ইংলন্ডে ছাত্রদের নিজ নিজ রাজনৈতিক মত গঠন করিয়া লইতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইংলন্ডে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাই সাধারণত বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন এবং মনে মনে যাচাই করেন যে ঐ ছাত্রটি নিজ দলের একটি সম্পদ হইবে কিনা।

আমি ভাবিয়া অবাক হই যে ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয় এ উপদেশটি ভারতে বিতরণ করা হয় কেন— যখন ইংলন্ডে পরিস্থিতি ঠিক বিপরীত। ভারতে র‍্যাগিংয়ের কথা শোনা যায় নাই। ভারতে এরকমও কখনো শুনিতে পাওয়া যায় নাই যে ছাত্ররা গোটা শহরের আলো নিভাইয়া দিয়াছে, খেয়াল বশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা কলেজের সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। ইংলন্ডে কিন্তু এরূপ ঘটনা শোনা যায়। কিন্তু সেজন্য সেখানে ছাত্ররা শাস্তি ভোগ করে না, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহাদের ক্ষমা চাহিতে বলেন না, ছাত্রদের খেয়ালীপনা বন্ধ করিতে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য লইয়া পুলিসও আগাইয়া আসে না।

কিন্তু ভারতে চিত্রটি অন্য রকম। সরকার বা তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা সুনজরে দেখেন না বলিয়া ছাত্রদের পক্ষে এখানে ছাত্র অ্যাসোসিয়শনে যোগ দেওয়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিলে অপরাধটি কী হইবে? যদি তাহাদের আত্মমর্যাদা বোধ থাকে, জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ থাকে তবে তাহারা যাহা করিয়াছে সেই পথ আঁকড়াইয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই। সমগ্র ছাত্রসমাজ তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে এবং তাহাদের ন্যায়-সংগত অধিকার তাহাদেরই রক্ষা করিতে হইবে। আজ যদি এই মুহূর্তে তাহারা ভাঙিয়া পড়ে বা দুর্বলতা দেখায় তবে ভবিষ্যতে যে-ছাত্ররা কলেজে যোগ দিবে তাহাদের আরো বেশি মাত্রায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। নায়সংগত কারণে তাহারা যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহা হইতে তাহারা যদি এখন বিচ্যুত হয় তবে কলিকাতার অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা, এমন-কি, বেথুন কলেজের ছাত্রীরাই বা তাহাদের সম্পর্কে কী ভাবিবে?

ইহা তো নিছক আভ্যন্তরীণ বিবাদ, পরিস্থিতি বিচার করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তোমাদের আছে। আমি আশা রাখি যে জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তোমরা এই বিবাদের স্থায়ী নিষ্পত্তি করিয়া লইতে পারিবে।

বয়কটের বাণী

২৬ মার্চ ১৯২৮ কুষ্টিয়ায় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করার কাজ জোর চালাইতে হইবে। কৃষকরা যাহাতে জমিতে পাট চাষ বন্ধ করে সেজন্যও প্রচার চালাইতে হইবে। ব্রিটিশ বস্ত্র, এমন-কি, সকল বিদেশী বস্ত্রই বয়কট করা সম্ভব। পাট চাষও যদি যথেষ্ট কমাইয়া না দেওয়া যায় তবে পাটচাষীদের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

আমি ইহা জানিয়া দুঃখ পাইয়াছি যে কুষ্টিয়ায় একটিও খাদির দোকান নাই। এখানে খাদির কাজ চালাইতেও যত্ন করা হয় নাই। আপনাদের কাছে আমার আবেদন এই যে আপনারা খাদি পরুন, খাদি উৎপাদন করুন, কিংবা খাদি উৎপাদনে সাহায্য করুন। আর পাট চাষীদেরও আপনারা বুঝাইয়া বলুন যে তাহারা যেন কম জমিতে পাট চাষ করে।

যুবকদিগের দায়িত্ব

২৬ মার্চ ১৯২৮ কুষ্টিয়ায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ।

বর্তমান যুগ দেশের যুবকদের উপর কোন্ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহা তোমরা উপলব্ধি করো। সকল দেশে ও সকল যুগে যুবকরাই অসাধারণ কাজ করিয়া থাকে। ভারতের যুবকরাও, আত্মসচেতন হইলে, অসম্ভব কার্য সাধন করিতে পারিবে। দেশের যুবকদের এ দেশের গৌরবপূর্ণ অতীত সম্পর্কে ও অপেক্ষমাণ গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সচেতন হওয়া দরকার।

যুবকদের সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, জাতির প্রতি বিশ্বাস ও গৌরবদীপ্ত নিয়তিতে আস্থা। আমার মনে হয়, মুক্তিতৃষ্ণার স্পর্শ পাইলেই তোমাদের মধ্যে সে বিশ্বাসের জাগরণ ঘটিবে। যখন একজন মানুষের মনে স্বাধীন হইবার ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে সে নিজের মধ্যে ও তাহার জাতির মধ্যে অখণ্ড শক্তি ও অখণ্ড সম্ভাবনা খুঁজিয়া পায়।

কালের গতি এমন যে যুবকদের কাঁধে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। তাহারা কি সে দায়িত্ব বহনের যোগ্য হইয়া উঠিবে না?

তোমরা সত্য মর্যাদা ও নির্ভীকতার পতাকা উচ্চে তুলিয়া ধরো। তোমরা সংঘ ও সংগঠন গড়িয়া তোলো ও সেই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের পতাকাতলে আনয়ন করো। একমাত্র এই উপায়েই তোমরা দেশের স্বাধীনতা আনিতে পারিবে।

জাতীয় কংগ্রেসকে সম্মান করুন

২৬ মার্চ ১৯২৮ কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

আমাকে মিউনিসিপ্যালিটি যে সম্মান জানাইলেন ও অনুগ্রহ করিলেন, আমি মনে করি তাহাতে জাতীয় কংগ্রেসকে সম্মান জানানো হইয়াছে। সত্য ও স্বাধীনতাই জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ। একজন ব্যক্তি-মানুষরূপে এরকম সম্বর্ধনা লাভের সামান্যতম যোগ্যতাও আমার নাই।

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের সম্পদ। বলা হয় যে অতীতে ভারতীয়রা গণতন্ত্র কী তাহা জানিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্র যেমন পাশ্চাত্যের, তেমনই প্রাচ্যেরও সম্পদ-- ইহা সমগ্র মানবজাতির ঐশ্বর্য। যেখানেই মানুষ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে সেখানেই তাহারা গণতন্ত্র নামক সুন্দর রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্‌ভাবন করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে যে অতীত যুগে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিদ্যমান ছিল। এখনো ভারতের নানা স্থানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বজায় আছে। সন্দেহ নাই যে ভারতীয়রা বেশ কিছু কাল হইল এই-সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আবার ঐ-সব প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে।

জাতীয় সংস্থা দখল

যে উদ্দেশ্য লইয়া পৌরসংস্থা ও জেলা বোর্ডগুলি আমাদের দখল করিতে হইবে সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য: প্রথমত, পৌরসংস্থার প্রশাসনের উন্নতি বিধান ও করদাতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই স্বায়ত্ত-

শাসিত সংস্থাগুলি পরিচালনা করিয়া ভারতীয়দের উচ্চতর দায়িত্ব বহনের ও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

ইংলন্ডে যেমন, ভারতেও তেমনই একাধিক সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী সুস্পষ্ট কর্মসূচী লইয়া পৌরসংস্থা ও জেলাবোর্ডগুলির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

পরিশেষে, আপনারা আমাকে যে সম্মান জানাইলেন সেজন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে— যে কংগ্রেসের আমি একজন দীন সেবক— এবং তরুণ সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

২৬ মার্চ ১৯২৮ কুষ্টিয়ায় জনসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মাগান্ধী যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন তাহা আজও চলিতেছে। কর্মসূচীর ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে হয়তো কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আন্দোলন এখনো প্রাণবান রহিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশবন্ধু আর আমাদের মধ্যে নাই এবং মহাত্মা গান্ধীও অসুস্থ— কিন্তু সেজন্য হতাশ না হইয়া আমাদেরই আরো কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে জাতীয় কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে না।

হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা খাঁটি কথা বলেন না। ভারতবর্ষের লোকদের মূল সমস্যাগুলি কী? খাদ্যাভাব, বেকারিত্ব, জাতীয় শিল্পের অবক্ষয়, মৃত্যুহার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য-হীনতা, শিক্ষার অভাব— এইগুলিই মূল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বাঁচিয়া থাকাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই-সকল বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ অভিন্ন।

গত দেড়শত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে জাতীয় শিল্পের অবক্ষয় ও ধ্বংসের ফলে দেশ ক্রমেই রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে আমাদের এইসব সমস্যা দেখা দিয়াছে। একমাত্র স্বরাজ লাভ করিলেই এই সব সমস্যার সমাধান

করা সম্ভব— তাহা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। একমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টার ফলেই স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হইবে। আর যদি এমন কোনো সমস্যা থাকে যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মতের অমিল হয় তবে তাহা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বা গোল টেবিল বৈঠকে বসিয়া সমাধান করা যাইবে। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব হইলে কে তাহাতে লাভবান হয়? উভয় পক্ষই হত বা আহত হয়, উভয় পক্ষকেই গারদে পুরিয়া দেয়; তারপর দেখা যায় যে একই কারাকক্ষে একসঙ্গে তাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। আর যাহাদের কারাদণ্ড হয় নাই, যাহারা গ্রেপ্তার হয় নাই, তাহাদের হয়তো পিটুনি কর গুণিয়া দিতে হয়। সরকার কোনোদিনই দুই সম্প্রদায়ের মতবিরোধ দূর করিতে পারিবে না। উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়া মিশিয়া এই বিরোধ দূর করিতে হইবে।

কংগ্রেস বর্তমানে যে কর্মসূচী অনুসরণ করিতেছে এখন তাহার কথা বলিব। আমাদের এখন প্রধান কাজ ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করা। আমরা বর্তমানে প্রতি বৎসর ইংলন্ড হইতে ১১১ কোটি টাকার ব্রিটিশ পণ্য আমদানী করিয়া থাকি। তন্মধ্যে ৫০ কোটি টাকা যায় শুধু কাটা কাপড় আমদানী করিতে। আমরা যদি আরম্ভে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট সফল করিয়া তুলিতে পারি তবে পর মোটামুটি ভাবে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটও করিতে পারিব। তাহার ফলে ভারত হইতে বছরে ১১১ কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যাওয়া বন্ধ করিতে পারিব। তাহা হইলেই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হইবে।

আমি গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থ হানি করিতে চাই না। কিন্তু ভারতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে ইংলন্ডের স্বার্থ যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে তো সেজন্য ভারতকে কেহ দায়ী করিতে পারে না। ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করিতে পারিলে ভারতের নিজস্ব শিল্পের বিকাশ ঘটাইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। ভারতীয়দের উদ্যোগ তখন বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ আসিবে। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি আনয়নের পক্ষেও ইহা সহায়ক হইবে।

আর-একটি করণীয় হইল পাট চাষ হ্রাস করা। গত দুই বৎসর যাবৎ কাঁচা পাট উৎপাদন অতিরিক্ত হইবার ফলে মূল্য অনেক পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বের বাজারে পাটদ্রব্য মজুত হইয়া গিয়াছে। তবু হেসিয়ানের মূল্যখুব চড়া আছে ও সেই সুযোগে পাটকলগুলি বিপুল মুনাফা লুটিতেছে। মূল্য শুধিতেছে গরিব চাষীরা। আমরা হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছিলাম যে যদি

তাহারা এবার পাট চাষের জমি কমাইয়া না দেয় তবে তাহাদের সর্বনাশ হইবে। হইয়াছেও তাহাই।

কুষ্টিয়ায় পৌর নির্বাচন আসিতেছে। কুষ্টিয়ার জনসাধারণের কাছে আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন দলে দলে কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেন। সরকার-ঘেঁষা পুরানো দলকে দীর্ঘ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে; আগামী তিন বৎসরের জন্য একটি নতুন দলকে— কংগ্রেস দলকে— সুযোগ দেওয়া উচিত।

এখনই সর্বান্তঃকরণে কাজ শুরু করিয়া দিবার উপযুক্ত সময়। দেশের ভিতরে এখন ঐক্য রহিয়াছে। ১৯২১ সালে ভারত যেরূপ শক্তিশালী ছিল এখন তদপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও খুব অনুকূল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতে বয়কট আন্দোলন সফল করিতে সাহায্য করিবে। আমি যুবকদের আহ্বান জানাই, তাহারা হাজারে হাজারে আসিয়া কংগ্রেসে যোগ দিক ও বিজয়ের পথে অগ্রসর হোক।

নারীশক্তির জাগরণ

২৬ মার্চ ১৯২৮ কুষ্টিয়ায় যতীন্দ্রমোহন হলে পর্দানশীন মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ।

আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা সর্বপ্রযত্নে জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করুন। আপনারা গৃহে পুত্র-কন্যাদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলুন যে তাহারা যেন দৈহিক শক্তির অধিকারী ও সেইসঙ্গে সাহসী ও নির্ভীক হয়। শীর্ণদেহ ও দুর্বলচেতা পুত্রকন্যাদের জননী না হইয়া বীরের জননী হোন। বৃহত্তর গৃহ, অর্থাৎ সমাজ ও দেশের প্রতিও আপনাদের কর্তব্য আছে। আর ক্ষুদ্র গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে মনোযোগ আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না।

দেশের নারীশক্তির জাগরণ ঘটাইতে হইলে নারীকর্মী প্রয়োজন। আমি আশা রাখি, আপনাদের মধ্য হইতে নারীকর্মীরা আগাইয়া আসিবেন— তাঁহারা

কংগ্রেসের বাণী প্রত্যেক মহিলার নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় কর্মে মহিলারা যোগ্য অংশ না নেন ততদিন পর্যন্ত ভারত কিরূপে স্বাধীন হইবে? আমার বিশেষ আবেদন, মিহি শাড়ি পরা ছাড়িয়া দিন। মিহি শাড়ি বেশির ভাগই বিদেশ হইতে আসে। যদি মোটা কাপড় পরিতে অভ্যস্ত হন তবে বিদেশী বস্ত্র স্বভাবতই বয়কট হইয়া যাইবে। আপনারা স্বদেশীর শপথ নিন ও গৃহ হইতে গৃহান্তরে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করুন।

স্বদেশী মেলা

২৯ মার্চ ১৯২৮ উত্তর কলিকাতায় সিমলা ব্যায়ামশালায় স্বদেশী মেলার উদ্‌বোধন উপলক্ষে ভাষণ।

দেশ যখন বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তখন এই রকম মেলার আয়োজন করা খুবই দরকার। দেশের বিভিন্ন স্থানে যে-সব বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করিলে বয়কট আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হইবে। কারণ তখন সহজে জানা যাইবে কোন্ কোন্ স্থানে স্বদেশী পণ্য পাওয়া যায়। স্বদেশী পণ্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য সংগ্রহশালা ধরনের একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন। প্রাথমিক পদক্ষেপ রূপে স্থির করা হইয়াছে যে কলিকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্রমান্বয়ে এরূপ মেলার আয়োজন করা হইবে। সংগ্রহশালার মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা গেলে বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে। তবে দেশের নারীসমাজ বয়কট আন্দোলনকে সাহায্য না করিলে এ আন্দোলনের সাফল্য লাভের কোনো আশা নাই।

যৌবন ও অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি

৪ এপ্রিল ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ছাত্রসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ।

তোমাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলে আমার বারো বছর আগের ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়া যায়। সে সময় আমার মন এই কথা ভাবিয়া পীড়িত হইত যে আমরা কি আমাদের জীবনে একঘেয়েমির প্রভাব কাটাইতে পারি না, আমাদের চিরস্থায়ী রুটিন-বাঁধা কর্মসূচীকে সরাইয়া দিতে পারি না, অজানার অভিসারে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে কি চলিতে পারি না? আমাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য, নূতনত্ব বা অনিশ্চয়তা নাই। আমাদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি বলিয়া কোনো কথাই জানা নাই। বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইংরেজদের অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। যখন একটি গোটা জাতি অ্যাডভেঞ্চারের জন্য পাগল হইয়া ওঠে তখনই ইহা সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া যায়।

আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বলিয়া একটি সংবাদপত্র কলমের পর কলম আমার নিন্দায় ব্যয় করে। উক্ত সংবাদপত্রে বহু মিথ্যা কথা লেখা হইতেছে। কিন্তু একটি সত্য কথা তাহারা লিখিয়াছে যে আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। সত্যই ঐ বহিষ্কারের ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল। যখন ছকবাঁধা পথে চলিতে আমরা বিরত হই তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হই। যুবক ও ছাত্ররা বিদ্রোহ করিয়াছে এই মর্মে বহু অভিযোগ শুনিয়া থাকি। যদি তাহাই হয় তবে ঐ বিদ্রোহ কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া দাবি করার স্পর্ধা কাহারো নাই। ইহা যুগের লক্ষণ মাত্র। কেহই বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবে না ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলায় ছাত্ররা প্রভৃত সাফল্যের সঙ্গে যে হরতাল পালন করিয়াছে তাহা লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র ও নেতারাই উহা ঘটাইয়াছেন। উহা যে একটি ব্যাপক জাগরণের ফল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না। এ জাগরণের তরঙ্গ রুখিবে কে? যখন ছাত্রদের জাগরণ ঘটিয়াছে তখন উহা ঠিকভাবে খাঁটি পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে—এই কথা বলিয়া আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করা হইতেছে। শৃঙ্খলা ও আইন-কানুন অবশ্যই মানিয়া চলিতে

হইবে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আইন শৃংখলা মানার কথা বলা হইলে আমি তাহাতে কর্ণপাত করিব না।

বর্তমানে তরুণ সমাজ কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ হইয়াছে। তাহারা সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করিতেছে বা হাঁটিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইতেছে। এ সবই স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। মানুষ অসীম উৎসাহ ও আনন্দ অনুভব না করিলে কোনো মননশীল, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজ করিতে পারে না।

আমার মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন জাগে. আইন সভায় অংশ লইয়া কিংবা বিদেশী বস্ত্র বয়কট করিয়া আমরা কি স্বরাজ লাভ করিতে পারিব? এমন কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচী নাই একমাত্র যাহার সাহায্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব। যে মুহূর্তে সমগ্র জাতি স্বাধীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করিতে পারিবে সেই মুহূর্তেই আমরা স্বাধীন হইব— তাহার আগেও নহে, পরেও নহে।

মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি তাসের ঘর মাত্র। আমাদের সম্মতির উপরই ইহার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। যে মুহূর্তে আমরা অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত লইব সেই মুহূর্তে ইহা ধূলিসাৎ হইবে। এই মর্মে জনৈক ইংরেজও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে এক দিনে যে সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে এক রাত্রিতেই তাহা বিলীন হইয়া যাইবে। এরূপ 'জাতীয় ইচ্ছা' জাগাইয়া তুলিতে হইলে দেশের সামনে নানারকম কৌশল ও কর্মসূচী রাখিতে হইবে।

তোমরা যাহা চাও তাহা পাইতে হইলে তোমাদের সংগঠিত উপায়ে চলিতে হইবে। নৈতিক যুক্তির সাহায্যে সকল ছাত্রের একটি ফেডারেশন গড়িয়া তুলিতে হইবে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এ দেশের সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াও। এ দেশের আদর্শ কংগ্রেসেরও আদর্শ। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করা সেই আদর্শেরই অংগ। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার উপায়ে তোমরা কংগ্রেসকে সাহায্য করো। তারপর যে-বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ দিতে হইবে তাহা হইল তোমরা সবল দেহ গঠন করো। সাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধীর তুলনায় লেনিনের অনুগামীর সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু লেনিন তাঁহার লক্ষ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন। লেনিনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছে কারণ তাঁহার অনুগামীরা ছিল সংগঠিত। যুবকরা তাহাদের জীবনের এই নির্মল পর্বে এই মন্ত্র গ্রহণ করুক যে এখন হইতে তাহারা সততার সংগে ও যুক্তিযুক্তভাবে, ধর্মাচরণের মতো, দেশের স্বাধীনতার কাজে সাহায্য করিবে।

স্বদেশী বস্ত্র

৫ এপ্রিল ১৯২৮ বনগাঁয় জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

বনগাঁ মহকুমায় মৃত্যুহার খুব বেশি। যদি এই মৃত্যুহার অনুরূপ থাকে তবে আগামী চল্লিশ বৎসরে এই মহকুমা জনশূন্য হইয়া যাইবে। কেন বাংলার মানুষ কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগের শিকার হয়? গত বিশ্বযুদ্ধের চার বৎসরে বিশ্বে যত লোক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ভারতে এক বছরেই তদপেক্ষা বেশি লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু বরণ করে। ভারতে প্রতি মিনিটে বহু লোক মরে। কিন্তু তাহারা তো মানুষের মতো মরে না। মৃত্যু যদি অনিবার্যই হয় তবে মানুষের মতো মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। ইটালি জাপান ও আমেরিকায় ম্যালেরিয়া নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু ভারত ম্যালেরিয়ার কি স্থায়ী আশ্রয় লইয়াছে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য কালান্তক ব্যাধি নির্মূল করার মতো ক্ষমতা বা টাকা কোনোটাই ভারতবাসীর নাই। স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত এই ক্ষমতা বা টাকা তাহাদের থাকিবেও না।

এক সময় ছিল, যখন ইংলন্ডবাসী ভারতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া কাটাইত। তারপর আসিল ভারতের দুর্ভাগ্যের সময়। ভারতীয় বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হইল, আইন করিয়া ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় বস্ত্র আমদানী বন্ধ করা হইল, ইংরেজ নরনারীর ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করাও বন্ধ হইল। এমন-কি, সামাজিক বয়কটরূপী অস্ত্রটিও প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই-সকল উপায়ে ব্রিটিশ বাজার হইতে ভারতীয় বস্ত্র বিতাড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর ইংলন্ডে উৎপাদিত বস্ত্র যখন ভারতে চালান করা হইতে লাগিল তখন ভারত প্রত্যাঘাত করে নাই। বিনা প্রতিবাদে ভারত ব্রিটিশ বস্ত্র কিনিতে লাগিল ও তাহার ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইয়া গেল। ভারতের জনসাধারণ যখন ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইল তখন ভারতের স্বদেশী বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পথে চলিয়া গেল। এখন বছরে ইংলন্ড হইতে একমাত্র বস্ত্রই আমদানী করা হয় পঞ্চাশ কোটি টাকার, বস্ত্রসহ অন্যান্য পণ্য লইয়া আমরা আমদানী করি একশত এগারো কোটি টাকার দ্রব্য। এই অর্থ রপ্তানীর স্রোত বন্ধ করা গেলে ভারতের আর্থিক অবস্থার বহু পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইবে।

আইন করিয়া ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানী বন্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নাই। ব্রিটিশ পণ্য আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতাও আমাদের নাই। তাই স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার বা ক্রয় করা বন্ধ করিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা ও সংকল্প থাকিলে আমরা বছরে সাতাশ কোটি টাকা রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে পারি। আমার আবেদন, আপনারা মিহি কাপড় ছাড়ুন। মিহি কাপড় বেশির ভাগই বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। মোটা কাপড় পরুন। মোটা কাপড় স্বদেশী কাপড়। বর্তমানে দরিদ্রতর শ্রেণীর লোকরাই মিহি কাপড়ের বৃহত্তম ক্রেতা। তাহাদের বুঝাইয়া মিহি কাপড় ছাড়িয়া মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে রাজি করাইতে হইবে। যদি খাঁটি স্বদেশী বস্ত্র আপনারা চান তবে খাদি পরিতে হইবে। যদি এই বয়কট আন্দোলন চালাইবার ফলে স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি হয় তবে চরকায় সুতা কাটা ও তাঁতে বস্ত্র বোনা লোকের পক্ষে আয়জনক হইবে। বিদেশী বস্ত্র বয়কটের পক্ষে প্রচারের ফলে খাদির প্রচলন বাড়িয়া যাইবে।

আমাদিগকে লবণও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। পৃথিবীর কোনো দেশে লবণ কর নামে কোনো আইন নাই। উহার কথা কেহ জানেও না। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের উপর লবণ কর চাপানো হইয়াছে। ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে কোনো যোগ্য ভারতীয় প্রতিনিধি নাই। ফলে ভারতীয় শিল্প ইম্পিরিয়াল ব্যাংক হইতে জরুরী প্রায়াজনে অর্থ সাহায্য পায় না। ব্রিটিশ শিল্পগুলি কিন্তু সে সাহায্য পায়। সাতকড়ি ঘোষ তাঁহার রেল-ভাড়া সম্পর্কে লিখিত পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন যে রেল-ভাড়া স্থির করার ব্যাপারে রেলওয়ে বোর্ড কোনো যুক্তির ধার ধারেন না। স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত রেলওয়ে বলুন, স্টেট ব্যাংক বলুন— কিছুই জাতীয় নীতি অনুসরণ করিবে না। ভারতীয় শিল্প রাষ্ট্রের নিকট হইতে পর্যাপ্ত সাহায্যও পাইবে না। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান তাহার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভরশীল।

দেশের নানা স্থানে লোক অনাহারে মরিতেছে। ক্রমাগত দুর্ভিক্ষই স্থায়ী ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ আমাদের খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। খাদ্য রপ্তানী হইয়া যায়। খাদ্য সংরক্ষণ করা গেলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু খাদ্য রপ্তানী বন্ধ করার ক্ষমতা তো জনসাধারণের হাতে নাই।

শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে টাকা চাই। স্বরাজ লাভ না করা

পর্যন্ত দেশের অর্থভাণ্ডারের উপর দেশবাসীর অধিকার আসিবে না। আগে লোক শিক্ষালাভ করুক, তারপর তাহারা স্বাধীনতা লাভের আশা পোষণ করিতে পারিবে— এ রকম কথার পিছনে কোনো যুক্তি নাই। অক্ষরজ্ঞান স্বরাজ লাভের যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। আফগানিস্তানে সাক্ষর নারীপুরুষের শতকরা হার কত? নিশ্চয়ই ঐ হার ভারতের তুলনায় বেশি নয়। কিন্তু আফগানিস্তান স্বাধীন, ভারত তাহা নয়। ব্রিটেনে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার আগে পর্যন্ত সে দেশে শিক্ষার হার বর্তমান ভারতের মতোই ছিল। যখন কোনো দেশ স্বাধীন হইতে চায় তখন সে দেশ স্বাধীন হয়। মুক্তির বলবতী ইচ্ছা জাগিয়া ওঠা দরকার। কিভাবে জাতীয় ইচ্ছা জাগাইয়া তোলা যাইবে তাহাই এখন আমাদের প্রধান সমস্যা।

আপনাদের কাছে আমার আবেদন, কংগ্রেসে যোগ দিন। কংগ্রেস কমিটি-গুলি পুনর্গঠিত হইলে কংগ্রেসের কর্মসূচী পালন করা যাইবে। আমি জানিয়া সুখী হইয়াছি যে বনগাঁ কংগ্রেস কমিটি পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। আশা করি, বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও পাট চাষ বন্ধ করা— কংগ্রেসের এই দুইটি কর্মসূচী আপনারা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করিবেন। বয়কট আন্দোলন চালাইয়া গেলে আপনারা স্বদেশী শিল্প ও স্বদেশী উদ্যোগকে সহায়তা দিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপও সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

গত দুই বৎসর যাবৎ পাটের উৎপাদন অতিরিক্ত বাড়িয়াছে, তাই পাটের দামও পড়িয়া গিয়াছে। আগামী ১ জুলাই তারিখে সারা বিশ্বে ৫০ লক্ষ বেল পাট গুদামজাত থাকিবে। সারা বিশ্বে পাটের বার্ষিক চাহিদার উহা অর্ধেক পরিমাণ। এ বৎসর উৎপাদন কমাইয়া দিলে পাটের সরবরাহ কমিয়া যাইবে ও তাহার ফলে স্বভাবতই দাম বাড়িয়া যাইবে। সেজন্য পাট চাষের জমি কমাইয়া দিতে হইবে। দাম বাড়িলে শুধু যে পাট-চাষীরাই লাভবান হইবেন তাহা নয়। ডাক্তার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই— গোটা সমাজই— লাভবান হইবে। পাটচাষীদের উপার্জনের ভাগ সবাই পায়। পাট চাষের জমির পরিমাণ অন্তত অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া দরকার।

তরুণদের কাছে আমার আবেদন: তোমরা তোমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দাও। শারীরিক ব্যায়াম চর্চায় মন দাও। সবল দেহ গঠন করো। কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হও! সর্বপ্রকারে কংগ্রেসকে শক্তিশালী কর।

তোমাদের মিশনই হইল কাজ করা ও ত্যাগ স্বীকার করা। তোমাদের কাছে ত্যাগ স্বীকারের যে আহ্বানই আসুক তাহাতে দ্বিধা করা উচিত নয়। তোমাদের প্রয়াসের উপরই দেশের ভাবী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আমার মনে কোনো সংশয় নাই যে তোমরা যুগের ডাকে সাড়া দিবে— তোমরা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে।

বয়কটের ডাক

৬ এপ্রিল ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'জাতীয় সপ্তাহ' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে বয়কট-সভায় কলিকাতার নাগরিকরা স্বদেশীর শপথ লইয়াছিলেন। বর্তমান সভায় খাদির প্রতি আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। খাদির তাৎপর্য পুরাপুরি বুঝিতে হইলে দেড়শত বৎসর আগের বাংলার কথা মনে করিয়া দেখুন। সেই প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে দেশের লোকের বস্ত্রের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটাইয়াও ভারত বিদেশে বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানী করিত। কিন্তু এখন আমরা বিদেশের উপর এতদূর নির্ভরশীল যে ম্যাঞ্চেস্টার ভারতে কাপড় না পাঠাইলে আমাদের নগ্নতা ঢাকিবার ক্ষমতা নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলন্ড হইতে ভারতের স্বাভাবিক হারে বস্ত্র আমদানী করা যাইত না। সে সময় এমন খবর পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে যে নিজেদের লজ্জা ঢাকিবার মতো বস্ত্রের অভাবে গরিব বাঙালী মেয়েরা আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়াছেন। এখন আমরা আমাদের দেশবাসীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের উপায় বাহির করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছি।

ইংলন্ডই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে। স্বদেশী শপথ গ্রহণ করার পর এখন আমাদের কর্তব্য দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খদ্দরের বাণী প্রচার করা। আমরা খাদির জন্য যে মুহূর্তে চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিব তখনই মোটা কাপড় ও মিলের কাপড়ের তুলনায় দাম বেশি বলিয়া খদ্দরের প্রতি যে বিরূপতা আছে, তাহা দূর হইয়া যাইবে। চাহিদা বাড়িলে খদ্দরের দামও কমিয়া যাইবে।

বর্তমানে ইংলন্ড হইতে ভারতে বছরে যে বস্ত্র আমদানী করা হয় তাহার মূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকা। ভারত যদি একদিকে ইংলন্ড হইতে এই বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিতে পারে এবং অপর দিকে খাদি শিল্পের উন্নতি ঘটাইয়া বস্ত্র ব্যাপারে স্বয়ম্ভর হইতে পারে তবে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে বেশি সময় লাগিবে না।

ইংলন্ড ভারতের আবেদন ও নিবেদন উপেক্ষা করিয়া ও স্বরাজের জাতীয় দাবিতে কর্ণপাত না করিয়া, এই বয়কট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমাদের বাধ্য করিয়াছে। আমাদের আত্মরক্ষার এই আন্দোলন যদি ব্রিটিশ শ্রমিকদের স্বার্থ-হানি ঘটায় ও তাহাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে তবে তাহার জন্য ইংলন্ডই দায়ী হইবে।

পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য

৮ এপ্রিল ১৯২৮ বসিরহাট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব ও তাহার সমর্থনে ভাষণ।

আমি আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করিতেছি :

"এই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য।"

যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্প্রতি এই ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছে, বাংলার রাজনীতিতে কিন্তু ইহা নূতন নয়। পঁচিশ বৎসর আগে এই বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ সভামঞ্চ হইতে ও তাঁহার মুখপত্র 'বন্দেমাতরম্'-এর পৃষ্ঠায় ঘোষণা করিয়াছিলেন— ভারতের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। এই আদর্শ দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করার ফলে দেশ তখন দুই শিবিরে ভাগ হইয়া যায়— এক শিবিরে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ পরিচালিত চরমপন্থী দল, অপর শিবিরে ছিলেন নরমপন্থী দল। তাঁহারা যে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন আমি সেই ইতিহাসে প্রবেশ করিব না। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা চলে না যে অরবিন্দের বাণী বাংলার তরুণদের মনে অভূতপূর্ব উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল।

কয়েকবারের ব্যর্থ প্রয়াসের পর বর্তমান প্রস্তাবটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা গ্রহণ করানো গিয়াছে। তাহার অর্থ এই যে পঁচিশ বৎসর আগে বাংলায় যে ভাবধারা উদ্‌গীত হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখন জয়যুক্ত হইয়াছে।

কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় যাঁহারা বিদ্রূপ করিতেছেন তাঁহাদের মনোভাব আমি বুঝিতে পারি না। ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করার ফলে কংগ্রেস বিশ্ববাসীর দরবারে হাস্যাস্পদ হয় নাই। বরং এতদিন কংগ্রেস রাজনৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে নাই বলিয়াই হাস্যাস্পদ হইয়া আসিয়াছে। যে মুহূর্তে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভারতের লক্ষ্য ঘোষণা করা হইয়াছে সেই মুহূর্তেই ভারতের মর্যাদা বিশ্ববাসীর কাছে বাড়িয়া গিয়াছে।

এতদিন কংগ্রেসের আদর্শ যথাযথভাবে বিবৃত হয় নাই। তাহার ফলে বিদেশে ভারতীয় যুবকদের কত ঠাট্টাবিদ্রূপ সহিতে হইয়াছে। লোকমান্য

তিলক যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন তখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্ররা তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ইংলণ্ডের ছাত্রসমাজে লোকমান্যের পরিচয় ছিল একজন চরমপন্থী নেতা রূপে। কিন্তু লোকমান্য সেদিন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করাই ভারতীয়দের লক্ষ্য। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া ছাত্রদের কেহ কেহ বলিয়াছিল : 'এই যদি তোমাদের চরমপন্থী নেতার বক্তব্য হয়, তবে নরমপন্থীদের বক্তৃতা শুনিবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই।'

অবশ্য কতগুলি গরম কথা বলিলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে না। বর্তমানে দেশ যে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় পড়িয়াছে তাহাতে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে কথা বলা ও কাজ করা। সর্বদলীয় সম্মেলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারেই সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। আমাদের কাজ ছিল খুব কঠিন। সব দলের সহযোগিতা পাওয়া গেলে তবেই আমাদের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব ছিল। লর্ড বার্কেনহেড ভারতের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ রাখিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ভারতে এত পরস্পর বিবদমান মত ও স্বার্থ রহিয়াছে যে ভারতীয়দের পক্ষে একমত হইয়া একটি সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। সর্বদলীয় সম্মেলন যদি তাহার নির্দিষ্ট কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করিতে পারে তবে লর্ড বার্কেনহেডের অপমানকর চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দেওয়া হইবে। সর্বদলীয় সম্মেলনের কাজ পণ্ড করার চেষ্টা করিলে তাহার ফলে বার্কেনহেডকে সহায়তা দেওয়া হইবে।

আপনারা ধৈর্য ধরুন। সর্বদলীয় সম্মেলন তাহার কাজ সমাপ্ত করে নাই। যখন তাহার কাজ শেষ হইবে তখনই প্রচেষ্টার ফলাফল বিচারের সময় আসিবে।

ভাষণ

১

১২ এপ্রিল ১৯২৮ রাজশাহী শহরে সমাজ সেবক সংঘের নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রদত্ত।

সমাজ সেবক সংঘের আশ্চর্য অগ্রগতির জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। বিশ্বের সর্বত্র বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস একই রকম। ক্ষুদ্রভাবে শুরু হইয়া, অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে, এক-একটি প্রতিষ্ঠান বড়ো হইয়াছে। সমাজকে সাময়িকভাবে সেবা করিয়া আপনারা তৃপ্ত হইবেন না। সমাজকর্মীদের দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি লইতে হইবে। আপনারা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য সেবার কাজ বরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই-সব দুঃখ-দুর্দশা কিভাবে চিরতরে দূর হয় সে কথা ভাবুন। তাহা হইলে আপনারা যে শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেবক হইতে পারিবেন তাহা নয়, পরন্তু বহু রোগ ও বিপর্যয় রোধ করিতে পারিবেন। বিপর্যয়কে আমরা নিয়তির বিধান বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির জন্য মানুষই দায়ী। যেমন বন্যা ও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা ইত্যাদি রোগ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ঐগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছে।

আপনারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের মধ্যে ঐক্য বিধান করিয়া স্থায়ী ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন। আপনারা জীবনের নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করুন। বাঙালীর সমৃদ্ধির জন্য আপনারা কাজ করুন।

আজ দেশের অধঃপতন দেখা দিয়াছে। একজন আমেরিকান লেখক বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে মানসিক ক্ষমতার দিক হইতে ভারতীয়রা নিকৃষ্ট নয়, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা নাই। গত দেড়শত বৎসর যাবৎ দেশের প্রতিরক্ষায় তাঁহাদের অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার ফলে শারীরিক দৃঢ়তাও তাঁহারা হারাইয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে আমাদের ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিলে জাপান ও তুরস্কের মতোই আমরাও অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের জাতির রূপান্তর সাধন করিতে পারিতাম। এই বিষয়ে

আপনারা সরকারের নিকট হইতে বিশেষ কিছুই আশা করিতে পারেন না। কিন্তু সেজন্য হাত জোড় করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শারীরিক দৃঢ়তা ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে আপনারা অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি বাড়ান। দূর-পাল্লার হাঁটা ও সাইকেল চালানো, বিশ্বভ্রমণ— ইত্যাদি ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক গ্রামে ব্যায়ামাগার খুলুন। অল্প বয়স হইতেই বালক ও বালিকাদের শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করা উচিত।

বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইল স্বদেশীর প্রসার ঘটানো। সরকারী চাকরির দ্বারা বেকার সমস্যা মিটিবে না। অন্যান্য দেশে যুবকদের সামনে সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পথ খোলা থাকে। এ দেশের যুবকদের সামনে এ-সব কোনো পথ খোলা নাই। জাতীয় সরকার ছাড়া জাতীয় শিল্প গড়া সম্ভব নয়। জাতীয় শিল্প ছাড়া এই-সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

যেমন পাট-চাষের কথা বলিতেছি। পাট-চাষ একমাত্র বাংলায়ই হয়। কিন্তু বাংলার পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য পায় না। বিশ্বে বছরে পাটের চাহিদা পাঁচ কোটি মণ। যখনই উৎপাদন ইহার তুলনায় বাড়িয়া যায় তখন পাটের মূল্য কমের দিকে যায়। গত বছর অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়াছে। তাই পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে। এত কমিয়াছে যে উৎপাদনের খরচও পোষায় নাই। ফলে প্রচুর পরিমাণ পাট মজুত আছে। এ বছর যদি পাট চাষের জমি না কমানো যায় তবে পাটের দাম আরো পড়িয়া যাইবে। আমেরিকায় একটি আইন আছে যাহার বলে তুলার বাড়তি উৎপাদন হইলে তাহা পোড়াইয়া ফেলা হয়। তুলার দাম যাহাতে কমিয়া না যায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

কিন্তু আমাদের দেশে সরকারের নিকট হইতে এমন কোনো সাহায্য পাইবার আশা করা চলে না। যে কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পাট উৎপাদন করে তাহারা তাহাদের কঠোর শ্রমের মূল্য পায় না, অথচ বিদেশী চটকল মালিকরা— যাঁহারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে— তাঁহারা অপরিমেয় মুনাফা লুট করিতেছে— ইহাই ভাগ্যের পরিহাস।

পাট চাষ কমানো সম্পর্কে চাষীদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে প্রচার কার্য চালাইতেছে তাহার ফলে, অজ্ঞ ও কঠোর পরিশ্রমী কৃষক সমাজকে যাহারা শোষণ করে তাহারা ঘাবড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। পাটের দর সাময়িকভাবে বাড়াইবার কথা চলিতেছে। পাট-উৎপাদকরা পাট চাষের

জমি যাহাতে বাড়ায় সেজন্য প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যই ইহার মূলে। এই দুরভি-সন্ধিপূর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। জাতির পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইলে যুবকদের মানুষের মতো আচরণ করিতে হইবে।

২

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মর্মরমূর্তির আবরণোন্মোচন উপলক্ষে প্রদত্ত।

মানুষ সর্বোচ্চ যে ত্যাগ বরণ করিতে পারে তাহা হইল তাঁহার জীবন ত্যাগ। যে-কোনো মহান আত্মত্যাগের পিছনে দীর্ঘকালের চিন্তা ও প্রস্তুতি থাকে। মুহূর্তের আবেগে যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় বস্তুত তাহা সেভাবে ঘটে নাই। বহু বৎসরের প্রস্তুতি তাহার পিছনে আছে। কেহই জানে না কখন ত্যাগের আহবান আসিবে। সেজন্য প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্যথা সে আহবান যখন আসিবে তখন সাড়া দিতে পারা যাইবে না। স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই মহাত্মা ছিলেন। কর্তব্যের ডাকে তিনি নির্দ্বিধায় যেভাবে সাড়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আত্ম স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

১২ এপ্রিল ১৯২৮

৩

ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে

১৩ এপ্রিল ১৯২৮ রাজশাহী শহরে এক বিশাল জনসমাবেশে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

আমি কংগ্রেসের একজন দীন সেবক। আমাকে সম্মান জানাইয়া আপনারা সেই মহান জাতীয় প্রতিষ্ঠানকেই সম্মান জানাইতেছেন। আমাদের গৌরবজনক অতীতের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের আত্মশক্তিতে আমাদের বিশ্বাস নাই। এই কারণেই আমাদের দেশের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। যেদিন আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইব, যেদিন আমরা আমাদের আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হইব সেদিনই আমাদের দুর্দশার অন্ত হইবে।

আমাদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার কথা আমাদের প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত। একদা ভারতীয় নাবিক ও বণিকরা দূর সাগরে পাড়ি দিত ও এ দেশ হইতে দূর দূরান্তে বাণিজ্যব্যপদেশে যাইত। কেন তাহারা অবলুপ্ত হইয়া গেল? একদা ভারতীয় বিশ্বজ্ঞন এবং প্রচারকগণ পাহাড় পর্বত ডিঙাইয়া দূর দেশে ভারতীয় সভ্যতার বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। আজ কেন তাঁহাদের কোনো পদাঙ্ক অনুসারী নাই? যে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব আজও জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, চীন ও ব্রহ্মের মতো সুদূর দেশ-গুলিতে লক্ষিত হয় সেই মহিমামণ্ডিত সভ্যতা অস্তমিত হইল কেন? কেন আত্মপ্রসারের প্রেরণা লুপ্ত হইয়া আত্ম-সংকোচনের প্রবণতা দেখা দিল? এ-সব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার।

যাই হোক, আমাদের দুর্দশার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা দেশের ঘটনাপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করিতেছেন তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন যে ইহা কি প্রকৃত জাগরণ, না ইহা মুমূর্ষু ভারতীয় জীবনধারার উপর বহিরাগত প্রভাবের প্রতিক্রিয়াজনিত একটি ঘটনা মাত্র? যাঁহারা ভারতে কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প— প্রতি ক্ষেত্রে নবজীবনের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা ভারতের এ জাগরণ যে প্রকৃত ও স্থায়ী সে বিষয়ে আর সন্দেহ পোষণ করিতে পারিবেন না। ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে ও সম্মুখে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে না।

দেশে যে কয়টি আন্দোলন শুরু হইয়াছে প্রত্যেকটিতেই ফললাভ হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরই আসিয়াছে মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার। বঙ্গভঙ্গও রদ হইয়াছে। বিপ্লবীদের কার্যক্রমের ফলেই আসিয়াছে মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কার। তৃতীয় অধ্যায় শুরু হইয়াছে অসহযোগ আন্দোলন দিয়া। ঐ পর্ব এখনো শেষ হয় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্লেখযোগ্য কোনো ফল পাওয়া যায় নাই এ কথা বলার মতো সময় তাই এখনো আসে নাই। বস্তুত-পক্ষে, আমরা এখন একটি সুবর্ণ সুযোগের সম্মুখীন হইয়াছি যাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে অভূতপূর্ব ফল লাভ করিতে পারিব। সবই নির্ভর করিতেছে আগামী দুই বৎসর আমরা কী করিব তাহার উপর।

উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এমন বিস্ময়কর ঐকমত্য আমরা কখনো দেখি নাই। সাইমন কমিশনের প্রতি দেশের সব কয়টি দল একযোগে বিরোধিতা

জানাইয়াছে। তাহা ছাড়া, কয়েক বৎসর আগেও ইংলন্ডের অবস্থা যত শক্তিশালী ছিল আজ আর তাহা নাই। ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা সে এখন পরিবৃত। অপর পক্ষে ঘাত-প্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ভারত যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে তেমনই অধিকতর শক্তিশালী অবস্থায়ও সে উপনীত হইয়াছে।

আমরা স্বরাজ কী উপায়ে লাভ করিব? আইন সভায় প্রবেশ করিয়া চরকা কাটিয়া কিংবা ব্রিটিশ পণ্য পুরাপুরি বয়কট করিয়াও স্বরাজ পাইব না। যখন দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য, যে দাসত্বশৃঙ্খলে তাহারা আবদ্ধ তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হইবে সেইদিনই আমরা স্বরাজ পাইব—তাহার একদিনও আগে নয়। আমাদের সকল কার্যক্রম একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করিতে হইবে! তাহা হইল দেশবাসীর মধ্যে এমন মানসিকতা সৃষ্টি করা যে তাহারা যেন আর একদিনের জন্যও দাসত্ব বরদাস্ত না করে!

মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দ্বারা ৩০ কোটি জনসাধারণকে পদানত করিয়া রাখার অপেক্ষা বৃহত্তর ধোঁকা আর হইতে পারে না। ইউরোপীয়রা উন্নততর জাতি—এই মনোভাব আমাদের পাইয়া বসিয়াছে বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। যেদিন জনসাধারণ এই মোহাবেশ কাটাইয়া উঠিবে সেই দিনই, জনৈক পশ্চিমী লেখকের উক্তিতে 'যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি দিনে গড়িয়া উঠিয়াছিল একটি রাত্রেই তাহা মিলাইয়া যাইবে।' জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীন হইবার-ইচ্ছা কার্যকর করিয়া তুলিতে পারিলেই তাহাদের মোহাবেশ কাটিয়া যাইবে।

অনেকে বলেন ভারতের স্বরাজ লাভের পক্ষে অনেক বাধা আছে— যেমন নিরক্ষরতা। কিন্তু নিরক্ষরতা বাধা হইতে পারে না। আফগানিস্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জগদীশচন্দ্র বসুর মতো কোনো ব্যক্তিকে জন্ম দেয় নাই, কিন্তু সেও তো স্বাধীন দেশ। আফগানিস্তানের রাজাকে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের রাজধানীতে চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হইতেছে। তাই সাক্ষরতা বা শিল্পের অগ্রগতি স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। স্বাধীন হইবার ইচ্ছাই সেই মাপকাঠি।

দেশের জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থনের ফলেই সরকারী যন্ত্র চলিতে পারে। যেদিন তাহারা সেই সম্মতি ও সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইবে

সেদিনই মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশীর পক্ষে প্রশাসন চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

এমন একদিন ছিল যখন ভারতীয় পণ্য উৎপাদকরা দেশের জনসাধারণের সকল চাহিদা মিটাইতে পারিত, উপরন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য মারফত প্রতি বছর ভারতে কোটি কোটি টাকা আসিত। বিদেশের লোকরা সেজন্য বিমর্ষ হইত। একসময় ইংলন্ডের অধিবাসী ভারতে উৎপাদিত বস্ত্র পরিত। ইংলন্ডে উৎপন্ন বস্ত্র ভারতীয় বস্ত্রের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঁটিয়া উঠিত না। কিন্তু ইংলন্ড চড়া আমদানী শুল্ক বসাইয়া, আইন করিয়া ও সামাজিক বয়কটের সাহায্যে ব্রিটিশ বাজার হইতে ভারতীয় বস্ত্রকে তাড়াইয়া ছাড়িয়াছে। কিন্তু ইংলন্ড যখন তাহাদের তৈয়ারী বস্ত্র ভারতের বাজারে ঢালিতে লাগিল তখন ভারত অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিতে কোনো ব্যবস্থা লইবার ক্ষমতা তাহার নাই। ক্রমে ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া গেল ও ফলে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মচ্যুত হইল।

আপনার প্রতিবেশীর বুকে ছোরা বসাইয়া দেওয়া যদি পাপ হয় তবে বিদেশী বস্ত্র পরিধান করা আরো বেশি পাপ। কেননা বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারের অর্থ ভারতের গরিব শ্রমিকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া। প্রত্যেকের উচিত ধর্মাচরণের মতোই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করা— তা সে বস্ত্রের দাম যাহাই হোক-না কেন। কারণ ঐ দাম দরিদ্রের সেবায় লাগিবে।

একদা ভারত সারা বিশ্বে প্রাচুর্যের দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। আজ সেই ভারত চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ও মড়কের দেশে পরিণত হইয়াছে। খাদ্য রপ্তানীই তাহার কারণ। ভারতের তিন দিক সমুদ্রবেষ্টিত। সমুদ্রের জলে প্রচুর লবণ আছে। অথচ সমুদ্রের জল হইতে লবণ উৎপাদন করা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। পৃথিবীর আর কোথাও তো এমন ব্যবস্থা দেখা যায় না। যতদিন পর্যন্ত না দেশের জনসাধারণ দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে না পায় ততদিন এ অন্যায়ের প্রতিকার হইবে না।

হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক— ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর-কিছু হইতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাহাকেও রেহাই দেয় না। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাছবিচার না করিয়াই তাহারা ধ্বংস ডাকিয়া আনে। শিক্ষা সমস্যা, বেকার সমস্যা, রোগ প্রতিরোধের সমস্যা ইত্যাদির সমাধানে হিন্দুও যেমন আগ্রহী মুসলমানও তেমনই আগ্রহী।

জনসাধারণ স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত এ-সব সমস্যার কোনো সমাধান করা সম্ভব নয়। বাংলার প্রতিটি জেলায় মৃত্যুহার যেভাবে বাড়িতেছে তাহা হ্রাস করা না গেলে আগামী পঞ্চাশ বছরে দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।

আত্মরক্ষার তাগিদেই স্বরাজ লাভের প্রয়াসে একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। ম্যালেরিয়া, জলাভাব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দূরীকরণের কথা উঠিলেই সরকার অর্থাভাবের কথা বলে। কিন্তু ধরুন যখন পুলিস কনস্টেবলদের জন্য মশারি সরবরাহ কিংবা হাওড়া বালীতে বহু ব্যয়সাপেক্ষ সেতু নির্মাণের কথা হয় তখন সরকারী কোষাগার অফুরন্ত ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় ক্ষমতার অপব্যবহার। এ দেশের জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি অবহেলা চলিতেছে। একমাত্র স্বরাজ লাভ করিলেই ইহার প্রতিবিধান হইতে পারিবে।

পাট চাষ কমানো দরকার। ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে খবর জোগানোই সরকারের কৃষি দপ্তরের একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায়ীদের আজ্ঞাতেই ঐ দপ্তর পরিচালিত হয়।

বর্তমানে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট ও স্বদেশীর প্রসারের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বদেশীর বাণী লইয়া যাইবে। জনসাধারণকে ঐ বাণীতে তাহারা উদ্বুদ্ধ করিবে। ঠিকভাবে বুঝাইতে পারিলে জনসাধারণ আহ্বানে সাড়া দেয়। একমাত্র ভারতের স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বয়কটের কর্মসূচী লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে যদি ব্রিটিশ স্বার্থ বিপন্ন হয় তবে আমরা নাচার। ইংরেজরা তাহাদের স্বদেশে যে অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে ভারতীয়রাও তাহাই চায়।

প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও থানায় একটি করিয়া কংগ্রেস কমিটি গড়িতে হইবে। প্রচণ্ড বেগে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। আপাতত পাট চাষ কমানোর জন্যও কংগ্রেস কর্মীদের প্রচার চালাইতে হইবে।

আপনারা স্বদেশী শপথ নিন। শপথ বাক্য পাঠ করুন।

৪

ছাত্ররাই দেশের আশা

১৩ এপ্রিল ১৯২৮ রাজশাহী শহরে ছাত্রগণ-প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ছাত্র ও তরুণ সমাজের উপর আমার কোনো প্রভাব থাকুক তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কলিকাতার দু-একখানি সংবাদপত্র এমন কথা বলিতেও দ্বিধা করে নাই যে কলিকাতায় ছাত্র-অসন্তোষের জন্য আমি ও আর দু-একজন রাজনৈতিক নেতা দায়ী। কিন্তু ইহা সত্যের অপলাপ মাত্র। কলিকাতায় যে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহা অধুনা সারা বিশ্বে যে বিক্ষোভের মনোভাব দেখা যাইতেছে তাহারই অংশ মাত্র। তরুণ-চিত্তে যে বিক্ষোভের ভাব উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা দেখিতেছি। এই প্রকাশকে জোর করিয়া কেহ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবে না।

ছাত্ররা যখন আমাদের কাছে উপদেশের জন্য আসে তখন তাহাদের এই মনোভাবকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়া নিশ্চয়ই আমার মতো রাজনৈতিক কর্মীর কর্তব্য নয়। যদি আমি ছাত্রদের উপদেশ দিয়া কোনো অন্যায় করিয়া থাকি তবে সে অপরাধ আমি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইব। ছাত্ররাই দেশের আশা। বিশ্বের সর্বত্র তাহারাই স্বাধীনতার অগ্রদূত। তাহাদের লক্ষ্য দেশকে স্বাধীন করা ও নতুন জাতি গঠন করা। ইহা সহজ কাজ নহে। ইহার জন্য দরকার বহু ভাবনা-চিন্তা, প্রস্তুতি ও আত্মত্যাগ। দেশের তরুণদের ইহা করিতে হইবে। নিজের আদর্শ স্থির ভাবে অনুসরণ করিয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো বেদনা নাই। একজন দর্শকের নিকট যাহা নেহাতই দুঃখকর বলিয়া মনে হয়, একজন উচ্চ আদর্শের অনুসারীর নিকট উহাই আনন্দ-স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, আত্মত্যাগের মধ্যেই পাওয়া যায় খাঁটি আনন্দ। যে ব্যক্তি যত আদর্শ-পাগল সে ব্যক্তিই তত আত্মত্যাগের শান্তি উপলব্ধি করে। প্রত্যেকের মধ্যেই অসীম শক্তি সুপ্ত আছে। স্বাধীনতাহীনতার মর্মজ্বালা যে মুহূর্তে কেহ অনুভব করে তখনই তাঁহার সুপ্ত-শক্তি জাগরিত হয়।

দেশ দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা

ইত্যাদি নিবারণযোগ্য ব্যাধির প্রকোপে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের জীবন যারপরনাই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাথমিক হইতে উচ্চতম শিক্ষা পর্যন্ত আজিকার শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল বর্তমান সরকারের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। মেকলে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবেন যাহার ফলে এদেশের লোক ইংরেজের রীতিনীতি ও আচারপ্রথার অন্ধ অনুকরণ করিয়া পরম পুলক লাভ করার মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবে। বস্তুতপক্ষে, এরূপ এক শ্রেণী ভারতীয়ের উৎপত্তিও হইয়াছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল যথেষ্ট খারাপ হইয়াছে। এখন যতটুকু ভালো ফল আদায় করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে। আমাদের দেশ স্বাধীন নয় বলিয়া বিদেশেও ভারতীয়রা মর্যাদা পায় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বরাজ পাইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনধারণের সার্থকতা থাকিবে না। আমরা আমাদের প্রাথমিক অধিকার-গুলি হইতেও বঞ্চিত। ঐগুলি বাদ দিয়া যে শাসনতন্ত্রই রচিত হোক আর যে অধিকারই আমরা পাই তাহার কোনো মূল্য নাই, তাহা বিফল।

এই সন্ধিক্ষণে তরুণদের প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য হইল সারা দেশে এমন অগণিত সংগঠন গড়িয়া তোলা যেগুলি হইবে একটি সৈন্যদলের বিভিন্ন রেজিমেন্টের মতো— জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে তাহারা সকলে সমবেত হইবে। একই লক্ষ্যে উদ্‌বুদ্ধ ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সংগঠনগুলি দেশে এক বিপুল শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হইবে স্বরাজলাভ। অহিংসার পথেই ইহাদের পরিচালনা করিতে হইবে। সন্দেহ নাই যে সরকারের বেতনভুক ভৃত্যরা উস্কানিদাতা রূপে আসিবে ; তাহারা দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রচারের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিবে ও অপরিণত তরুণদের অবিবেচনাপ্রসূত কার্য করিতে প্ররোচনা দিবে ও আমাদের বহুসংখ্যক মানুষকে ফাঁদে ফেলিবে। কিন্তু এই হতভাগ্য ভাড়াটিয়াদের দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। এই-সব জীবদের কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যখনই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কথা ওঠে, তখনই অনিবার্যরূপে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য, খালি বোতল ও মরিচাধরা পিস্তল আবিষ্কার করা হয় ও বিশ্বজনসমক্ষে ঘোষণা করা হয় যে বোমা কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সারা দেশের ভিতর এই যে সংগঠনের জাল ছড়াইয়া থাকিবে তাহার ভিতর হইতে একদল কর্মী ব্রিটিশ-বস্ত্রের বিরুদ্ধে নিবিড় প্রচার চালাইয়া যাইবে ও এইভাবে স্বদেশী পণ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে ; আর একদল কর্মী ঐরূপে প্রস্তুত ক্ষেত্রের সুযোগ লইতে অগ্রসর হইবে। এইভাবে পাশাপাশি ধ্বংসাত্মক ও গঠনাত্মক কাজ চালাইতে হইবে। সমান্তরাল দুই শ্রেণীর সংগঠন থাকিবে। একশ্রেণীর সংগঠন সংগ্রামমুখী প্রচারকার্য চালাইবে, আর-এক শ্রেণীর সংগঠন ঐ প্রচারের দ্বারা লব্ধ ফল সংহত করিয়া তুলিবে— প্রথম দলের দ্বারা বিজিত ভূমির উপর দ্বিতীয় দল দখল কায়েম করিবে।

ছাত্রদের কাছে আমার আবেদন, তোমরা ধূমপানের মতো ক্ষতিকর অভ্যাস ত্যাগ করো। ধূমপান করিয়া ধূমপানকারীর কোনো উপকার হয় না। বরং দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা ধূমপান খাতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

স্থানীয় সংস্থাগুলি কংগ্রেসের কর্মীদের দখল করার প্রয়োজন আছে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করা যায়। পৌরসংস্থাগুলিতে রাজনীতি আমদানী করা উচিত নয়— এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না।

৫

নারীদের প্রতি

১৩ এপ্রিল ১৯২৮ রাজশাহী শহরের টাউন হলে মহিলা-সমিতি প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

যে চিন্তা আমাদের অতিশয় পীড়িত করে তাহা এই যে বাহিরে আমরা যত আন্দোলনই করি গৃহের অন্তঃপুরে তাহা পৌঁছায় না। দেশের নারীসমাজ যতদিন পুরুষের সঙ্গে সহযোগিতা না করিবেন ততদিন দেশের কাজ আগাইয়া লইবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

অতীত যুগে ভারতের নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে উচ্চতম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আপনারা ইচ্ছা করিলে এখনো গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করিতে পারেন। দেশের স্বার্থের দাবি এই যে গৃহের সংকীর্ণ পরিসরে মহিলারা আর যেন তাঁহাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রাখেন। দেশের স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রামে তাঁহাদের পুরুষের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত।

তাঁহারা ভাবিতে পারেন যে তাঁহারা যখন ইংরেজি বিদ্যায় পটু নহেন তখন তাঁহারা দেশের কাজ আর কতটুকুই বা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। যখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্রোত এ দেশে প্রথম প্রবাহিত হইয়াছিল ও সম্মুখের সব-কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন এই রক্ষণশীলা অন্তঃপুরিকারাই সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

শিশুদের উপর মাতা ও ভগিনীদের প্রভাব খুবই বেশি। এবং সেই প্রভাবের ছাপ সারাজীবনব্যাপী থাকে। যদি বীরের জাতি তৈরি করিতে হয় তবে মায়েরা যেন শিশুদের মনে দেশপ্রেম ও বীরত্বের ভাবধারা অবশ্যই অনুপ্রবেশ করাইয়া দেন। বর্তমানে মেয়েদের স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনারা আপনাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্য সব রকম চেষ্টা করিবেন। আপনারা ছেলেদের মতো শারীরিক ব্যায়ামও করিবেন।

প্রত্যেক গ্রামে মহিলা সমিতি গড়িয়া তুলুন। কংগ্রেস সংগঠনগুলির পাশাপাশি থাকিয়া মহিলা সমিতিগুলি সারা দেশে স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতার বাণী প্রচার করিবে। মুখ্যত যে কাজটিতে আপনাদের মনোযোগ দিতে হইবে তাহা হইল প্রত্যেক গৃহে দেশপ্রেমের মনোভাব জাগানো। আপনারা ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের জন্য সচেষ্ট হোন। ব্রিটিশ বস্ত্র আপনারা পাপ বলিয়া বর্জন করুন। দেশের মেয়েদের মিহি বস্ত্রের প্রতি মোহের দরুন দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা বাহিরে পাঠাইতে হয়। খদ্দর মোটা হইলেও আপনারা খদ্দর পরুন। মনে রাখিবেন, খদ্দর কিনিতে যে টাকা খরচ করিবেন তাহার প্রতিটি পয়সা গরিব ও অভাবগ্রস্ত মানুষের দুঃখ মিটাইবে। তাহারাই খদ্দর উৎপাদন করে।

৬

১৪ এপ্রিল ১৯২৮ জলপাইগুড়ি শহরে এক জনসমাবেশে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

বাঙালীদের সফল ব্যবসায়িক উদ্যোগের কেন্দ্ররূপে জলপাইগুড়ি শহর বিখ্যাত। এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

যে-কেহ দেড়শত বৎসর আগেকার বাংলার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা

করিবেন তিনিই দেশের বর্তমান অধঃপতন ও দুর্দশা দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে দেশ নিজের চাহিদা নিজে মিটাইত ও পণ্য আমদানীর জন্য অন্য দেশের দিকে তাকাইয়া থাকিত না। এখনো দেশে দুই বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য এক বৎসরেই উৎপন্ন হয়—তবু খাদ্য রপ্তানীর দরুন এ দেশের লোক না খাইয়া মরে। দেশের সরকার জনসাধারণের দখলে না আসিলে এ অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব নয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশ হইতে যে-সব ব্যাধি বিতাড়িত হইয়াছে এখানে সেই-সব ব্যাধি আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে। এখানে লোক মশামাছির মতো মরে। জাতীয় সরকার না গঠিত হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধানে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে না।

উত্তরবঙ্গের বন্যা কী অপরিসীম দুঃখকষ্টের কারণ হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, রেল-বাঁধের মাঝে মাঝে যথেষ্ট সংখ্যক কালভার্ট না থাকার ফলেই এই নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ সর্বনাশ যাহাতে আর না ঘটে সেজন্য কি বর্তমান সরকার রেল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিবেন ?

রেল পরিবহনের অত্যধিক মাশুলের জন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। হাজার হাজার মাইল দূরের দেশ ভারতের বাজারে ভারতের প্রস্তুত পণ্যের তুলনায় সস্তা দামে পণ্য বিক্রয় করিতে পাঠাইতেছে। এখানে অত্যধিক রেল মাশুলের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার কথা। কিন্তু তাহা তা করেন না। বরং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করিতেই তাহার সমধিক আগ্রহ দেখা যায়।

ভারতীয় মিহি বস্ত্র উহার সূক্ষ্ম কাজের জন্য সারা বিশ্বে খ্যাত ছিল! ম্যাঞ্চেস্টার উহার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িয়াছে। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক কর্মচ্যুত হইয়াছে। দেশ স্বাধীন হইলে তবেই এই দুরবস্থার প্রতিকার সাধন করা যাইবে। যদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ভারতীয় জাতিকে মুছিয়া যাইতে না হয়, তবে স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সব-কিছুই জনসাধারণের উপর নির্ভর করে। যদি তাহারা না চায় তবে বর্তমান শাসন পদ্ধতি চলিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সন্ধি চাহিতে বাধ্য করাইবার অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। সে অস্ত্র হইল ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট। প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য বিদেশী বস্ত্র পাপ জ্ঞানে পরিত্যাগ করা। খদ্দর এক অর্থে সস্তা। কেননা খদ্দর ব্যবহার করিলে অন্যান্য খাতে খরচ কমিয়া

যাইবে। স্বদেশী আন্দোলনের কাল হইতে স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। ১৯০৬-৭ সালে ভারতীয় মিলগুলি দেশের চাহিদার মাত্র ৩০ শতাংশ পূরণ করিতে পারিত। এখন ৩৬ শতাংশ চাহিদা পূরণের ক্ষমতা মিলগুলির হইয়াছে। স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা বাড়িলে ভারতীয় মিলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা ৫০ শতাংশ বাড়িবে। যাহা দরকার তাহা হইল স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি করা।

তাই জোরালো বয়কট আন্দোলন চালাইতে হইবে। হাজার হাজার কংগ্রেস-কর্মীকে বৃটিশ বস্ত্র বয়কটের বাণী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার করিতে হইবে। ঐভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে আর-এক দল কর্মীকে ঐ ক্ষেত্র দখল করিতে হইবে। তাহারা স্বদেশী প্রচার করিবে।

কংগ্রেস যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করিতে যত্নশীল তাহা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে পাট চাষের বিষয়ে আমরা তাহাদের সাহায্য করিতে চাই। অত্যধিক পাট উৎপাদনের ফলে কৃষকরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। গত বৎসর পাট চাষীদের পক্ষে দুর্বৎসর গিয়াছে। এ বছর পাট চাষের ক্ষেত্র না কমাইলে পাটের দাম আরো পড়িয়া যাইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে দেশের স্বাধীনতা লাভের গুরু দায়িত্ব মুখ্যত তরুণদের উপর বর্তাইয়াছে। জনচিত্তে স্বাধীন হইবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাহাদের জাগাইতে হইবে। সাফল্য লাভের আশা করিতে হইলে তাহার আগে সারা দেশে শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৭

১৪ এপ্রিল ১৯২৮ জলপাইগুড়িতে মহিলাদের সভায় প্রদত্ত।

স্বরাজ লাভের সংগ্রামে নারী যদি পুরুষের পাশে না দাঁড়ায় তবে আমাদের সকল প্রয়াসই বিফল হইবে। পুরুষ বাহিরে যে আদর্শ প্রচার করে গৃহে তাহা যেন পালিত হয়, তাহা দেখা নারীর কর্তব্য। তাঁহারা প্রত্যেক শিশুর মনে অল্প বয়স হইতেই দেশপ্রেমের আদর্শ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন।

সারা দেশে নারী-সংগঠন গড়িয়া তোলা বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন। কংগ্রেসের পাশাপাশি থাকিয়া আপনারা নারী-সংগঠন গড়িয়া তুলুন। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ আগাইয়া আসুন ও নেতৃত্ব দিন।

একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে দেশের কাজ করিতে হইলে ইংরেজি শিক্ষা থাকা চাই। অনেক সময় ইংরেজি শিক্ষা সহায়ক না হইয়া বাধাজনক হয়। বাঙালী সমাজকে ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া হইতে সেদিন যাঁহারা রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা এই রক্ষণশীল বাঙালী মহিলা। আগামী দিনের সংগ্রামেও তাঁহারা দেশের প্রভূত সেবা করিবেন।

আপনারা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করুন। খদ্দর ব্যবহার করিতে পারিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আপনারা স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে যথাসাধ্য করুন ইহাই আমার আবেদন।

রেলশ্রমিকদের প্রতি

১৫ এপ্রিল খড়্গপুরে বি.এন. রেলওয়ে শ্রমিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ।

আপনারা যে আমাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাইলেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি এপর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারি নাই। কিন্তু যাঁহারা দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনার পুণ্য কর্মে ব্যাপৃত আছেন তাঁহারা শ্রমিকদের জন্যও খাটিতেছেন। কারণ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রের সব শক্তি মালিকের সমর্থনে নিয়োজিত হয়; আর স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের কাজে মালিকশ্রেণী সরকারকে সাহায্য করে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনেও শ্রমিক শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ অংশ লইবে। শ্রমিকরা তাহাদের যথাসাধ্য না করিলে শুধু শিল্পের অগ্রগতি নয়, দেশের সমৃদ্ধিও আসিবে না। কিন্তু তাহার জন্য শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, সাধারণ শত্রুর বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বিসম্বাদ দূর করিতে হইবে।

শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিসম্বাদ আছে। কিন্তু আপনাদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে হইবে। আপনাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একযোগে কাজ করিতে হইবে। বি. এন. রেল শ্রমিকদের আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে গত ধর্মঘটের সময় আপনারা যে-সংগ্রাম করিয়াছেন সেজন্য ভারতের সকল শ্রমিকের দৃষ্টি এখন আপনাদের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। অন্য শ্রমিকদের কাছে আপনারা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবেন কিনা তাহা আপনাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

লিলুয়ার ধর্মঘটরত শ্রমিকদের আপনারা সাহায্য করুন ইহাই আমার আবেদন। লিলুয়ায় ১৪ হাজার নির্ভীক শ্রমিক দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করিতেছে। আপনাদের কষ্টের দিনে অপরের নিকট হইতে যে সাহায্য আপনারা পাইয়াছিলেন তাহা আপনাদের সাফল্যলাভ করিতে কম সাহায্য করে নাই। আজ আপনাদের লিলুয়ার সাথীদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন— তাঁহাদের জন্য আপনারা যথাসাধ্য করুন।

লিলুয়ার শ্রমিকদের সংগ্রাম

২১ এপ্রিল ১৯২৮ সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

লিলুয়ার শ্রমিকরা ৪২ দিন যাবৎ মানুষের মতো সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। রেল-কর্তৃপক্ষ এখনো শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা দেখান নাই। শ্রমিকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করার উদ্দেশ্যে ঐ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ইচ্ছাও তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। উপরন্তু তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে খরচ কমানো ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ২৬০০ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হইবে। বামুনগাছির মর্মান্তিক ঘটনা ও রেল-কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণা হইতে ইহা স্পষ্ট যে কর্তৃপক্ষ কোনো মীমাংসাই চান না। শ্রমিকদের এই সংগ্রামে হয় জয়লাভ করিতে হইবে অথবা বিনাশর্তে তাহাদের কাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শেষোক্ত পথটি কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু প্রথমোক্ত পথটি কিছুতেই সম্ভব নয় যদি না জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যায়। আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সংকটগ্রস্ত শ্রমিকদের সাহায্যকল্পে আগাইয়া আসেন। রাষ্ট্রের সকল শক্তির সাহায্য পুঁজির পিছনে রহিয়াছে। তাহারই বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সংগ্রাম করিতেছে। সে সংগ্রামে শ্রমিকদের জন্য প্রত্যেকেরই কিছু করণীয় আছে।

পূর্ববাংলার তরুণদের প্রতি আহ্বান

২২ এপ্রিল ১৯২৮ ফরিদপুর যুব সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

জার্মানীতে বিশ্বের বর্তমান যুব আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। সেখান হইতে ক্রমে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করিতে করিতে ইহা ভারতেও আসিয়া পড়িয়াছে। এ-আন্দোলন শুভ লক্ষণ বহিয়া আনিয়াছে, কারণ খাঁটি ও মৌল জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে আর-একবার জাতিকে দাঁড় করাইবার শক্তিমত্তা এই আন্দোলনের মধ্যে নিহিত আছে।

তোমরা এতদিন বিনাপ্রশ্নে নেতাদের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছ। ঐ পদ্ধতি সঠিক কিনা সে বিচারও করো নাই। আদর্শের এরূপ অন্ধ পূজার দিন চলিয়া গিয়াছে। যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তোমরা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, বন্যাত্রাণ কমিটি, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি ও অনুরূপ নানা সংগঠন গড়িয়াছ। এখন শুধু এই-সব সংগঠন গড়িলেই চলিবে না। তোমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে কেন তেমন অবাঞ্ছিত অথচ প্রতিরোধ-যোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহার ফলে এই-সব সংগঠনের প্রয়োজন পড়ে?

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে কর্তৃপক্ষ কখনোই ছাত্রসমাজের আন্দোলন, ক্ষোভ বা তাহাদের জাগরণ পছন্দ করেন না। প্রায়ই তাহাদের আইন-শৃঙ্খলা ও সংযমের প্রয়োজনীতার কথা শোনানো হয়। নিশ্চয়ই এ-সবের দরকার আছে। আমি নিজেও এই-সব গুণের অধিকারী হইতে চাই। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা ও সংযম বলিতে কর্তৃপক্ষ যাহা বুঝাইতে চান আমি তাহা কোনোমতেই মানিতে পারি না।

তোমাদের কৈশোর হইতেই তোমরা আর-একটি উপদেশ পাইয়া থাক—তাহা হইল, ইংরেজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু বর্তমানে তোমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, রক্তশূন্য, ব্যাধিগ্রস্ত একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছ। তোমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে; তোমাদের জীবন ও জাতি এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে সম্মুখেই মৃত্যু। বলা হইয়া থাকে যে ইংরেজরাই ভারতে স্থায়ী শান্তি আনিয়াছে। কিন্তু এই শান্তির এমনই মহিমা যে তোমাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে। যখন দেশে এরকম শান্তি থাকিবে না, তখনই

জীবনের স্পন্দন ও স্বাধীনতায় মনোভাব জাগিয়া উঠিবে। আমি মহাত্মা-গান্ধীর উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিব: 'ভুল করার অধিকার আমরা চাই।' বর্তমান পিতৃসুলভ রাজত্বে তোমরা ভুল করার অধিকার পাও নাই। ব্যক্তিগত-ভাবে আইন-শৃংখলা ও সংযমের প্রতি আমারও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু জোর করিয়া সে শ্রদ্ধা আদায় করা চলিবে না। অন্তরের ভিতর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া রূপে সে শ্রদ্ধা আসিবে। একমাত্র নৈতিক অর্থেই আমি শৃংখলা ও সংযমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইতে পারে যখন তথাকথিত আইন-শৃংখলা ও সংযমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকিবে না।

আমার কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা আমি বলিতে পারি—এখন শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক নাই। শিক্ষকরা ভুলিয়া যান যে ছাত্ররাও মানুষ এবং প্রতি পদে তাহাদের মনুষ্যত্বের অপমান করা উচিত নয়। ছাত্রদেরও কর্তব্য তাহাদের মনুষ্যত্বে আঘাত লাগিলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

গোটা সমাজ-কাঠামোর উন্নয়ন উৎপাদকদের কল্যাণের উপর নির্ভর করে। পাটের উৎপাদকরা এ বৎসর খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কংগ্রেস কর্মীদের উচিত তাহাদের বিপদের দিনে তাহাদের পাশে দাঁড়ানো। জনগণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা দরকার পাটচাষীদের পাশে কংগ্রেস কর্মীরা গিয়া দাঁড়াইলে সেই সম্পর্ক আবার স্থাপিত হইবে।

তরুণদের সেবার মনোভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইতে হইবে। স্বাধীনতার প্রশস্ত পথে দেশকে লইবার জন্য তাহাদের যথাসাধ্য করিতে হইবে।

দেশবন্ধু

দেশবন্ধুর বিশাল জীবন-চিত্রের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে এমন একটি গতিশীল শক্তি ছিল যাহা একাধারে মধুর, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন মোহন ছিল যে মুসলমানগণ মনে করিতেন মুসলমান নেতাদের চেয়েও তিনি মুসলিম স্বার্থ বেশি রক্ষা করিতে পারিবেন। তথাকথিত অস্পৃশ্যরাও অনুরূপ কথা ভাবিত। তাঁহার জীবদ্দশায় একটি স্বতন্ত্র মুসলিম দল গঠন করার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এমন-কি, সরকারী কর্মচারীরাও তাঁহাকে এত ভালোবাসিতেন যে তাঁহার গ্রেপ্তারের পূর্বাহ্ণে একজন সরকারী অফিসারই তাঁহাকে খবরটি জানাইয়া দিয়াছিলেন।

গত পঁচিশ বৎসরে বাংলায় অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু দেশবন্ধুর মতো মানুষ আর আসেন নাই। দেশবন্ধু চিরদিন চাহিতেন সামনে অন্যদের স্থান দিয়া নিজে অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিবেন। কিন্তু ১৯২১ সালে যখন পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিবার মতো লোক আর পাওয়া গেল না তখন তিনিই সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কখনো নেতৃত্ব চাহেন নাই, নেতৃত্ব তাঁহার কাঁধে আসিয়া পড়িয়াছে। আপনারা তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নির্ভীকচিত্তে বিরামহীনভাবে জাতির ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিয়া যান।

২৫ এপ্রিল ১৯২৮

বোম্বাইয়ের যুবকবৃন্দ ও জাতীয় জীবন

১ মে ১৯২৮ বোম্বাই ত্যাগের প্রাক্‌কালে 'ফরওয়ার্ড'-এর সহিত এক সাক্ষাৎকারে যুবকদের জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের জন্য আনন্দ প্রকাশ।

আমরা ২০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন শুরু করি এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে 'দি ইংলিশম্যান' এই বক্তব্য প্রকাশ করে যে, মে ১৯২৮ হইতে বিদেশী পণ্যাদি আমদানীর চুক্তি বাতিল করা হইতেছে। এই উদ্‌ধৃতি দিয়া আমি ইহাই দেখাইতে চাই যে বয়কট আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি সরকারী স্বীকৃতি, আমাদের মূল্যায়ন নয়। একটি মাত্র প্রদেশে দুইমাসের প্রচেষ্টার ফল যদি এই হয়, তাহা হইলে নিবিড়ভাবে দুই বৎসর নিখিল ভারত বয়কট আন্দোলন চালাইলে তাহার ফলাফল কী হইবে তাহা অনুমেয়।

রাজবন্দীদের সমস্যা এখনো আমাদের চিন্তার কারণ। এখনো অনেক রাজবন্দী জেলে আবদ্ধ এবং আরো অনেকে দূরবর্তী অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহে অন্তরীণ। সম্প্রতি যাঁহাদের 'মুক্তি' দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন এমন একজনও আছেন কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের চলাফেরা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায় ছয়জন ব্যতীত সকলকেই নিজেদের চলাফেরার কথা মাঝে মাঝেই পুলিসকে জানাইতে হইতেছে। রাজবন্দীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদের উপর এই আদেশ জারী করা হইতেছে এবং ইহা ভঙ্গ করিলে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। প্রায় ছয়জনকে এই প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে পুণার যারবেদা জেলে দুই-জন এবং রত্নাগিরি জেলে দুইজন রাজবন্দী রহিয়াছেন। পুলিসের হেফাজতে কিংবা বন্দীদশায় একজনও রাজবন্দী থাকা পর্যন্ত তাঁহাদের মুক্তির জন্য পুরাদমে আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

শ্রমিক এবং কৃষক

শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন শুধু তাহাদের স্বার্থেই নয়, জাতীয় উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যও প্রয়োজন। যদিও আমি বিশ্বাস করি এই সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেসের আপ্রাণ সাহায্য করা উচিত, তবু শ্রমিক

আন্দোলন এবং ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকা প্রয়োজন যাহা জাতীয় কংগ্রেস হইতে অভিন্ন হইবে না।

সাইমন কমিশন বয়কট

আন্দোলন দিন দিনই শক্তিশালী হইতেছে। সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে দ্বিতীয় দফায় অভিযানে ব্রিটিশ পণ্যাদি বর্জন করা হইতেছে, এবং তাহাতে আমাদের সাফল্য পরোক্ষভাবে সাইমন কমিশন সম্পর্কে জনমত প্রতিফলিত করিবে।

খুব সম্ভবত সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য বরদৌলি যাইব না। তবে মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য আমেদাবাদ যাইব ভাবিতেছি; অবশ্য সর্বদল সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি ১৯ মে তারিখের পূর্বেই বোম্বাই ফিরিবার ইচ্ছা রাখি।

যুবকদের প্রতি বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য অংশে, বিশেষত জার্মানীতে, দৃশ্যমান বৃহত্তর আন্দোলনেরই একটি প্রকাশ ভারতবর্ষের যুব আন্দোলন। ইহা পৃথিবীর সমস্যাগুলিকে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে নূতন আলোকের সাহায্যে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই উদ্ভূত। সময়ের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাচীনদের অগ্রসর হইবার ব্যর্থতা ও সময়ের সহিত তাল রাখিয়া না চলিতে পারাও ইহার উদ্ভবের কারণ। কিন্তু যখন অন্যান্য দেশের যুবকেরা কমবেশি চিন্তাধারা বা আদর্শ লইয়া ব্যস্ত, তখন ভারতীয় যুবকের কর্মক্ষেত্র ব্যাপকতর। তাহাকে শুধু স্বপ্ন দেখিলেই চলে না, গড়িতেও হয়। আমার কাছে ভারতবর্ষ পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিভিন্ন সংস্কৃতির সংশ্লেষণ এবং পৃথক পৃথক আত্মশাসিত জাতিদের ফেডারেশন গঠনের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সমস্যাদির সমাধানই ভারতের ব্রত। এ-যাবৎ তাহার ব্রত পূর্ণ-উদ্যাপিত না হওয়ায় ভারতবর্ষ তাহার সমসাময়িকদের অপেক্ষা বেশি দিন টিকিয়া আছে। সে কেমন করিয়া পৃথিবীর সমস্যা সমাধান অথবা তাহার ব্রত উদ্যাপন করিবে? নিজের মধ্যে সুপ্ত অসীম ক্ষমতার জাগৃতির মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। সেই অসীম ক্ষমতা তখনই জাগানো যাইবে যখন প্রতিটি ভারতীয় স্বাধীনতার উম্মাদনায় উজ্জীবিত হইবে। সারা দেশে নিজেদের সংগঠনগুলিকে

ছড়াইয়া ভারতের যুবককে সেই বাসনা জাগ্রত করিতে হইবে। কংগ্রেসের মতো এক আদর্শেই এই সংগঠনগুলিকে উদ্দীপ্ত হইতে হইবে— সেই আদর্শ হইল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ; কংগ্রেসের মতোই তাহাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

দেশের সম্মুখে সাইমন কমিশন বয়কটই আমাদের সাম্প্রতিক কর্মসূচী। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যের নিয়ামক বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষ কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। জাতীয় দাবি বলবৎ করিবার একটি উপায় হিসাবেই বয়কট আন্দোলন শুরু করা হইয়াছে। একটি সর্বসম্মত জাতীয় সংবিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সাইমন কমিশনের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারা এবং ব্রিটিশ পণ্য, বিশেষত বস্ত্র বর্জনই এই আন্দোলনের ইতিবাচক দিক।

কোনো ব্রিটিশ নাগরিকের ক্লেশ উৎপাদন ব্রিটিশ বস্ত্রবর্জনের উদ্দেশ্য নহে ; এই পথ গ্রহণ করা হইয়াছে কারণ ভারতীয় বাজারে ব্রিটেনই বৃহত্তম সরবরাহকারী, তাহা ছাড়া স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহা একটি রাজনৈতিক অস্ত্রও বটে— তবে বয়কট আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্বে মিল-মালিকদের দেশকে আশ্বাস দিতে হইবে যে তাঁহারা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিবেন, এবং কংগ্রেসের পথ অনুসরণ করিবেন। বয়কট ও স্বদেশী উভয়কেই বৈজ্ঞানিক-ভিত্তিতে বাজার সংগঠনের দ্বারা হাতে হাত মিলাইয়া চলিতে হইবে এবং সুশৃঙ্খল কংগ্রেস সদস্যবৃন্দকে আইন অমান্যের মাধ্যমে সরকারের দমন-পীড়নের প্রত্যুত্তর দিতে হইবে— বয়কটকে কার্যকরী হইতে দেখিয়া সরকারকে উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবেই।

যুব সংগঠনগুলিকে শারীর-শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয়েরা শারীরিক ও নৈতিক শক্তির অধিকারী হন।

অভিভাষণ

৩ মে ১৯২৮ পুণায় ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত।

মহারাষ্ট্রের ভগিনী ও ভ্রাতাগণ,

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া আপনারা আমাকে যে উচ্চ সম্মানের ভাগী করিয়াছেন সেজন্য আপনাদের আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে আমি প্রথমে আপনাদের এই সহৃদয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সাহসী হই নাই। কিন্তু আমার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ বাংলা ও মহারাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহা আমার কোমল হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করে। অতঃপর, এই আবেদন অলংঘনীয় হইয়া উঠে এবং অন্য সকল প্রকার বিচার-বিবেচনা অপ্রাসংগিক হইয়া পড়ে। আমি আপনাদের সুনিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে আমি আনন্দ ও গর্বের সহিত সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করিতেছি, যে-সময় বাংলা ও মহারাষ্ট্র একই পতাকাতলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছে। বন্দীদশা হইতে মুক্তির পর এই দুই প্রদেশের একই রাজনৈতিক শিবিরে সমবেত দেখিবার ইচ্ছাই যে আমার মনে প্রথম এবং প্রধান স্থান পাইয়াছিল তাহা আমার বাংলার বন্ধুরা সপ্রমাণ করিবে। আমরা বর্তমানে যতই অযোগ্য হইয়া থাকি-না কেন, লোকমান্য তিলক, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে ঐতিহ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনো প্রাণবন্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমাদের দুঃখের দিনে আমরা তাহা গভীর মমত্ববোধের সহিত আঁকড়াইয়া থাকি।

লোকমান্যের মহত্ত্ব

আমি জানি, তিলক সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমি প্রায়ই তাঁহার চারিত্র্যশক্তির উত্তুংগতা এবং তাঁহার প্রতিভার বৈচিত্র্য অনুধাবন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি, তাঁহার আশ্চর্যজনক ব্যক্তিত্বের গোপন রহস্যের কথা চিন্তা করিয়াছি; কিন্তু অসংকোচে স্বীকার করিতেছি যে মান্দালয় বন্দীশালার পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মহত্ত্বের বিশালতা আমার নিকট অবারিত হয় নাই। দুই বৎসর কাল

আমার সেই বন্ধ কাষ্ঠপিঞ্জরের ছায়ায় বাস করিবার সুযোগ হইয়াছিল—ইহা ইট-সুরকির দালান ছিল না— যেখানে দীর্ঘ প্রায় ছয় বৎসর কাল লোকমান্য তিলক সম্পূর্ণরূপে নির্জন কারাজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। মান্দালয় জেলে কিছুকাল বাস না করিলে কাহারো পক্ষে উপলব্ধি করাই সম্ভব হইবে না, লোকমান্য তিলক তাঁহার দীর্ঘ নির্জন কারাজীবন কী ভয়ংকর আত্মিক পীড়নের পরিবেশে এবং অমানুষিক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যিনি এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা হইতে বিজয়ীর উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত হইয়া উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম, যাঁহার আত্মা মান্দালয় বন্দীশালার ক্ষুধিত পাষাণের প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্ত জীবনে বিকশিত শতদলের ন্যায় ঐশ্বর্যে ও সমৃদ্ধিতে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে পারে, তাঁহার অনন্য মহত্ত্ব ভাষারও অতীত। একমাত্র লোকমান্যের পক্ষেই কারাগৃহের বিষাদঘন পরিবেশের অন্তহীন নৈরাশ্যময় অন্ধকার প্রহরগুলিকে দীর্ঘ তপস্যার দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল; সেই তপস্যার পরিণতিতে 'গীতা-রহস্যম্'-এর মত মহৎ সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

বাংলা ও মহারাষ্ট্র

লোকমান্য তিলকের সময় হইতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মৈত্রীবন্ধন হঠাৎ আবির্ভূত হয় নাই। এই দুই প্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ও সম্প্রীতির পৃষ্ঠভূমিকায় ইহার উদ্ভব হইয়াছে। মারাঠী এবং বাংলা ভাষা উভয়েরই উৎস একই ভাষা-গোষ্ঠী মাগধী প্রাকৃত। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই একদিকে যেমন প্রতিভাধর হরিনারায়ণ আপ্তের মতো ব্যক্তিরা মারাঠীদের নিকট বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন, অপরপক্ষে বঙ্গভাষী পণ্ডিতেরা মারাঠি ভাষার ইতিবৃত্তের বিজ্ঞানসম্মত পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান যুগ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে এই দুই প্রদেশের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল। কথিত আছে যে জিহ্‌বাদাদা ও লক্‌বাদাদার মতো বিচক্ষণ সেনাপতি, নরোরাম এবং মলহারের মতো দক্ষ প্রশাসক, যাঁরা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত, বহুদিন পূর্বে বাংলা হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ষষ্ঠীপূজা আছে, সারস্বতদের মধ্যে তেমনি

ষষ্ঠীপূজা রহিয়াছে এবং উভয় প্রদেশবাসীই দুর্গাপূজা করেন। মারাঠীদের প্রধান তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ। বাঙালীদের তেমনি তীর্থস্থান চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ। বাংলার ঋষিতুল্য রাজা গোপীচাঁদ এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা বাংলাদেশের একমাত্র পুরাতত্ত্ববিদরাই বোধহয় মনে রাখিয়াছেন কিন্তু মহারাষ্ট্রে তাঁহাদের কথা অনেকেই মনে রাখিয়াছেন এবং মারাঠী কবি মহীপতি-বাবা জানিতেন যে তাঁহারা গৌড় বাংলা হইতেই মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন ছিলেন তিলকচাঁদ নৃপবরের পুত্র ও অপরজন তাঁহার মহিষী।

লোকপরম্পরায় শোনা যায় বাংলার সন্ত চৈতন্যদেব মহারাষ্ট্রে গিয়াছিলেন এবং সেখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কথিত আছে, মহীপতি যেমন মহামতি তুকারামের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তেমনি তুকারামও চৈতন্যদেব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

সাম্প্রতিককালে আসিলে দেখা যাইবে ছত্রপতি শিবাজীর প্রথম আধুনিক জীবনী রচনা করিয়াছিলেন একজন বাঙালী পণ্ডিত— শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়। ৩৫ বৎসর পূর্বে তিনি শিবাজীর জীবন-চরিত রচনার মৌলিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সাতারায় গিয়াছিলেন। বাংলার প্রায় অধিকাংশ কবি, নাট্যকার, গ্রন্থকার তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া শিবাজী-চরিত্র অমর করিয়া গিয়াছেন। মারাঠী সাহিত্যিক হরিনারায়ণ আপ্তের অননুকরণীয় গ্রন্থ 'উষাকালী'-র বহুপূর্বে বাঙালী ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'ছত্রপতি' নামক নাটকে, যোগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার মহাকাব্য 'শিবাজী'তে ও নবীনচন্দ্র সেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের কাব্যে এই মারাঠী বীরের বন্দনা গাহিয়া গিয়াছেন। বাজীরাও, অহল্যাবাঈ এবং আরো অনেক মারাঠী মনীষীদের সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং এইভাবেই এই দুই প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত পারস্পরিকতা সমৃদ্ধতর হইয়াছে।

দিল্লীর সাম্রাজ্যলিপ্সু সিংহাসনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত অভিযান পরিচালনা করিয়া শিবাজী আধুনিক ভারতবর্ষের হৃদয়তন্ত্রীকে এমন প্রাণচাঞ্চল্যে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, যাহা পরিমাপ করা বিদেশীদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ।

কালাতিপাতের ফলে সময় ও ব্যক্তিসত্তার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে এবং আধুনিক ভারতবর্ষ শিবাজীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে

জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিতেছে। প্রতিটি যুগে সেই যুগোচিত বীর আবির্ভূত হন। সুতরাং যে পুণা শহর যুগে যুগে বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামের লীলাভূমিরূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, খুব যোগ্যভাবেই সেই পুণা শহর বর্তমান শতাব্দীতে সাম্রাজ্যলিপ্সু দিল্লীর বিরুদ্ধে আপসহীন অভিযানের নায়করূপে নবযুগের শিবাজী লোকমান্য তিলককে পাইয়াছে। পুণা আমার নিকট স্বপ্নপুরীও বটে, বাস্তবতামণ্ডিত শহরও বটে। তাই মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনের সভাপতিরূপে বহু পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থভূমিতে দাঁড়াইয়া মহান পিতৃপুরুষগণের স্বপ্নে বিভোর হইবার যে সুযোগ আমি পাইয়াছি, সেজন্য কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

আমাদের আন্দোলন বিদেশ হইতে আনা ?

আমাদের বর্তমান নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা আপনাদের নিকট উপস্থাপনের পূর্বে আমি কয়েকটি মৌলিক সমস্যা তুলিয়া ধরিতে চাই এবং সাধ্যমতো সেই-সকল সমস্যার সমাধান দিতেও সচেষ্ট হইব। বিদেশীয়গণ আমাদের বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের দেশের নবজাগরণ সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী ভাবধারা ও পদ্ধতির পরিণত বিদেশজাত ফল। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। আমি এক মুহূর্তের জন্যও অস্বীকার করিব না যে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংঘাতের ফলেই আমাদের মানসিক ও নৈতিক অবসাদে আচ্ছন্ন-চেতনা জাগ্রত হইয়াছে। এই জাগরণ আমাদের জনমানসে আত্ম-সচেতনতা ফিরাইয়া আনিয়াছে, এবং তাহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলন— যাহা আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করিতেছি— সম্পূর্ণরূপেই স্বদেশী আন্দোলন। অনেকদিন যাবৎ ভারত অন্ধ পরানুকরণের অপসারণশীল পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া (reflex action)-রূপে বিবৃত করা যায়। ভারতবর্ষ তাহার আত্মার সন্ধান পাইয়াছে এবং বর্তমানে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে, জাতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়া জাতীয় আন্দোলনের পুনর্গঠনের কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমানে আমরা যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি, তাহা শুধু আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধেই নয়, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আধিপত্যেরও বিরুদ্ধে— এশিয়ার বর্তমান বিদ্রোহ মূলত এই সাংস্কৃতিক বিদ্রোহেরই প্রতিফলন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচণ্ডতম অভিযোগ এই যে, ইহা

আলেকজান্দার বা চেঙ্গিস খাঁর মতন আক্রমণের প্রবল ঝঞ্ঝাপ্রবাহ বহন করিয়া আনে নাই বটে, কিন্তু ইহা অক্টোপাসের মতো আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের হৃৎপিণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবন হইতে জাতীয়তাবোধকে উৎসাদিত এবং সমস্ত জাতিকে হীনবীর্য করিবার অবিরাম চেষ্টা (যদিও ব্যর্থ) করিতেছে।

আমি স্যার পেট্রি ফ্লিন্ডার্স-এর মতোই মনে করি যে মানুষ যেমন জন্ম-মৃত্যুচক্র প্ররিক্রমা করে তেমনি প্রতিটি সভ্যতা নির্দিষ্ট জীবনসীমা উত্তীর্ণ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমি তাঁহার সহিত এ-বিষয়েও একমত যে, কোনো কোনো অবস্থায়, আজকাল কোনো-একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা নিঃশেষিত হইবার পরও তাহার পুনরুজ্জীবন সম্ভব। এই পুনর্জন্মের প্রাণ-প্রবাহ— বা 'সঞ্জীবনী প্রবাহ'— বাহিরের কোনো উৎস হইতে আহরিত না হইয়া সেই সভ্যতার অভ্যন্তর হইতেই উৎসারিত। এইভাবে প্রতিটি জন্ম-মৃত্যুচক্র পরিক্রমার পর ভারতীয় সভ্যতার বার বার পুনর্জন্ম ঘটিয়াছে এবং এই কারণেই সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও ভারতবর্ষ চিরনবীন। ব্রিটিশের আগমনের অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ, এই চক্রপরিক্রমার গভীরতম গহ্বরের স্বাক্ষর স্বরূপ। বর্তমান ভারত একটি তরঙ্গশীর্ষে বাহিত হইয়া আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ক্রমাগত বিজয় ও সাফল্যের নূতন নূতন পথে উত্তীর্ণ হইবে।

যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা জীবিত কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের আমি বলিতে চাই : 'আপনাদের চতুষ্পার্শ্বে সৃষ্টির লীলা প্রত্যক্ষ করুন।' কলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবসায় ও শিল্প— জীবনের সর্বক্ষেত্রেই— ভারতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর দাঁড়াইয়া নূতন আদর্শের সন্ধান করিতেছে, নূতন সত্য আবিষ্কারের পথ অতিক্রম করিতেছে এবং নূতন প্রতিষ্ঠানের কাঠামো তৈয়ারির উপযোগী রূপরেখা ও বনিয়াদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টিই প্রাণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে, যাঁহারা প্রাণের অধিকারী, সৃষ্টি তাঁহাদেরই করায়ত্ত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতীতে বার বার যাহা ঘটিয়াছে, বর্তমানেও তাহারই পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ তাহার সামাজিক বিধান পরিবর্তন করিতেছে, নৈতিক মূল্যমানের পুনর্মূল্যায়ন করিতেছে, নূতন আইন রচনা করিতেছে এবং তাহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের জন্য বাহিরের প্রভাব-

সমূহ আত্মস্থ করিতেছে। ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে না আসিলেও, তাহাকে এই চক্র-পরিক্রমার মধ্য দিয়াই যাইতে হইত, তাহার আপন আভ্যন্তরীণ গতি-বেগের তাড়নায় এবং বর্তমান যুগের দাবি পূরণের জন্য। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেন কিংবা অন্য কোনো পশ্চিমী দেশের পক্ষে ভারতের এই নবজাগরণের জন্য কোনো কৃতিত্ব বোধের কারণ নাই।

গণতন্ত্র কি পাশ্চাত্য আদর্শ ?

আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে, যেহেতু গণতন্ত্র একটি পাশ্চাত্য আদর্শ, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক বা সাধারণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্যেরই অনুকরণ করিতেছে মাত্র। লর্ড রোনাল্ডসের মতো কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক এমনও বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্র প্রাচ্যদেশের মানসিকতার উপযোগী নহে এবং এই কারণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতি গণতন্ত্রসম্মত পথে সংঘটিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা ইহা হইতে আর কতদূর গড়াইতে পারে? গণতন্ত্র কোনো প্রকারেই পশ্চিমী আদর্শ নহে; ইহা একটি মানবিক আদর্শ বিশেষ। মানুষ রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া বারবারই এই অপূর্ব প্রতিষ্ঠান, গণতন্ত্রের মুখোমুখি পেঁাছিয়াছে। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল তাঁহার 'হিন্দু রাজ্যরূপ' (Hindu Polity) নামক অপূর্ব গ্রন্থে এই বিষয়টি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন ভারতেই এক সময়ে ৮১টি প্রজাতন্ত্র বর্তমান ছিল। উন্নত ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিশব্দে ভারতীয় ভাষা গোষ্ঠীসমূহ সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখনো ভারতবর্ষের কোনো কোনো স্থানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আসামের খাসিয়াদের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেখানে স্মরণাতীত কাল হইতে সমস্ত জাতির ভোটে রাজা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের গ্রাম এবং নগরের শাসনব্যবস্থায় প্রাচীনকালে গণতান্ত্রিক আদর্শই প্রতিফলিত হইত।

কিছুদিন পূর্বে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী শহরে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির জাদুঘর পরিদর্শনের সময় আমাকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তাম্রপত্র দেখানো

হইয়াছে। ইহাতে খোদাই করিয়া লিখিত আছে : প্রাচীনকালে পৌর-প্রশাসনের ক্ষমতা নগরগোষ্ঠীসহ, আমাদের সময়কার যাঁহারা মেয়ররূপে পরিচিত, পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিতে ন্যস্ত ছিল। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন যে পঞ্চায়েতের ন্যায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দ্বারাই স্মরণাতীত কাল হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে ইহা ভারতীয়দের মনে করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

কেবলমাত্র গণতন্ত্র নহে, আরো নানাপ্রকার উচ্চপর্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শও অতীতে ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল না। কম্যুনিজম বলিতে যাহা বোঝায়, তাহাও কোনো পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান নহে। ইতিপূর্বে আসামের খাসিয়াদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তত্ত্বগতভাবে আজও তাঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তির কোনো প্রতিষ্ঠানগত অস্তিত্ব নাই। সমগ্র জাতি-গোষ্ঠী ইহাদের সমস্ত জমির মালিকরূপে স্বীকৃত হয়। আমার দৃঢ় ধারণা ভারত-বর্ষের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ দৃষ্টান্ত এখনো পাওয়া যাইতে পারে। আর আমাদের প্রাচীন যুগেও ইতিহাসে এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার ধারণা।

বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে মানবজাতি যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সর্বত্রই তাহাদের প্রকৃতি এবং তাহাদের সমাধানের জন্য অবলম্বিত পথও প্রায় অভিন্ন। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিকগণের প্রচারিত মত অনুযায়ী রাষ্ট্রনৈতিক উদ্বর্তন একটি চক্রপথ পরিক্রমা করিয়া থাকে। রাজতন্ত্রের পর অভিজাততন্ত্র বা শীর্ষতন্ত্র এবং তার পর গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। গণতন্ত্র কখনো কখনো রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় পৌঁছাইলে তখনই আবার একতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটে। উপরি-উক্ত সূত্রটিকে সাধারণভাবে গ্রহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহা শুধু গ্রীস বা ইউরোপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রাণবন্ত সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে যুগের পর যুগ আমাদের দেশে সকল রকম রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থান ও পতন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। ব্রিটিশের ভারত-আগমনের কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমাদের দেশে স্বৈরতন্ত্র বা একতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রবল প্রবণতার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে না যে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সংগঠন অজ্ঞাত ছিল, কিংবা ভারতীয় মানসিকতার পক্ষে গণতন্ত্র উপযোগী নয়।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

একাধিক দিক হইতে জাতীয়তাবাদের উপর যে আঘাত আসিতেছে, সে সম্পর্কে আমার দেশবাসীর, বিশেষভাবে আমার তরুণ বন্ধুদের সতর্ক করিয়া দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দিক হইতে জাতীয়তাবাদকে কখনো কখনো সংকীর্ণ, স্বার্থপর এবং জঙ্গী মানসিকতার উৎসরূপে কঠোর সমালোচনা করা হইয়া থাকে। তা ছাড়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রসারের পরিপন্থীরূপেও ইহাকে বলা হইয়া থাকে। এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে ভারতের জাতীয়তাবোধ সংকীর্ণও নয়, স্বার্থপরও নয়, জঙ্গীও নয়। কারণ আমাদের জাতীয়তাবোধের আদর্শ, মানবজাতির পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদ— সত্যম্‌, শিবম্‌ সুন্দরম্‌— যাহা-কিছু সত্য, মঙ্গলময় ও সুন্দর— হইতে উৎসারিত। আমাদের জাতীয়তাবোধ আমাদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সততা পৌরুষ, এবং সেবা ও ত্যাগের মনোভাব সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। উপরন্তু, এই জাতীয়তাবোধ আমাদের মধ্যে বহু শতাব্দী যাবৎ সুপ্ত সৃজনীশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছে এবং তাহারই ফলে আমরা ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মুক্তি-স্পৃহার জাদুস্পর্শ ছাড়া আমাদের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কী হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

আর-একটি যুক্তিরও অবতারণা করিতে চাই। মানবিক শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্যবন্ধন নিঃসন্দেহে রহিলেও, ইহাও অনস্বীকার্য যে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ধাঁচ রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া স্থূল স্বাজাত্যের আড়ালে শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রসার সম্ভব নহে। আমি এ-কথাই বলিতে চাই যে এই-সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের বিভিন্ন খাতে উন্নতি-সাধনের মধ্য দিয়াই মানবসভ্যতার সমৃদ্ধি সম্ভব হইবে। আমাদের ঐক্য-বিধান করিতে হইবে, কিন্তু বাস্তব ঐক্য-বিধান বিবিধের মধ্য দিয়াই সম্ভব। আমার মনে হয়, জাতীয়তাবাদ শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাকুক, ইহা শক্তিশালী উৎসাহবর্ধকের কাজ করিয়া থাকে। উপরন্তু, ভারতবর্ষকে একমাত্র বৈদেশিক আদর্শ ও পদ্ধতি হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই, স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের আদর্শের আলোকে ভারতের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রসার তাহার বিশিষ্ট ধারায় আশা করিতে পারিব।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন ও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট মতবাদীদের পক্ষ হইতেও জাতীয়তাবাদ আক্রান্ত হইতেছে। এই আক্রমণ কেবলমাত্র অবিবেচনাপ্রসূত নহে, ইহা অজ্ঞাতসারে বিদেশী শাসকদের স্বার্থসাধনও করিয়া থাকে। অতি সাধারণ লোকের নিকটও বোধগম্য হইবে যে নূতন ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের পূর্বে— তাহা সমাজবাদী কিংবা অন্য যে-ধরনের পুনর্গঠনই হউক-না কেন— আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জন করিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত ভারত ব্রিটেনের পদানত হইয়া থাকিবে, আমরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিব। সুতরাং, যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনের জন্য শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদীদের নহে, জাতীয়তাবাদ-বিরোধী-কম্যুনিস্টদেরও, তৎপর হইবার অনিবার্য দায়িত্ব রহিয়াছে। রাজনৈতিক মুক্তি সাধিত হইবার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে। অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্টদেরও তাহাই মত বলিয়া আমি অবগত আছি। বর্তমানে খোলাখুলি ভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রচার ও তাহাকে বাস্তবে রূপ দিবার উদ্যোগ করিয়া আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টিকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া আমি বিবেচনা করি। কার্ল মার্ক্স এবং বাকুনিনের মতবাদ বদহজম হইলে কী অবস্থা দাঁড়ায় তাহা আমরা শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত এক শ্রেণীর ভারতীয়দের (অথবা তাহাদের কম্যুনিস্ট মতাবলম্বীও বলা যাইতে পারে) প্রত্যক্ষ করিলে দেখিতে পাইব। তাহারা আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়া খোলাখুলিভাবে বিলাতী অথবা বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারের জন্য ওকালতি করিয়া থাকেন।

ভারতে শ্রমিক আন্দেলনের গুরুত্ব খর্ব হইতে পারে, আশা করি এমন কোনো কথা আমি বলি নাই। আমার উদ্দেশ্য, শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয়তা-বাদের মধ্যে সকল-প্রকার ভুল ধারণা দূর করিয়া সংগঠিত শ্রমিক ও জাতীয়তা-বাদী শক্তির সংহতি সাধন। এই সম্পর্কে সাম্প্রতিককালের আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

জাতীয়তাবাদের সহিত আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনো বিরোধ নাই। আসলে আন্তর্জাতিকতাবাদের পূর্বশর্তই জাতীয়তাবাদ। আমি অন্যান্যদের মতোই সমানভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু সেইসঙ্গে দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি যে জাতীয়তাবাদের সিংহদ্বার দিয়াই আমাদের

আন্তর্জাতিকতাবাদে প্রবেশ করিতে হইবে। সাংস্কৃতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভবের পূর্বে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বা পৃথক জাতিসমূহের উদ্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। আন্তর্জাতিকতাবাদের কাঠামো একমাত্র ফেডারেশনের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা সম্ভব এবং এ-বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হইব যে ফেডারেশনে বিবিধের মধ্যে ঐক্য মূর্ত হইয়া ওঠে। আন্তর্জাতিকতাবাদ বলিতে আমি বুঝি একদিকে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহের ফেডারেশন, অন্য দিকে জাতিগোষ্ঠীসমূহের ফেডারেশন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতিবিধান এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আমরা ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিকতাবাদের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি। এই সম্পর্কে আমি আরো বলিতে চাই যে ভারতবর্ষ আমার দৃষ্টিতে বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাহার মধ্য দিয়া বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক সমন্বয় এবং স্বয়ং-শাসিত রাজ্যের ফেডারেশন বাস্তবে রূপ নিলে তাহা অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণীয় হইবে।

শ্রমিক ও জাতীয়তাবাদ

আমি পূর্বেই জাতীয়তাবাদ এবং শ্রমিক শক্তির যৌথ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলিয়াছি (আমি এখানে কৃষকদিগকেও শ্রমিকদের পর্যায়ভুক্ত করিয়া শ্রমিক শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়াছি)। আমরা কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া একাধিকবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, কার্যত এই বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই। দুইটি কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য শারীরিক শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায় এবং চারিত্র্যশক্তিতে যোগ্য এইরূপ যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী আমরা তৈয়ারি করিতে পারি নাই। উপরন্তু যাহারা শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত হইয়াছেন, সাধারণভাবে কংগ্রেসসেবীগণ তাহাদিগকে উপেক্ষার দৃষ্টি দিয়া দেখেন, এই ধরনের অভিযোগের সংগত কারণ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের কর্মসূচীতে সকল সময় এমন বিষয়গুলি স্থান পায় না, যাহার রূপায়ণে অনিবার্যভাবে শ্রমিক-কল্যাণও সাধিত হইবে। পৃথিবীর সকল দেশেই এমন লোকের সংখ্যা খুবই সামান্য যাহারা নিছক স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকামী। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই

তাহাদের পার্থিব জীবনের সকল প্রকার দুঃখমোচনের জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিঃসন্দেহ যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পরই তাহার অর্থনৈতিক বন্ধনমোচন সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিব। সেই কারণেই আমি বিশ্বাস করি যাঁহারা ভারতের অর্থনৈতিক বন্ধনমোচনের জন্য উৎসাহী তাঁহাদের সকলেরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে দলে দলে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃংখলমুক্ত করা অবশ্যকর্তব্য।

খাদি

কংগ্রেসের গত কয়েক বছরের কর্মসূচী পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে একমাত্র খাদির কর্মসূচীই আমাদের জনসাধারণের খাদ্য সংস্থানের কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছে। আনন্দের সহিত আমি ঘোষণা করিতেছি যে খাদি সারা ভারতবর্ষে হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষের অন্নসমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে। প্রচুর অর্থবল এবং সাংগঠনিক লোকবল দ্বারা খাদির প্রভূত প্রসারের সুযোগ রহিয়াছে। বুভুক্ষার প্রান্তসীমায় যে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভারতবাসী জীবন যাপন করিতেছেন, খাদি তাঁহাদের অন্নসংস্থানের সুযোগ করিয়া দিতে পারিলেও খাদির আবেদন সর্বজনীন হইতে পারে না। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হইলেই, তাহাদের চরকা পরিত্যক্ত হয়। আরো দেখা গিয়াছে ধান ও পাট চাষ করিয়া কৃষকদের কিছু বেশি উপার্জন হইলে, তাহারা তুলা চাষে অসম্মত হয়। একই প্রদেশে সর্বত্র— একই রকম অবস্থা বজায় রহিলেও অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলে খাদি বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে যতক্ষণ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা নির্দিষ্ট স্তরের নিম্নসীমায় থাকে তাহারা স্বচ্ছন্দ চিত্তে চরকা কাটে। কিন্তু সেই স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহারা কৃষি অথবা শিল্পে সচ্ছলতর কর্মসংস্থানের সন্ধান করে।

যুক্তপ্রদেশের কিষাণ আন্দোলনের কিংবা বাংলার পাট-চাষ সমস্যার, অথবা গুজরাতে অন্যায়ভাবে কর ধার্যের অথবা পীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে কর-বন্ধ অভিযান ছাড়া কংগ্রেস কর্মীগণ কদাচিৎ জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে আবেদন পেঁছাইতে পারিয়াছেন। মানব-প্রকৃতি স্বীকার করিয়া লইয়া, যতদিন না পর্যন্ত জনসাধারণের অর্থনৈতিক

স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইব, আমরা কি করিয়া আশা করিব যে তাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিবেন?

জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে কংগ্রেসের আরো সচেতন হওয়া অনিবার্য মনে করি কেন তাহার আর-একটি কারণ রহিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্যাপক ও তীব্র প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে জনচেতনা জাগ্রত হইয়াছে, সম্ভবত, তাহা আর রোধ করা সম্ভব হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই জনচেতনা কোন্ পথে প্রবাহিত হওয়া কর্তব্য। আমার মনে হয় কংগ্রেস যদি জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করে তাহা হইলে গোষ্ঠীগত জাতীয়তা-বিরোধী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিবে এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। আমরা দাসত্বের শৃঙ্খলে সহযাত্রী থাকা অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে দারুণ দুর্যোগ ডাকিয়া আনিয়া আমাদের সাধারণ শত্রুর হর্ষোৎপাদন করিব। আমি গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছি বর্তমানে কোনো কোনো ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন-কারীদের মধ্যে কংগ্রেসকে খর্ব করিয়া দেখিবার এবং কংগ্রেসের কর্মসূচীর নিন্দার প্রবণতা রহিয়াছে। এই বিরোধের অবসান চাই। সংহত শ্রমিকশক্তি ও কংগ্রেসের যৌথ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসারে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ততর করিতে হইবে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমগ্র দেশে একই কর্ম-সূচীর আবেদনের মধ্য দিয়া তাহাদের আকর্ষণ করা যাইবে কিনা, সে-সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় রহিয়াছে। কারণ এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। একই কর্মসূচী নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও প্রতিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিজস্ব কর্মসূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কর্মসূচীর প্রকৃতি প্রতিটি প্রদেশের বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

বন্ধুগণ, আমি যদি আপনাদের ক্ষণিকের জন্য বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতি হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া সম্মুখে প্রসারিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে বলি তাহা হইলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমরা কিসের পিছনে ছুটিয়াছি, তাহা বুঝিবার জন্য আত্মানুসন্ধান বাঞ্ছনীয়,

যাহাতে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা সেই আদর্শের আলোক-সম্পাতে বর্ধিত হইতে পারি এবং তদনুযায়ী আমাদের কর্মপন্থাকে রূপায়িত করিতে পারি।

আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমি চাই স্বাধীন ফেডারাল রিপাবলিক।— এটাই আমার সম্মুখে প্রসারিত চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের দিনে যেমন ছিল, আমি চাই ভারতবর্ষ সেই দিনের মতো নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া নিজের জাতীয়-চেতনা অনুযায়ী বর্ধিত হউক। আমি চাই ভারতবর্ষ সকল রকম শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া বিশ্বের সকল স্বাধীন জাতির মধ্যে, মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার যোগ্য হউক। আমি চাই ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করিয়া সেই আনন্দ হইতে নিজের এবং পৃথিবীর জন্য মহৎ সৃষ্টির উদ্যোগ করুক। আমি চাই ভারতবর্ষ নিজ পতাকার, নিজ নৌবাহিনীর, নিজ সামরিক বাহিনীর এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশের রাজধানীতে নিজ রাষ্ট্রদূত রাখিবার অধিকারী হউক। স্বাধীনতা আমার নিকট এক অন্তিম লক্ষ্য, এক সীমাহীন অমূল্য সম্পদ। মানুষের ফুসফুসের যেমন অক্সিজেন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য মানুষের আত্মার স্বাধীনতা। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন : 'স্বাধীনতা আত্মার সংগীত'। স্বাধীনতাই অমৃত— মৃত্যুর এপারে প্রকৃত অমৃত-সুধা।

ভারতবর্ষকে তার ভবিতব্য পূর্ণ করিতেই হইবে, যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিংবা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কেন থাকিব ? ভারতবর্ষ প্রচুর মানবীয় ও পার্থিব সম্পদের অধিকারী। বিদেশীরা তাহাকে শিশু প্রতিপন্ন করিতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিলেও ভারতবর্ষ তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়াছে এবং কেবল নিজের দায়িত্বই নিজে বহন করিতে সক্ষম নহে, একটি স্বাধীন সত্তার মতো কর্ম-তৎপরও হইতে পারে। ভারতবর্ষ— কানাডা, অস্ট্রেলিয়া অথবা দক্ষিণ-আফ্রিকা নহে। ভারতীয়রা একটি প্রাচ্য জাতি— একটি বর্ণ-সম্পন্ন জাতি— এবং ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এমন কোনো স্বাজাত্য নাই যাহার দ্বারা আমাদের মনে হইতে পারে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই ভারতবর্ষের পক্ষে বাঞ্ছিত পরিণতি। বরং, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতবর্ষের ক্ষতি হইতেছে। দীর্ঘদিন ব্রিটিশের অধীনে থাকার ফলে ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পর্কবোধে ভারতীয়দের পক্ষে হীনমন্যতাবোধ

কাটাইয়া ওঠা দুরূহ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যতদিন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ হইয়া থাকিব ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ শোষণ প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইতে পারে।

ব্রিটেনের সাহায্য ছাড়া নিজের প্রতিরক্ষা বিধানে ভারতবর্ষের অক্ষমতার প্রচলিত যুক্তি একেবারে শিশুসুলভ। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপেক্ষা ভারতীয় সেনাবাহিনীই বহুলাংশে বহন করিতেছে। আমাদের সীমান্তের বাহিরে তিব্বত, চীন, মেসোপোটামিয়া, পারস্য, ইজিপ্ট এবং ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংলন্ডের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ করিতে পারে তাহা হইলে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সামর্থ্য তাহার নিশ্চয়ই রহিয়াছে। আর-একবার ভারতবর্ষ নিজেকে বন্ধন-মুক্ত করিতে পারিলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবে— যেমন চীনকে রক্ষা করিয়াছে। আর যদি লীগ্ অফ নেশন্স (জাতি সংঘ) কিছুমাত্র শক্তির আধার হইয়া জাগ্রত প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে, পররাজ্য আক্রমণ ও দখল অতীতের বিষয় হইয়া পড়িবে।

স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টাকালে তাহার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অনুধাবন করিতে হইবে। আত্মার একাংশকে বন্ধনমুক্ত করিয়া অপর অংশকে শৃঙ্খলিত রাখা চলে না। ঘরে আলোকবর্তিকা প্রবেশ করাইলে সেই ঘরের কিছু অংশ অন্ধকার থাকিবে, ইহা আশা করা যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পথরোধ করা যায় না। বন্ধুগণ, তা হয় না, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রী এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল— এরূপ অদ্ভুত মিশ্রণ হইতে পারে না। রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাগুলি জনসাধারণের সামাজিক জীবন হইতে উৎসারিত এবং তাহাদের ভাবনা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি সত্যই আমরা ভারতবর্ষকে মহান করিয়া তুলিতে চাই, গণতান্ত্রিক সমাজের ভিতের উপর আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে। জন্ম, জাতি ও মতবাদের ভিত্তিতে অর্জিত বিশেষ মর্যাদাগুলিকে বিদায় দিতে হইবে এবং জাতি মত ও ধর্মনির্বিশেষে সমান সুযোগের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীদের সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে জনজীবনে অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। আমি ভারতবর্ষে ইউরোপের এবং আমেরিকার নারী-আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি

করিতে চাহি না। বব্‌ছাট চুল এবং খাটো স্কার্টের প্রতি আমি অনুরক্ত নই। অপর পক্ষে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের নারী-আন্দোলন আমাদের জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজস্ব বলিষ্ঠ ধারায় প্রবাহিত হইবে। কিন্তু আমি এ কথা বলিতে চাই যে আমাদের সমাজের কোনো কোনো অংশে নারীদের বর্তমান অবস্থার, আমাদের শাস্ত্রে কিংবা অতীত ইতিহাসে কোনোপ্রকার অনুমোদন নাই এবং ইহা প্রভূত উন্নতির অপেক্ষা রাখে।

নূতন ভারতবর্ষের আর্থনীতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে আমি বর্তমানে একটি নীতি-বিবৃতির ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নহি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি গণতন্ত্র, কম্যুনিজম ইত্যাদি রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বসমূহ পশ্চিমী ভাবধারাপ্রসূত নহে, যদিও কখনো কখনো এই প্রকার ধারণার প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষ যদি সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনে অগ্রসর হয়, সে ক্ষেত্রে স্বীয় প্রাচীন ঐতিহ্য হইতে সে বিচ্যুত হইবে না। কিন্তু ঐ দিকে অগ্রসর হইবার পূর্বে আমাদের অতীতের দিকে আর-একবার মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আমাদের ইতিহাস-সচেতনতা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে এবং এইভাবে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে উদ্‌ভাসিত করিবার আলোকবর্তিকা আবিষ্কার করিতে হইবে। বর্তমানে পশ্চিমে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে তাহার অন্তিম সিদ্ধান্তের জন্যও আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। এই প্রাচীন ভূখণ্ডে কোনো বিদেশী মার্কা কম্যুনিস্ট মতবাদকে অভিনন্দন জানাইবার পূর্বে কার্ল মার্ক্সের অত্যুৎসাহী অনুসারীদের মনে করাইয়া দিতে হইবে যে, যে-ধরনের কম্যুনিজম্‌ রাশিয়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা কার্ল মার্ক্স ও জার্মান সোশ্যালিস্টরা এ-সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে পৃথক। যদি রুশীয়গণ কার্ল মার্ক্সকে অনুসরণ করিত, রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিত। কারণ এই মহান জার্মান চিন্তানায়কের মতে সোশ্যালিজম-এর পূর্বে ক্যাপিটালিজম্‌ (পুঁজিবাদ) ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন (শিল্পায়ন) প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে না। উপরন্তু ভারতবর্ষের মূল সমস্যা— ভূমি সমস্যা। সার্থক সমাজবাদী রাষ্ট্রের একমাত্র দৃষ্টান্ত রাশিয়াতে আমরা দেখিতে পাই ভূমি নামেমাত্র জাতীয়করণ হইয়াছে। কার্যত কৃষিজীবীদের মালিকানা বহাল রহিয়াছে। সুতরাং আমি মনে করি কী প্রকার আর্থনীতিক

পুনর্গঠন ভারতবর্ষের উপযোগী হইবে, এবং ভারতবর্ষের ভবিতব্য পূরণের পথে সহায়ক হইবে, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদের আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক ক্ষত নিরাময়ের জন্য জোড়াতালির নিন্দা না করিয়াও আমাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসায় গভীরতর প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার উপর আমি জোর দিতেছি। ভারতবর্ষ মহাসমুদ্রের মতো মহাকালের তীর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং সেই প্রবাহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারা সঞ্চারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাহার পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে বর্তমান পর্যন্ত আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার সহিত একাত্ম হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের ঐতিহাসিক চেতনা ফিরিয়া পাইব, বুঝিতে পারিব যে একটি বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের ভার বিধাতা আমাদের উপর দিয়াছেন, যে সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যসাধন, স্বার্থ ও মতের মিলন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন। এই আপাত-বিশৃঙ্খলা হইতে আমাদের সামগ্রিক বিশ্ব-শৃঙ্খলায় পৌঁছাইতে হইবে— নানা বিহ্বলময় অনৈক্যের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের ভিত্তিভূমির সন্ধান করিতে হইবে। এই দায়িত্বের গুরুভার যে-কোনো জাতিকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে কিন্তু আমাদের মতো পুরাতন এবং মৃত্যুহীন জাতির শঙ্কিত বা নিরুৎসাহিত হইবার কোনো কারণ নাই।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে অন্যান্য সকল ধর্মের ন্যায় ইসলামের স্থানও ভারতে রহিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠীরই পরস্পরের ঐতিহ্য, আদর্শ ও ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন কারণ পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যের পথ সহজ করিয়া তুলিবে। আমি মনে করি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যের মূলে রহিয়াছে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার সহযোগ। বর্তমানে ভারতবর্ষে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে।

এই সাংস্কৃতিক সহযোগ স্থাপন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ধর্মান্ধতার গোঁড়ামি

সাংস্কৃতিক সহযোগের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যতীত কোনো উৎকৃষ্টতর প্রতিকার নাই। ধর্ম-নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আর-এক দিক দিয়া উপযোগিতা রহিয়াছে —ইহা আর্থনীতিক চেতনা জাগ্রত করিতে সহায়তা করে। আর্থনীতিক চেতনার প্রভাব গোঁড়ামির মৃত্যু ঘোষণা করে। একটি মুসলমান কৃষকের সহিত মুসলমান জমিদারের যে মিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি মিল রহিয়াছে একটি হিন্দু কৃষকের সহিত একটি মুসলমান কৃষকের। জনসাধারণের আর্থনীতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহাদের শিখাইতে হইবে এবং একবার তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহারা কখনো সাম্প্রদায়িক বিরোধে দাবার ছক হইতে সম্মত হইবে না। সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং আর্থনীতিক দিক হইতে কাজ করিলে আমরা ক্রমশ গোঁড়ামিকে কাটাইয়া উঠিয়া এই দেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের গোড়া পত্তন করিতে পারিব।

যুব-আন্দোলন

বর্তমানে দেশের যুবসাধারণের জাগরণ একটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক লক্ষণ। এই আন্দোলন দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে, এবং-আমি যতদূর জানি এই আন্দোলন কেবলমাত্র তরুণদেরই আকর্ষণ করে নাই, তরুণীরাও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্তমানকালের যুবকেরা আত্মসচেতন হইয়াছে, তাঁহারা আদর্শের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া নিজেদের ভবিতব্য পূরণে অন্তরাত্মার আহ্বান অনুসরণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই আন্দোলন জাতীয় আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি স্বরূপ, এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির উপর জাতির কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, এই নবলব্ধ আত্মিক জাগরণকে দাবাইয়া দিতে সচেষ্ট না হইয়া ইহাকে সমর্থন ও পরিচালনা করা।

মানুষের মধ্যে যদি দেবত্বের বিকাশ দেখিতে চাই, তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি আজও সুপ্ত রহিয়াছে তাহাকে জাগ্রত করিতে চাই, তাহা হইলে তাহার মধ্যে স্বাধীনতালাভের আকুল আবেদন সঞ্চারিত করিতে হইবে। স্বাধীনতালাভের আকুল আকাঙ্ক্ষাই সকল প্রকার প্রেরণার উৎসমূল, সকল সৃজনীপ্রতিভার গোপন নির্ঝর। স্বাধীনতা-লাভের জন্য উদ্‌বুদ্ধ মানুষ —বসন্তসমাগমে প্রকৃতি যেরূপ অভিনব শোভা ধারণ করে— ঠিক তেমনই

ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অতঃপর তাহার ব্যক্তিত্বের অপরূপ বিকাশ এবং ক্ষমতার বিচ্ছুরণ দেখিয়া আমরা হতবাক্ হইয়া যাই।

বন্ধুগণ, এই যুবজাগরণে এবং যুব-আন্দোলনের সংঘবদ্ধ রূপদানে আপনাদের সহায়তার জন্য আবেদন করিতেছি। আত্মসচেতন যুবকেরা কেবলমাত্র কাজ করিয়া যাইবে না, তাহারা কল্পনার রাজ্যেও বিচরণ করিবে, তাহারা কেবল ধ্বংস করিবে না, নূতনভাবে গঠনের দায়িত্বও বহন করিবে।

যেখানে আপনারা হয়তো বিফল হইবেন, তরুণেরা সেখানে জয়লাভ করিবে ;— তাহারা আপনাদের জন্য নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবে— অতীতের সকল ব্যর্থতা, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া এক স্বাধীন ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করিবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, ভারতবর্ষকে যদি সর্বকালের জন্য সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির কলুষমুক্ত করিতে হয়, তবে আমাদের তরুণদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

নারী-আন্দোলন

আমাদের আন্দোলনের আর-একটি দিক আছে, যাহা এতকাল আমাদের দেশে অবহেলিত হইয়াছে— নারী-আন্দোলন এইরূপ একটি দিক। জাতির একার্ধের সক্রিয় সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যতীত অপরার্ধের স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। সকল দেশেই, এমন-কি ইংলন্ডে শ্রমিক দলের মধ্যেও— নারী-সংগঠনের অমূল্য অবদান রহিয়াছে। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের মধ্যে নানাপ্রকার অ-রাজনৈতিক সংগঠন রহিয়াছে। আমার মনে হয় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নারীদের লইয়া একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার অবকাশ আছে। মহিলা-পরিচালিত সংগঠনগুলির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নারীসমাজে রাজনৈতিক প্রচার এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজে সহায়তাদান। প্রসঙ্গত, এই সংগঠনগুলি নারীদের সামাজিক মানসিক এবং নৈতিক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় হইবে। এইপ্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ না করিলে বয়কট ও স্বদেশী কর্মসূচীর অন্তিম সাফল্যে পেঁছানো সম্ভব হইবে না। আমাদের মাতা ও ভগ্নীগণের মধ্যে জাগ্রত জাতীয়-চেতনা, জাতীয় আন্দোলনকেই কেবল প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিবে না, জাতীয় উন্নয়নের পথে অন্তরায়গুলিকেও অপ্রত্যক্ষভাবে দূর করিয়া দিবে।

আমরা কি স্বরাজলাভের যোগ্য

আমাদের মহানুভব শাসকেরা এবং স্বয়ং-নিয়োজিত পরামর্শদাতারা স্বরাজ-লাভে আমাদের অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রতিনিয়ত হুঁশিয়ারী দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, স্বাধীন হইবার পূর্বে আমাদের আরো শিক্ষালাভ করিতে হইবে, অপর অনেকের ধারণা রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হইবার পর সামাজিক সংস্কার সাধিত হইবে। আবার অনেকে বলেন, শিল্পোন্নয়ন না হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। এই-সকল যুক্তি ভ্রান্ত। বাস্তবিক পক্ষে অধিকতর সত্য যুক্তি এই যে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত— অর্থাৎ, নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পাইলে— আমরা বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের, সমাজ-সংস্কারের কিংবা শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিব না। দেশবাসীর শিক্ষার দাবি করিলে— যেমন গোখলে বহুদিন পূর্বে করিয়াছিলেন— গভর্নমেন্ট অর্থাভাবের অজুহাত তুলিয়া থাকেন। দেশবাসীর উন্নয়নকল্পে সমাজ-সংস্কার সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে আতলান্তিক-এর এই তীরবর্তী মিস মেয়োর মাসতুতো-ভ্রাতাগণ আপনাদের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়া সমাজের গোঁড়া সনাতনপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং শিল্পগত উন্নয়নের জন্য যে-সময় প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন, গভীর ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সহিত তখন দেখিবেন যে আপনাদের ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, রেলওয়ে এবং স্টোর্স-ডিপার্টমেন্ট আপনাদের জাতীয় উদ্যোগে সহায়তা করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহে। আপনারা মাদকদ্রব্য বর্জনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং কাউন্সিলে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সরকারী ঔদাসীন্য অথবা বিরোধিতার পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইবেন।

পরহিতব্রতীরূপে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকায় আপনারা ত্রাণকার্যে ব্রতী হইয়া সেই অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী বন্ধ করিতে চাহিলে দেখিবেন তাহা অসম্ভব, অথচ খাদ্যাভাবে আপনাদের অগণিত দেশবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

প্রতিকারের একমাত্র উপায়

আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি আমাদের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দশা প্রতি-কারের একমাত্র উপায় স্বরাজ। স্বরাজলাভের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি

মুক্তির জন্য অদম্য ইচ্ছা। স্বাধীনতা অর্জনের এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার অভাব আমাদের নাই, একমাত্র অভাব এই অদম্য জাতীয় ইচ্ছার। চীন, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া রুমানিয়া ও রাশিয়ার সহিত ভারতের তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে আমরা কেবলমাত্র স্বাধীন হইবার তীব্র ইচ্ছার জন্য নৈতিক উদ্দীপনা ছাড়া কোনো অংশেই তাহাদের তুলনায় হীন নহি, পরন্তু অন্য বিষয়ে আমরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে মুহূর্তে এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইবে, দাসত্বের শৃংখল সেই মুহূর্তেই খসিয়া পড়িবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন এখনো জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। ইংরেজদের তৈরি পণ্য ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইবার ফলে বহু সংখ্যক ইংরেজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। ভারতবর্ষে আমাদের সহযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া লইলে, ব্রিটিশ পণ্য ক্রয় বন্ধ করিলে ব্যুরোক্রাসির আশু পতন অনিবার্য হইয়া পড়িবে। জাতি জাগ্রত হইলে জাতীয় স্তরে অসহযোগ ও বয়কট সম্ভব হইয়া উঠিবে।

কর্মপদ্ধতি

জাতীয় ইচ্ছাশক্তি কিভাবে অতি অল্পসময়ের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলা যায়, তাহাই আমাদের নিকট একমাত্র সমস্যা, এবং এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সকল কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ১৯২১ সাল হইতে কংগ্রেস যে দ্বৈতনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহা একদিকে ধ্বংসের অন্য দিকে গঠনের, একদিকে বিরোধিতার অন্য দিকে সংহতির। দেশব্যাপী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়া এবং সেগুলি পরিচালনার জন্য এক কর্মচারীচক্র নিয়োগ করিয়া আমলাতন্ত্র নিজেদের শক্ত ঘাঁটি তৈয়ারি করিয়াছে। এই সংগঠনগুলিই আমলাতান্ত্রিক শক্তির উৎস এবং ইহাদের সাহায্যেই আমলাতন্ত্র জাতির অন্তরে বজ্রমুষ্টি স্থাপন করিয়াছে। ক্ষমতার এই দুর্গগুলিকে আমাদের আক্রমণ করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সমান্তরাল সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের কংগ্রেস-দপ্তরগুলিই এই সমান্তরাল সংগঠন। এই কংগ্রেস কমিটিগুলির সহায়তায় যে-পরিমাণে আমাদের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে, সেই পরিমাণে আমরা আমলাতন্ত্রের শক্তি-কেন্দ্রগুলি দখল করিতে পারিব। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা

জানি জেলাগুলিতে যেখানে কংগ্রেস কমিটিসমূহ সুসংবদ্ধ রহিয়াছে, সেখানে স্থানীয় সংস্থাগুলি দখলে আনা অনায়াসসাধ্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের দুর্গবিশেষ, যেখানে আমাদের দৃঢ়মূল ভিত্তিপত্তন করিয়া প্রতিদিন সেই আশ্রয় হইতে বাহিরে আসিয়া আমলাতান্ত্রিক দুর্গগুলিকে আক্রমণ করিতে হইবে। কংগ্রেস কমিটিগুলিই আমাদের সেনাবাহিনী। যত কৌশলের সহিতই যুদ্ধ-অভিযানের পরিকল্পনা রচিত হোক-না কেন, শক্তিশালী সুদক্ষ এবং নিয়মানুবর্তী সেনাবাহিনী আমাদের কর্তৃত্বাধীন থাকিবার উপর তাহার সাফল্য নির্ভর করে।

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে নীতি ও কর্মসূচী আলোচনাকালে আমাদের মধ্যে একটা চিন্তার বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা ভুলিয়া যাই যে প্রতিটি অভিযানের পশ্চাতে একটি সাধারণ পরিকল্পনা রহিয়াছে, যাহা আমাদের সকল কর্মের ভিত্তিস্বরূপ এবং আমাদের সাফল্যের সকল সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করিতে না চাহিলে, যাহাকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। অভিযানের এই পরিকল্পনা উপরি-উক্ত দ্বৈতনীতিরই প্রকাশ, যাহা অভিব্যক্ত হইবে জন-সাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরী-করণ, মাদকদ্রব্য বিরোধী প্রচার, খাদি প্রচার, সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন এবং ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মূলক সংস্থাগুলি অধিকার লাভে। পূর্বোক্ত প্রণালীতে আমলাতন্ত্রের শক্তিকেন্দ্রগুলি দখল করা সহজ হইবে, এবং দ্বিতীয় পন্থার অবলম্বন দেশের মধ্যে আমাদের সকলপ্রকার কর্মের সহায়ক হইবে এবং শক্তিবৃদ্ধি করিবে —সেই কাজ গঠনমূলকই হউক অথবা বিরোধী-মনোভাবাপন্ন হউক।

যদি আমরা কংগ্রেস কমিটি সংগঠনকে কিংবা অভিযানের সাধারণ পরি-কল্পনাকে অবহেলা করি, আমরা দেশে অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক মন্দা ডাকিয়া আনিব। একবার রাজনৈতিক মন্দা আমাদের ঘিরিয়া ফেলিলে নানা অগ্রগামী কর্মসূচী গ্রহণেও কোনো ফল হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিলাতী পণ্য বয়কটের মতো কর্মসূচীও সাধারণ অভিযানের মধ্যেও ত্বরিত আক্রমণের মতো এবং কর্মতৎপর ও দক্ষ সেনাবাহিনীর উপরই তাহা নির্ভর করে। আমাদের জনসাধারণের মনে প্রতিরোধের ভাব জাগাইয়া রাখিতে পারিলেই জাতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে। প্রতিরোধের মানসিকতা আমাদের জাতীয় নৈতিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া দেশের সর্বত্র

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবস্থাপক সভার কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের স্মরণ আছে, ১৯২২-এ গয়া কংগ্রেসের পর যখন বহুসংখ্যক কংগ্রেসসেবীর মধ্যে অন্য সকল প্রকার কাজ বর্জন করিয়া একমাত্র গঠনমূলক কাজে মনঃসংযোগের প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, দেশবন্ধু দাশ স্বরাজ পার্টির ইস্তাহারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মানসিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য। দেশবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন প্রতিরোধের পরিবেশ ব্যতিরেকে গঠনমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ কিংবা অন্য কোনো দিকে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। এই মূলসূত্রটি আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। ‘অসহযোগ নিষ্ফল’, ‘বিরোধীরা ব্যর্থ’, ‘প্রতিরোধ অর্থহীন’— এই ধরনের উক্তি সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। আমাদের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক উপাদান এই যে, আমরা সম্মুখপানে তাকাইয়া দেখি না; ব্যর্থতা অতি সহজেই আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়, ইংরেজদের মতো দুস্তর অনমনীয়তা আমাদের নাই এবং তাহারা যেমন পিছু হটিয়াও সংগ্রাম করিতে সক্ষম, আমরা তাহা পারি না। শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তুচ্ছ ফরাসী সেনাবাহিনী অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার নীতি গ্রহণ করিয়া পরবর্তী বিজয়ের সূচনা করিয়াছিল— তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। সে কারণে আমি বলিয়া থাকি সরকারের বিরোধিতা কখনো বৃথা যায় না। এই প্রতিরোধের মানসিকতাই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের জনক। ইতিহাসে একমাত্র বিরোধের মধ্য দিয়াই বার বার জাতীয়তাবাদী নীতি আত্মবিকাশের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরিবর্তনীয়, অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধের মধ্য দিয়া আমরা নৈতিক বল সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইব, যাহার অভাব আমাদের অধঃপতনের ও পরাধীনতার অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক কারণ। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি কী করিয়া একটি মেরুদণ্ডহীন জাতি দীর্ঘকাল সমভাবে সরকারের বিরোধিতা না করিয়া নৈতিক মেরুদণ্ড গঠন করিতে পারে?

উপসংহার

প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করা হয় অন্তিম পর্যায় কী ভাবে উপস্থিত হইবে, আমলাতন্ত্রই বা শেষ পর্যন্ত কীভাবে আমাদের শর্তপূরণে বাধ্য হইবে। আমার

এ-সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। কারণ আগামীদিনের স্বরূপ বিষয়ে আমার একটা পূর্বধারণা রহিয়াছে। আমাদের এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় সাধারণ ধর্মঘট বা ব্রিটিশ পণ্য বয়কটসহ দেশব্যাপী হরতালে পরিণতি পাইবে। শ্রমিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের সহিত মনেপ্রাণে সহযোগিতা করিবে। ধর্মঘট চলাকালীন আমলাতন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকিবে না, সুতরাং কোনোপ্রকার আইন অমান্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কোনো-না কোনো আকারে কর-বন্ধ আন্দোলনও শুরু হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপরিহার্য নহে। এই সংকটকাল উপস্থিত হইলে ইংলন্ডবাসী গড়পড়তা ইংরেজ বুঝিতে পারিবে যে ভারতবর্ষকে যদি রাষ্ট্রীয় অধিকারে অভুক্ত রাখিতে হয়, সে ক্ষেত্রে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে অভুক্ত থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের মুখে আমলাতন্ত্র দেখিবে যে, প্রশাসন পরিচালন অসম্ভব। ১৯২১ সালের মতো জেলগুলি বন্দীতে ভর্তি হইয়া যাইবে এবং আমলাতন্ত্রের শিবিরে সাধারণভাবে নৈতিক বল লুপ্ত হইবে এবং সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যের উপর তাহারা আর নির্ভর করিতে পারিবে না। প্রশাসন বিকল হইয়া যাইবে, সম্ভবত বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যও। আমলাতন্ত্র ভাবিবে দেশে মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু জনসাধারণের দিক হইতে দেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী এবং দৃঢ়সংকল্প হইবে। সেই পরিস্থিতিতে অকারণ হয়রানি হইতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে আমলাতন্ত্র জনসাধারণের দাবির নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

আমি আশাবাদী এবং আমি মনে করি চরমতম দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত কিন্তু সর্বদাই সর্বোত্তম শুভফলের আশা করিব। সুতরাং, আমার মনে হয় আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত লইয়া যাওয়া প্রয়োজন না-ও হইতে পারে। হয়তো বা, গ্রেট ব্রিটেন ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এমনও হইতে পারে যে আয়ারল্যান্ডের সহিত দ্বন্দ্বের শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকারের ঘটনা ইংরেজ রাজনীতিবিদদের মনে এখনো তাজা আছে; র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর, সম্ভব হইলে আমাদের সহায়তায়, প্রয়োজন হইলে আমাদের সহায়তা ছাড়াই'— এখনো ইংরেজদের কানে বাজিতেছে। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ যদি সমবেতভাবে তাহাদের

ন্যূনতম দাবিরূপে একটি সংবিধানের খসড়া লইয়া গ্রেট ব্রিটেনের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইংরেজরা তাহা বিজ্ঞজনোচিত গ্রহণ করিয়া সেই সংবিধানকে বাস্তবে রূপ দিতে সম্মত হইবে। কিন্তু আমি এ কথা পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই যদি কোনো কারণে সর্বদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সফল না হইয়া ওঠে— আমরা যাহা কামনা করি— কংগ্রেসই আমাদের দাবি রচনা করিয়া তাহা আদায় করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিবে।

আশু কর্তব্য : সাইমন কমিশন বয়কট

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাদের আশু কর্তব্য সাইমন কমিশন সাফল্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে বয়কট করা। কমিশন বয়কটের স্বপক্ষে সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে দিনের পর দিন যে-সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি আপনাদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি অসৌজন্যমূলক হইবে। কিন্তু পাছে কেহ ভুল বুঝিয়া বসেন, এজন্য আমি কেবলমাত্র আমাদের আদর্শকে বিবৃত করিব। আমরা, কংগ্রেসসেবীরা, কখনোই ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনের মারাত্মক মুখবন্ধ গ্রহণ করি নাই। ভারত সরকারের ১৯১৯-এর আইন আমাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রতি আমরা কখনো আনুগত্য প্রকাশ করি নাই। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সর্বতোভাবে ইহার সহিত অসহযোগ করিতে সচেষ্ট রহিয়াছি। মানুষের অলংঘনীয় এবং পবিত্র অধিকারের উপর এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপর আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা চাই ভারতবর্ষই প্রয়োজন অনুযায়ী নিজ সংবিধান রচনা করিবে এবং ব্রিটিশদের তাহা হুবহু গ্রহণ করিতে হইবে। যে-সকল দেশ তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে এবং আইরিশ ফ্রি স্টেটসহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসন-অধিকারী ডোমিনিয়নগুলিতে এই পদ্ধতিই প্রচলিত রহিয়াছে।

ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী অজুহাত দেখাইয়াছেন ভারতের সংবিধান নির্ণয়ে একজন নিরপেক্ষ (অথবা আমি কি অজ্ঞ বলিব ?) বিচারকের প্রয়োজন। এই যুক্তি এতই ছেলেমানুষী যে ইহার প্রতিবাদও নিষ্প্রয়োজন। এই যুক্তির অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলে, গ্রেট ব্রিটেনের সকল প্রয়োজনীয় আইনসমূহ বিবেচনা করিবার জন্য তরাই-এর জংগল হইতে সাতজনের একটি দল পাঠাইতে

হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নিয়োজিত কমিটিকে (সাইমন কমিশনের) সমমর্যাদা দেওয়া হইবে কিনা সে-প্রশ্ন আমার নিকট অবান্তর ; এই কমিটির রিপোর্ট ভারত সরকারের নিকট অথবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে সে-প্রশ্নও সমভাবেই অবান্তর। আমরা ওয়েস্টমিনিস্টারের পার্লামেন্টকে (ব্রিটিশ পার্লামেন্ট) আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তারূপে স্বীকার করি না; ভারতীয় সংবিধান রচনায় শেষ কথা বলিবার অধিকার অবিসম্বাদিতরূপে ভারতবর্ষের।

জনমতের শক্তিই আমাদের মতের অনুমোদনের উৎস। সুতরাং, এমনভাবে জনমত গড়িয়া ও সংহত করিয়া তোলা আমাদের কর্তব্য, যাহাতে সমগ্র দেশ তাহার গুরুচাপ বুঝিতে পারে এবং কোনো ভারতীয়ই তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোনো-ভাবে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে সাহসী না হয়।

সংবিধান রচনা

প্রকৃতপক্ষে, এই বয়কটের অপর দিক হইতেছে জাতীয় সংবিধান রচনা। সর্বদলীয় সম্মেলন এই দায়িত্ব হাতে লইয়াছেন এবং সকল ভারত-প্রেমী এই সম্মেলনের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করেন। ভারতসচিব গর্বভরে হঠাৎ সর্বসম্মত সংবিধান রচনা করিতে ভারতবাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন। আমাদের মধ্যে আত্মসম্মানের স্ফুলিঙ্গমাত্রও যদি অবশিষ্ট থাকে, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা উচিত এবং এই সংবিধান রচনা করিয়া সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্তব্য। সাইমন-সপ্তক সেপ্টেম্বরে ফিরিবার পূর্বে সংবিধান রচিত হইলে বয়কটে প্রচুর সহায়তা করিবে। আমরা সরাসরি বলিয়া দিতে পারিব যে তাহাদের জন্য কোনো কাজ আর অবশিষ্ট নাই এবং সকল দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঐ সংবিধানকে সমর্থন করিয়া উহাই তাহাদের নিম্নতম দাবিরূপে গ্রহণ করিতেছে।

সংবিধানের যে খসড়া রচিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করিয়া আপনাদের ক্লান্তি উৎপাদন করিব না। সে-কাজ সংবিধান-রচয়িতাদের ছাড়িয়া দিয়া তিনটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব, তিনটি বিষয় এইরূপ :

১. সংবিধান জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করিবে, আমরা চাই জনসাধারণ কর্তৃক গভর্নমেন্ট, জনসাধারণের দ্বারা গভর্নমেন্ট এবং জনসাধারণের জন্য গভর্নমেন্ট।

২. সংবিধানের মুখবন্ধে একটি অধিকার-ঘোষণা সনদ থাকিবে (Declaration of Rights) যাহা নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণ করিবে। অধিকার-ঘোষণা সনদ ব্যতিরেকে সংবিধান মূল্যহীন। স্বাধীন ভারতে দমনমূলক আইন, অর্ডিন্যান্স কিংবা রেগুলেশন-এর কোনো স্থান থাকিবে না।

৩. যৌথ নির্বাচনমণ্ডলীর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সাময়িক ব্যবস্থা-রূপে একান্ত প্রয়োজন হইলে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু যৌথ-নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য আমাদের চাপ দিতে হইবে। জাতীয়তাবাদ এবং পৃথক-নির্বাচকমণ্ডলী পরস্পর-বিরোধী, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি ভুল এবং অশুভ নীতির উপর জাতিগঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, যত শীঘ্র সম্ভব আমরা তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি আমাদের এবং দেশের পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলকর।

বয়কট ও স্বদেশী

আমাদের জাতীয় দাবি কার্যকর করিতে হইলে আমাদের যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ব্রিটিশদের মধুমাখা যৌক্তিকতার নিকট আবেদনে কোনো ফল হইবে না। আমরা যদিও দুর্বল এবং নিরস্ত্র, বিধাতা তাঁহার করুণাবশত যে অস্ত্র আমাদের দিয়াছেন, তাহা প্রয়োগ করিয়া প্রভূতফল লাভ করিতে পারি। এই অস্ত্র আর কিছুই নয়— অর্থনৈতিক বয়কট বা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট। আয়ারল্যান্ড এবং চীনে এই নীতি বিরাট সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রায় বিশ বছর পূর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এবং আংশিকভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই অস্ত্রপ্রয়োগের ফল পাওয়া গিয়াছে। কাহাকেও আঘাত করিবার জন্য এই অস্ত্রপ্রয়োগ করিব না, একমাত্র আমাদের জাতীয় দাবি পূরণে এবং জাতীয় মুক্তি সাধনে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিব। বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষবশত আমরা উদ্দীপিত হই না। জন-

সাধারণের প্রতি, জাতীয় শিল্পের প্রতি এবং জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি প্রীতির আকর্ষণই আমাদের উদ্দীপিত করে।

আমি জানি কোনো কোনো মহলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব রহিয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিবার ফলেই এই বিরুদ্ধমতের সৃষ্টি। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র কামনা দেশসেবা। কিন্তু সেই লক্ষ্য উদ্‌যাপনে যদি অন্য কোনো জাতি বিরুদ্ধ-সংঘাতের আওতায় পড়ে, সেইজন্য আমাদের উপর দোষারোপ করা চলে না। আমাদের জাতীয় স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথমোক্তের স্বার্থ-সাধন দ্বিতীয়োক্তকে স্বভাবতই আঘাত করিবে। কিন্তু আমার মনে হয় তাহার প্রতিবিধানের জন্য করণীয় কিছুই নাই। যে-সকল ব্রিটিশ এই দেশে স্থিতস্বার্থ রহিয়াছে, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা অবশ্যই তাহাদের স্বার্থে আঘাত করিবে। কিন্তু স্বরাজলাভের জন্য আমরা উদ্যোগী হইলে কেহই, এমন-কি, ব্রিটিশরাও— আমাদের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষপোষণের অভিযোগ আনিতে পারিবে না।

স্বদেশীদ্রব্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং আমাদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের প্রয়োজন। কখনো কখনো আমাদের প্রশ্ন করা হয় আমরা সকলপ্রকার বিদেশী দ্রব্য বয়কটের কর্মসূচী গ্রহণ করি না কেন। আমাদের জবাব এই যে,ইহা বাস্তবোচিত কর্মপন্থা নহে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টাও নিরর্থক। আমরা বহির্বিশ্ব হইতে ২৩১ কোটি টাকার পণ্য বছরে আমদানী করিয়া থাকি এবং ইহার মধ্যে ১১১ কোটি টাকার পণ্যই যুক্তরাজ্য হইতে আসে— অর্থাৎ আমাদের শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ আমদানী যুক্তরাজ্য হইতে আসিতেছে, যদি বিদেশী পণ্য বর্জন আমাদের লক্ষ্যও হয়, আমাদের বৃহত্তম জোগানদারের বিরুদ্ধেই আমাদের কাজ শুরু করিতে হয়।

১১১ কোটি টাকার ব্রিটিশ পণ্য আমদানীর মধ্যে ৪৯ কোটি টাকার সুতী বস্ত্র আসিয়া থাকে।

ব্রিটিশ পণ্য বয়কট একটি বাস্তব পরিকল্পনা। গত কয়েক বছর যাবৎ ধীরে ধীরে ব্রিটিশ আমদানী হ্রাস পাইতেছে এবং ইহার পরিমাণ, ১৯২৩-২৪ সালে শতকরা ৫৮ ভাগ হইতে ১৯২৬-২৭ সালে শতকরা ৪৮ ভাগে কমিয়া আসিয়াছে। এই সময় প্রবল বয়কট আন্দোলন পরিচালিত হইলে তাহা প্রকৃতই কাজের সহায়ক হইবে।

১৯২৬-২৭ সালে সুতীবস্ত্র ছাড়া যুক্তরাজ্য হইতে এককোটির উর্ধ্বমূল্যের নিম্নলিখিত পণ্য আমরা আমদানী করিয়াছি :

পণ্য		পরিমাণ : কোটি টাকায়	
কলকব্জা ইত্যাদি	প্রায়	১১	
লোহা-ইস্পাত		১০	
যন্ত্রপাতি (চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজের জন্য)		২১/২	
খাদ্যাদি		২	
রেলওয়ের যন্ত্রপাতি		২	
পশমের তৈরী পণ্য ও সুতী (বস্ত্র বুননের জন্য)		২	
হার্ডওয়ার		২	
কাঁটা-চামচ		১১/২	
রাসায়নিক দ্রব্য		১১/২	
সাবান		১১/২	
স্পিরিট		১১/২	
তামাক		২	টাকার উর্ধ্বে
কাগজ এবং পেস্ট বোর্ড		১	টাকার উর্ধ্বে
পেইন্ট ও পেইন্টারের সামগ্রী		১	টাকার উর্ধ্বে

আমি যতদূর জানি গত বছর তামাকের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে এমন অনেক দেশ হইতে উপরি-উক্ত পণ্যগুলির বিকল্প পণ্য আনা যাইতে পারে। এই বিকল্প পণ্যগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্য হইতে কম মূল্যের হইবে।

আমাদের প্রশ্ন করা হইয়াছে বিদেশী বস্ত্র বয়কটের পরিবর্তে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের কথা বলি কেন। আমি স্বীকার করি বিদেশী বস্ত্র পুরাপুরি বর্জন করা সম্ভবপর এবং ইহাও স্বীকার করি পরোক্ষভাবে বিদেশী বস্ত্র পুরাপুরি বর্জনের জন্যই আমরা কাজ করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় সুতীকলের মালিকগণ যেমন আমাদের গলা কাটিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেরকম প্রতিশ্রুতি না পাইলে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের পরামর্শ

আমি অন্তত দিব না। আমরা একবার আগুনে হাত দিয়াছি এবং সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এখনো মনে আছে। একবার আমরা পূর্ণরূপে বিদেশী বস্ত্র-বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে মিলমালিকদের হাতের মুঠোয় নিজেদের তুলিয়া দিব এবং তাহা ঘটিবার পূর্বে আমাদের বুঝিতে হইবে আমাদের প্রতি তাহাদের আচরণ কী হইবে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন যদি অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া থাকে এইবার তাহার দশগুণ বেশি সফল হইবে। সেইবার বয়কট কার্যত ভারতের একটি অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অপরপক্ষে বর্তমানে ইহা একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। ভারতের বস্ত্রশিল্প কত দ্রুত পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, এ-বিষয়ে ১৮৯৬-৯৭ ও ১৯২৬-২৭ সালের তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে—

১৮৯৬-৯৭

বিদেশ হইতে আমদানী সুতী বস্ত্র	১১৯ কোটি	৭০ লক্ষ গজ
ভারতীয় তাঁতে প্রস্তুত সুতী বস্ত্র	৭৮	৪০
ভারতীয় মিলে প্রস্তুত সুতী বস্ত্র	৩৫	৪০
রপ্তানী ও পুনঃরপ্তানি (বাদ দিলে)	২৭	৬০
মোট সুতীবস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ	২৮৫	৯০

১৯২৬-২৭

বিদেশ হইতে আমদানী সুতী বস্ত্র	১৭৮ কোটি	৮০ লক্ষ গজ
ভারতীয় তাঁতে প্রস্তুত সুতী বস্ত্র	১২১	৫০
ভারতীয় মিলে প্রস্তুত সুতী বস্ত্র	২২৫	৯০
মোট সুতীবস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ	৫২৬	২০

বিগত ৩০ বছরে ভারতে সুতী বস্ত্রের ব্যবহার দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। সেইসঙ্গে ভারতীয় তাঁতে সুতী বস্ত্রের উৎপাদনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর মিলে প্রস্তুত সুতী বস্ত্রের উৎপাদন ছয়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতী বস্ত্রের ব্যবহার দ্বিগুণিত হইলেও ১৮৯৬-৯৭ ও ১৯২৬-২৭ সালের

মধ্যে মোট বিদেশী সুতীবস্ত্র আমদানীর পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। উপরের তথ্যতালিকা প্রমাণ করে যে তাঁতশিল্প— মৃতপ্রায় হওয়া দূরে থাকুক, —ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতেছে।

খাদি-উৎপাদনে কর্মরত বন্ধুরা আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে খাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। বহু মিল-মালিকও আমাদের জানাইয়াছেন কাটতি বাড়িলে তাঁহারা শতকরা ৪০ হইতে ৫০ গুণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং ব্রিটিশের উৎপাদিত বস্ত্র সমেত সকল বিদেশী বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাব বাস্তব-সম্মত। ১৮৯৬-৯৭ সালে তাঁতে ও মিলে আমাদের প্রয়োজনের মোট শতকরা ৩৭ ভাগ প্রস্তুত হইত; ১৯২৬-২৭ সালের উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ। বিদেশী বস্ত্রের অবশিষ্ট শতকরা ৩০ ভাগ আমদানীও বন্ধ করা সহজ হইবে যদি বয়কট অভিযান তীব্রতর করিয়া আমরা চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারি।

বর্তমানে স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বয়কট সংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি জেলার, বাজারের এবং ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র বিক্রয়কেন্দ্রগুলির অর্থনৈতিক সমীক্ষা হওয়া উচিত। এই-সকল বাজার ও বিক্রয়কেন্দ্রের সন্নিকটে আমাদের প্রচার-কেন্দ্র অথবা কংগ্রেস অফিস থাকিবে। এই-সকল কেন্দ্র হইতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চলিবে এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ স্বদেশী পণ্য জোগান দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক দপ্তরের সঙ্গে মফঃস্বলের কংগ্রেস সংগঠনের কাঠামোগত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে বয়কট ও স্বদেশী পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলা অপরিহার্য। বাজারে স্বদেশী পণ্যের সংহতি সাধিত না হইলে বয়কট আন্দোলনের উদ্বেলতা স্তিমিত হইলেই, বিদেশী পণ্য আবার বাজারে দেখা দিবে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় মফঃস্বলে ম্যাজিক লণ্ঠনসহ বয়কটের প্রচার খুবই কার্যকরী হয়।

বয়কট ও স্বদেশীর— যদি সাফল্য লাভ করিতে হয়, বহুসংখ্যক কর্মীর এবং দেশব্যাপী কংগ্রেস সংগঠন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। আন্দোলন যত প্রসার লাভ করিবে, দমননীতি ততই ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে এবং সম্ভবত ১৯২১ সালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে।

দুইটি উদ্ধৃতি হইতে বয়কট আন্দোলনের প্রসার পরিস্ফুট হইবে। ১৯২৮-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি মি. জে. আর. ক্লাইনস্ ইংলণ্ডের রাজার ভাষণের

উপর শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : 'ভারতবর্ষে ও চীনে ল্যাংকাশায়ারের বাজার হাত-ছাড়া হইয়া যাইবার সহিত ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় নীতির বহুল পরিমাণে সম্পর্ক রহিয়াছে! সুতী বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্যের বৃহৎ পরিমাণে হ্রাসের কারণ একমাত্র জাপানী প্রতিযোগিতা নহে' (রয়টার)।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ যেদিন সাইমন কমিশন কলিকাতায় পেঁছায়, সেই দিনই বয়কট আন্দোলনের শুরু। দুই মাস হইবার পূর্বেই ১৯২৮-এর ১৭ এপ্রিলে 'ইংলিশম্যান'-এ নীচের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয় :

"গতকাল 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সংবাদে আছে যে মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স ব্যবসায়ীদের কোনো কোনো ধরনের সুতীবস্ত্র ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

'ইংলিশম্যান'-এর একজন সংবাদদাতাকে গতকাল কর্তৃপক্ষদের কেহ জানাইয়া দিয়াছেন যে গত ছয়মাস যাবৎ সাদা নয়নসুক ও সাদা মল-এর চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে এবং একই সংগে ইহাদের সমকক্ষ স্থানীয় পণ্যের বিক্রয় আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই হঠাৎ হ্রাসের কারণ সম্পর্কে এই-সকল পণ্যের ব্যবসায়ীরা কিছু বলিতে চাহেন না। ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনের সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবন যে অনেকটা এইজন্য দায়ী, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

ফলে দোকানগুলিতে এই-সকল পণ্যের অত্যধিক মজুত রহিয়াছে; প্রতিদিন বাজার আরো মন্দা হইতেছে এবং দাম পড়িবার ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

অপরপক্ষে, 'ইংলিশম্যানে'র সংবাদ : দেশী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিদেশী বস্ত্র অপেক্ষা অনেক বেশি বিক্রয় হইতেছে।

এই অবস্থা চলিতে থাকিবে কিনা, শেষ পর্যন্ত বাজার সঠিক পথ ধরিবে কিনা তাহা পরে বুঝা যাইবে। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের আরো ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

কলিকাতার মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স-এর সাদা সুতীবস্ত্র সমিতি (White Piecegoods Association) সাদা নয়নসুক ও সাদা মল-এর ব্যবসায়ীদের তৈয়ারি পণ্য সমেত এই-সকল পণ্য জুন ও জুলাই-এর জাহাজী সরবরাহের জন্য ১২ এপ্রিল হইতে ক্রয় করা নিষেধ করিয়া দিয়াছে।

ইহাও স্থির হইয়াছে যে বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ীদের ১৯২৯-এর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের জাহাজী সরবরাহের জন্য এই-সকল পণ্য ১৯২৮-এর এপ্রিল হইতে ক্রয়ে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা হউক।"

একটি মাত্র প্রদেশে দুই মাসের আনুমানিক কাজের এই সরকারী বিবরণের পর যাহারা অবিশ্বাসী ও সমালোচক, আমি আশা করি অতঃপর তাহারা আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

পল্লী সংগঠন

রাজনৈতিক সংগ্রাম চলাকালীন আমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো পল্লী সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকসহ আমাদের বিশাল দেশে, নানাবিধ মেধা এবং বিভিন্ন মানসিকতা-সম্পন্নদের কার্যকারিতার অবকাশ রহিয়াছে। যদি নির্মান ও পুনর্গঠন রাষ্ট্রনৈতিক প্রচারের সঙ্গে একই তালে না চলে, তবে পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া সেখানে আমরা নূতন কিছু গড়িতে পারিব না। এই ধরনের একটি ভাষণে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমি কেবলমাত্র বলিব যে আমাদের গ্রামের কাজের সময় আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইবে স্থানীয় লোকের মধ্যে অগ্রবর্তীর ভূমিকা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কোনো অঞ্চলের অভাব-মোচন। গভর্নমেন্ট, জমিদার অথবা পরহিতব্রতীর দাক্ষিণ্যে আমাদের অশুভ-ক্ষালন অথবা অভাব-মোচন হইবে না। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া জাতি হিসাবে শেষপর্যন্ত আমাদের আত্মনির্ভরতা শিখিতে এবং অভ্যাস করিতে হইবে। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে, সমাজ-সংস্কার করিয়া আমাদের গৃহকে স্বাস্থ্যকর, বাসোপযোগী এবং সুশ্রী করিতে হইবে।

শ্রমিক অসন্তোষ

আমাদের জনসাধারণ, বিশেষভাবে শ্রমিকেরা বর্তমানে একটি দুরূহ অর্থ-নৈতিক সংকটের মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতেছে দেখিয়া আমরা সকলেই অবশ্য ব্যথিত বোধ করিব। বিভিন্ন রেলে দুঃসহ ছাঁটাই হইতেছে— বিশেষ-ভাবে রেলের কারাখানাগুলিতে। আমি জানি প্রতি বৎসর গ্রেট ব্রিটেন হইতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের রেলওয়ের সরঞ্জাম আমাদের রেলের জন্য

আমদানী করা হয়। অথচ কারখানাগুলি সম্প্রসারিত করিলে ভারতেই এই-গুলি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এই-সবল পণ্য নির্মাণের উদ্যোগ করিলে কর্মরত শ্রমিক ছাঁটাই দূরে থাকুক, রেল-প্রশাসন আরো বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু এইখানেও দরিদ্র ভারতীয়দের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া ইংরেজদের এবং তাহাদের শিল্পের স্বার্থই রক্ষা করিতে হইবে।

শ্রমিকদের এই সংকটের সময় তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য— কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে তো বটেই। আমাদের সর্বশক্তি দিয়া তাহাদের সহায়তায় অগ্রসর হইতে হইবে। মালিকেরা ভারতীয় হইলে তাহাদের বুঝাইয়া তাহাদেরই দেশবাসী অপর-এক শ্রেণীর প্রতি আপসসুলভ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণ করাইবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আগামী মহাযুদ্ধ

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য অধুনা ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে একটি আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বিশ্বশান্তি বজায় রাখিবার জন্য একটি শক্তিশালী বিশ্ব-সংঘ গঠিত হইয়াছে। সারা বিশ্বের যুবশক্তি রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহাদের পাশার ঘুঁটিরূপে ব্যবহার করা হয় তাহারা এই আন্দোলনে প্রভূত উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছে। তাহাদের সহিত আমরা যে একমত, তাহা আমাদের ঘোষণা করা প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে আমাদের ইহাও জানাইয়া দিতে হইবে যে যদি আর-একটি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পুনরায় মানবতার বাণী লাঞ্ছিত করা হয়, ভারতবর্ষ তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবে। ভারতবর্ষ তাহার সম্পদ, অর্থ এবং তাহার রক্ত দিয়া ভ্রাতৃ-হত্যার যুদ্ধে সাহায্য করিতে পুনরায় আগাইয়া আসিবে না।

উপসংহার

বন্ধুগণ, আমরা জাতির ইতিহাসে এক সংকটময় মুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন আমাদের কর্তব্য, সকল শক্তি সংহত করিয়া ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে দুর্জয় সাহসে রুখিয়া দাঁড়ানো। আমাদের মধ্যে অনৈক্য অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য অনেক বেশি। যে-সকল বিষয়ে আমরা একমত সেগুলির উপর

জোর দিয়া যেখানে অমিল সেগুলি ভুলিয়া থাকিব। সেক্সপীয়রের ভাষায় : 'মানুষের জীবন-স্রোতে মাঝে মাঝে জোয়ার আসে। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলে সৌভাগ্যের সীমায় পৌঁছাইয়া দেয়।' আমরা পূর্ণ জোয়ারের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হেলায় চলিয়া যাইতে না দিই। জাতি হিসাবে পূর্বাপেক্ষা আমরা অনেক শক্তিশালী হইয়াছি। এমন-কি ১৯২১ সাল হইতেও আমরা বেশি শক্তিমান। অন্তত আমার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। আসুন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, একত্রে দাঁড়াইয়া, এক প্রাণে, এক কন্ঠে, টেনিসনের সেই বাণী উচ্চারণ করি— 'প্রচেষ্টা চলিবে, অনুসন্ধিৎসা চলিবে, সন্ধান চলিবে কিন্তু হার স্বীকার চলিবে না'— যাহা ইউলিসিসের কন্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল।

আমরা গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী, সুতরাং দায়িত্বও আমাদের মহৎ। আমরা দেশবন্ধু ও লোকমান্যের স্বপ্নের উত্তরসাধক এবং সেই স্বপ্নকে আমাদের বাস্তবে রূপদান করিতে হইবে। ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হইবে —সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন সুনিশ্চিত, ইহাও সেইরূপ। আসুন, আমাদের জীবনে তাঁহাদের স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী হই, এ কাজ যেন আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রাখিয়া না যাই। মহারাষ্ট্রের ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ, আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন সেজন্য পুনর্বার আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আগামীদিনের সংগ্রামে যেন মহারাষ্ট্র এবং বাংলা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একত্রে দাঁড়াইতে পারে। আপনারা আমাকে যে প্রীতি ও সম্মান দিয়াছেন, আপনাদের আশীর্বাদে আমি যেন তাহার কিছুমাত্র যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারি। "বন্দেমাতরম্"

আমদানী করা হয়। অথচ কারখানাগুলি সম্প্রসারিত করিলে ভারতেই এই-গুলি সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এই-সবল পণ্য নির্মাণের উদ্যোগ করিলে কর্মরত শ্রমিক ছাঁটাই দূরে থাকুক, রেল-প্রশাসন আরো বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু এইখানেও দরিদ্র ভারতীয়দের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া ইংরেজদের এবং তাহাদের শিল্পের স্বার্থই রক্ষা করিতে হইবে।

শ্রমিকদের এই সংকটের সময় তাহাদের সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য— কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে তো বটেই। আমাদের সর্বশক্তি দিয়া তাহাদের সহায়তায় অগ্রসর হইতে হইবে। মালিকেরা ভারতীয় হইলে তাহাদের বুঝাইয়া তাহাদেরই দেশবাসী অপর-এক শ্রেণীর প্রতি আপসসুলভ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণ করাইবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইতে হইবে।

আগামী মহাযুদ্ধ

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, যুদ্ধ নিবারণের জন্য অধুনা ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে একটি আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বিশ্বশান্তি বজায় রাখিবার জন্য একটি শক্তিশালী বিশ্ব-সংঘ গঠিত হইয়াছে। সারা বিশ্বের যুবশক্তি রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহাদের পাশার ঘুঁটিরূপে ব্যবহার করা হয় তাহারা এই আন্দোলনে প্রভূত উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছে। তাহাদের সহিত আমরা যে একমত, তাহা আমাদের ঘোষণা করা প্রয়োজন। সমগ্র বিশ্বকে আমাদের ইহাও জানাইয়া দিতে হইবে যে যদি আর-একটি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পুনরায় মানবতার বাণী লাঞ্ছিত করা হয়, ভারতবর্ষ তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবে। ভারতবর্ষ তাহার সম্পদ, অর্থ এবং তাহার রক্ত দিয়া ভ্রাতৃ-হত্যার যুদ্ধে সাহায্য করিতে পুনরায় আগাইয়া আসিবে না।

উপসংহার

বন্ধুগণ, আমরা জাতির ইতিহাসে এক সংকটময় মুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন আমাদের কর্তব্য, সকল শক্তি সংহত করিয়া ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে দুর্জয় সাহসে রুখিয়া দাঁড়ানো। আমাদের মধ্যে অনৈক্য অপেক্ষা বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য অনেক বেশি। যে-সকল বিষয়ে আমরা একমত সেগুলির উপর

জোর দিয়া যেখানে অমিল সেগুলি ভুলিয়া থাকিব। সেক্সপীয়রের ভাষায় : 'মানুষের জীবন-স্রোতে মাঝে মাঝে জোয়ার আসে। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিলে সৌভাগ্যের সীমায় পৌঁছাইয়া দেয়।' আমরা পূর্ণ জোয়ারের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হেলায় চলিয়া যাইতে না দিই। জাতি হিসাবে পূর্বাপেক্ষা আমরা অনেক শক্তিশালী হইয়াছি। এমন-কি ১৯২১ সাল হইতেও আমরা বেশি শক্তিমান। অন্তত আমার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। আসুন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, একত্রে দাঁড়াইয়া, এক প্রাণে, এক কণ্ঠে, টেনিসনের সেই বাণী উচ্চারণ করি— 'প্রচেষ্টা চলিবে, অনুসন্ধিৎসা চলিবে, সন্ধান চলিবে কিন্তু হার স্বীকার চলিবে না'— যাহা ইউলিসিসের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল।

আমরা গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী, সুতরাং দায়িত্বও আমাদের মহৎ। আমরা দেশবন্ধু ও লোকমান্যের স্বপ্নের উত্তরসাধক এবং সেই স্বপ্নকে আমাদের বাস্তবে রূপদান করিতে হইবে। ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হইবে —সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন সুনিশ্চিত, ইহাও সেইরূপ। আসুন, আমাদের জীবনে তাঁহাদের স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী হই, এ কাজ যেন আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রাখিয়া না যাই। মহারাষ্ট্রের ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ, আপনারা আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন সেজন্য পুনর্বার আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আগামীদিনের সংগ্রামে যেন মহারাষ্ট্র এবং বাংলা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একত্রে দাঁড়াইতে পারে। আপনারা আমাকে যে প্রীতি ও সম্মান দিয়াছেন, আপনাদের আশীর্বাদে আমি যেন তাহার কিছুমাত্র যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে পারি। "বন্দেমাতরম্"

কর্পোরেশনে ও কাউন্সিলে স্বরাজ্যদল

বাংলায় স্বরাজ্যদলের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য।

মন্ত্রীসভায় অনাস্থা প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় আমরা বিস্মিত হই নাই। ১৪০ জন সদস্যের সভায় স্বরাজ্যদলের সদস্য মাত্র ৪২ জন; এবং তাহারা তাহাদের দলের ৪ জন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৬১—৬৬ ভোটে পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং, ভোটের মাধ্যমে ইহা স্পষ্ট হইবে যে বর্তমান-সংগঠিত কাউন্সিলে আমরা কক্ষের অন্যান্য দলের সাহায্যে জয়লাভ করিতে পারি। অন্যান্য দলের সমর্থনের ফলেই গত আগস্ট মাসে আমাদের পক্ষে একটি অনাস্থা প্রস্তাবে জয়লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল। এইবার আমরা অল্প ব্যবধানে হারিয়াছি তাহার কারণ অংশত এই যে, পূর্বের ন্যায় অন্যান্য দলের সমর্থন বিপুলভাবে পাওয়া যায় নাই এবং আমাদের নিজ দলেরও তিনজন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকিয়াছেন।

আপত্তিকর কায়দাকানুন

মন্ত্রীদের কিছু সংখ্যক পৃষ্ঠপোষকের আরো আপত্তিকর, এবং বলিতে গেলে, নীতিগর্হিত কায়দাকানুন যে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করিয়াছে তাহা সাধারণভাবে বাংলার জনগণের নিকট বিদিত। বর্তমানে আমাদের পরাজয় সত্ত্বেও মন্ত্রীগণ তাঁহাদের কার্যকালে এত কম কাজ করিয়াছেন এবং নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে এত সামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে আমি নিশ্চিত পরবর্তীকালে অ-স্বরাজ্যবাদী সদস্যেরা মন্ত্রীসভার বিপক্ষে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিবেন। ১৯২৩ সালের তুলনায় বাংলা কাউন্সিলে কংগ্রেস পার্টি দুর্বলতর হইলেও, ইহা আগেকার মতোই দৃঢ়সংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল এবং শেষ পরাজয় আমাদের ঐক্যবন্ধনে সহায়তা করিয়াছে।

কর্পোরেশনে স্বরাজ্যদলের অবস্থা

স্বরাজ্যদল এবং কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে ইহা সাধারণত জানা নাই যে ১৯২৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় হইতে আমরা সংখ্যালঘু হইয়াছি। বিগত বৎসর অল্ডারম্যান নির্বাচনের কালে পাঁচজন কংগ্রেসী

প্রার্থীর মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নির্বাচনে এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া যায়। যাহাই হউক, গত বৎসর কংগ্রেস পার্টি শ্রী সেনগুপ্তকে মেয়র হিসাবে নির্বাচিত করাইতে সমর্থ হয় কারণ কয়েকজন মুসলমান কাউন্সিলর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শ্রী জে. এন. বসু অপেক্ষা তাঁহাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন। এই বৎসর ইউরোপীয়, মনোনীত ভারতীয় এবং কিছু সংখ্যক নির্বাচিত হিন্দু কাউন্সিলরদের লইয়া গঠিত কংগ্রেসবিরোধী সম্মিলিত সভা (কোয়ালিশন পার্টি) মুসলমান কাউন্সিলরদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সহিত নানারূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তির শর্তগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে এই চুক্তির ফলে মুসলমান কাউন্সিলরগণই ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হইবেন, তাঁহাদের সম্প্রদায় নয়। হিন্দু মতবাদের সমর্থকরা যাঁহারা মুসলিম-ঘেঁষা মনোভাবের জন্য কংগ্রেস পার্টিকে জোর গলায় নিন্দা করিয়াছেন তাঁহারাই সর্বপ্রথম কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া এই চুক্তিতে মত দিয়াছেন এবং কতকগুলি সুবিধাদানেও স্বীকৃত হইয়াছেন যাহা শুধু অবৈধই নয় অসাধ্যও বটে। কলিকাতার প্রত্যেকেই জানেন যে বিচিত্র উপাদানের এই সম্মিলন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না এবং ইহার ভাঙনের লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কংগ্রেস সদস্যদের বিভিন্ন কমিটিতে প্রবেশ করিতে না দিয়া সম্মিলিত দল এখন দেখিতেছেন যে কর্পোরেশনে কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব, সে কারণে তাঁহারা এখন আপসের প্রস্তাব দিতেছেন।

চিরদিন সুশৃঙ্খল দল

বাংলা কাউন্সিলের ন্যায় কর্পোরেশনেও তিনজন সদস্য আমাদের দলের প্রতি আনুগত্যহীন, কিন্তু ইহারা ব্যতীত সমগ্রভাবে আমাদের দল চিরকালের মতই সুশৃঙ্খল। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর ইহা অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা মনে রাখিয়া আমি বলিতে চাই যে তাঁহারা কর্পোরেশনে মুসলমান কাউন্সিলরগণের কার্যকলাপ মোটেই সমর্থন করেন না। মেয়র নির্বাচনের পূর্বে ও পরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট হইয়াছিল যাহাতে মুসলমানগণ হিন্দুদের মতোই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বিপদ এই যে গত নির্বাচনটি

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অনতিপরেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ফলে এমন অনেক কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়াছেন যাঁহারা সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয়তাবোধ-বিহীন মনোভাবসম্পন্ন।

বাংলার বাহিরে এরূপ ধারণা থাকিতে পারে যে উপরিলিখিত দুইটি ঘটনার বর্ণনা হইতে বাংলার জনমতের ধারাটি বুঝা যাইবে। ইহা ঠিক নহে। নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া এবং হাওড়ায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌর-নির্বাচন হইতে— যাহাতে কংগ্রেস দল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছেন— বাংলার প্রকৃত মনোভাব জানা যাইবে। হাওড়া বাংলার দ্বিতীয় পৌরসভা এবং সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কংগ্রেসের অনুপ্রবেশ রোধ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকেও অবশেষে হার মানিতে হইল। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে সারা বাংলার মনোভাব এখন কংগ্রেসের স্বপক্ষে। আমরা যদি এই সুযোগের সহিত তাল মিলাইয়া চলি ও আমাদের কর্মসূচী পালন করি তাহা হইলে ১৯২১ সালের মতোই সমগ্র প্রদেশ তাহাতে সাগ্রহে সাড়া দিবে।

শ্রমিক অশান্তি

আমি ভারতবর্ষব্যাপী শ্রমিক অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে কোনো অযৌক্তিক মতবাদ উপস্থাপনের বাসনা করি না। ইহা আমার নিকট বিশ্বের ঘটনার একটি প্রকাশ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। আমার মনে হয় রাজনীতি ও অর্থ-নীতির মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রহিয়াছে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও শ্রমিক অসন্তোষের মধ্যেও এক পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। আমি আরো অধিক সংবাদ না জানা পর্যন্ত বোম্বাইয়ের শ্রমিক অসন্তোষ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিব না। কিন্তু লিলুয়ায় ই. আই. রেলওয়ে এবং খড়্গপুরে বি.এন. রেলওয়ের অসন্তোষ সম্পর্কে আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে দোষ কর্তৃপক্ষের। আমি বুঝিতে অপারগ কেন লিলুয়া এবং খড়্গপুরের কারখানায় ছাঁটাই করা হইবে যেখানে প্রতি বছর বহু-সংখ্যক রেলওয়ে সরঞ্জাম গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানী করিতে হয় যাহা খুব সহজেই এখানে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আমি মনে করি তাহাদের দাবি যেহেতু ন্যায্য এবং বৈধ শ্রমিকদের সেই দুঃখের সময়ে তাঁহাদের সাহায্যার্থে কংগ্রেসের আগাইয়া আসা উচিত এবং ভারতীয় মালিকপক্ষকে এ ব্যাপারে বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নতি

বঙ্গদেশে গত কয়েক মাস ধরিয়া আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। প্রাদেশিক কাউন্সিলে এবং কংগ্রেসের কার্যসূচী রূপায়ণে, বিশেষত সাইমন কমিশন বয়কট, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, স্বদেশী আন্দোলন এবং বঙ্গদেশে পাটচাষের সীমাবদ্ধকরণ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর সহযোগিতা করিতেছে। আমি আশা করি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেই দেশের আবহাওয়া অস্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধ-মুক্ত হইবে এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইব।

কারামুক্তির পর জনজীবনে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি যে বঙ্গদেশে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। জেলে থাকিতে আমি যে মতদ্বৈধের কথা শুনিয়াছিলাম তাহা হয় বিদায় লইয়াছে অথবা বিদায়ের পথে। বঙ্গদেশে সব সম্প্রদায়ই এখন অনুধাবন করিয়াছেন যে আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন যাহাতে সকল দেশপ্রেমী ভারতবাসীরই দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া একটি সাধারণ কর্মসূচী লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এ-যাবৎ আমি কর্মসূত্রে যেরূপ সাড়া পাইয়াছি তাহা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং এই প্রদেশের যুবকদের সাড়া আমার সমস্ত প্রত্যাশা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কার্যসূচী সম্পর্কে আমার অভিমত এই যে, ইহাকে অবজ্ঞা করা যায় না, কারণ বর্তমান জনজীবনে ব্যবস্থাপক সভা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এই বলিয়া ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে আমাদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলের কর্মসূচী যদি দেশের কর্মসূচী দ্বারা সমর্থিত না হয় তা হইলে সব প্রচেষ্টাই বৃথা। ব্যবস্থাপক্ষ সভা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে কংগ্রেস লাভবান হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। সেরকম প্রচেষ্টা কংগ্রেসবিরোধী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের আগাইয়া আসিতে এবং জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধির ভান করিবার সুযোগ দিবে। কাউন্সিলের কাজ যেমন সরাসরি পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নাই, তেমনই ইহা প্রার্থিত, যে এই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যবস্থাপক সভার বাহিরের কর্মেই আমরা কেন্দ্রীভূত করিব।

৩ মে ১৯২৮

বয়কট হইতে আইন অমান্য আন্দোলন

৮ মে ১৯২৮ মানিকচকে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের স্বাধীনতালাভের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি এবং গ্রামে নিবিড় প্রচারের মাধ্যমে ইহা জাগ্রত করিতে হইবে। ভারতবর্ষ ১৯২১ সাল অপেক্ষা বর্তমানে অধিকতর শক্তিশালী, কিন্তু ইউরোপ এবং গ্রেট ব্রিটেন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া বর্তমানে দুর্বলতর। আমরা যদি এই অনুকূল সময়ের সুযোগ গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের দ্রুত উন্নতি হইবে।

সাইমন কমিশন বর্জনের মধ্যে যে সূত্রপাত ঘটিয়াছে তাহাকে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের দ্বারা আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমরা সমস্ত বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিতে প্রস্তুত যদি ভারতীয় মিলমালিকেরা আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকালের মতো কাজ না করিবার আশ্বাস দেন। মহাত্মা গান্ধীর হতাশাব্যঞ্জক ধারণা সত্ত্বেও, ভারতীয় মিল মালিকদের সম্পর্কে আমার একটি ক্ষীণ আশা আছে যে তাঁহারা জনগণের সহিত সহযোগিতা করিবেন। বাংলায় দুইমাস ব্যাপী প্রচারের ফলে সেখানকার বণিকেরা তাঁহাদের চুক্তি বাতিল করিয়াছেন। সারা দেশব্যাপী বারো মাস ধরিয়া অভিযান চালাইলে তাহার ফল কী হইবে? বিদেশী বস্ত্র বর্জন দ্বারা দেশকে সংগঠিত করিলে দেশ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইবে। ইংলন্ড কর্তৃক আমাদের যুক্তিযুক্ত ও বৈধ দাবিগুলি না মানিয়া লওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রামকে কঠিন সমাপ্তিতে টানিয়া লইয়া যাইতে চাই।

কংগ্রেসে দলাদলি নাই

বোম্বাই টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ সম্বন্ধে ৭ মে ১৯২৮ এক সাক্ষাৎকার।

ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলির একটি অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে যে তাহারা প্রায় রোজই কংগ্রেস পার্টির মধ্যে বিভেদ আবিষ্কার করে। সাম্প্রতিক আবিষ্কারটি 'টাইমস অব ইন্ডিয়ার' কলিকাতাস্থ সংবাদদাতার; তাহার মর্ম এই যে কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ লইয়া কাড়াকাড়ি হওয়ার জন্য কলিকাতার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একটি বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইতে চলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় বন্ধুরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন এই ব্যাপার লইয়া কোনো বিবাদের সম্ভাবনা নাই, ফলত ইহা হইতে কোনো বিচ্ছেদেরও প্রশ্ন উঠে না।

এই প্রসঙ্গে আমার নাম টানিয়া আনা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত কে সভাপতি নির্বাচিত হইবেন তাহা এখন বলার সময় আসে নাই। কারণ ব্যাপারটি এখনো পর্যন্ত গভীরভাবে আলোচিত হয় নাই, কিন্তু আমার সম্পর্কে বলিতে পারি আমি আমার বন্ধুদের জানাইয়া দিয়াছি যে আমি উক্তপদের প্রার্থী নহি। আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় বন্ধুদের নিশ্চিত বলিতে পারি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচনের সময় বিষয়টি লইয়া কোনো মতপার্থক্য হইবে না এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে আমি যতদূর জানি বর্তমানে বাংলার কংগ্রেসীদের মধ্যে কোনো দলাদলি নাই।

ইহা বলা সর্বৈব মিথ্যা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভ্যর্থনা সমিতিকে একটি সীমাবদ্ধ সংগঠনে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট। অপর দিকে, অভ্যর্থনা সমিতির দ্বার অবাধ উন্মুক্ত এবং যাঁহারা সাধারণত কংগ্রেসের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন অথবা উদাসীন তাঁহাদেরও এই কমিটির সদস্য-তালিকাভুক্তির জন্য সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাংলায় কংগ্রেস দলের পরিচালকবর্গ সম্ভবত সদস্য-তালিকায় অবাধ প্রবেশাধিকারে ভীত হন না এবং সেই প্রবাহে তাঁহাদের ভাসিয়া যাইবার কোনো ভয়ও নাই কারণ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র প্রদেশই কংগ্রেসের স্বপক্ষে।

একটি সাময়িক অভ্যর্থনা সমিতি গঠনে কিছু আসে যায় না কারণ যে-কোনো সাধারণ লোকও জানে যে একটি অস্থায়ী সমিতি গঠন করিয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হয়।

ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে

১১ মে ১৯২৮ দিল্লীতে প্রদত্ত ভাষণ।

আমি বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। ভারতের যুবকদের অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে হবে। দেশের যুবকদের উপর আমার অপরিসীম বিশ্বাস আছে। আর এইজন্যই জীবনের নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় এমন সাহসের সংগে আমি মোকাবিলা করিয়াছি।

এই বিশ্বাস আমাকে শিখাইয়াছে যে ভারতবর্ষ হাজার হাজার মহাত্মাজী সৃষ্টি করতে পারে। কেননা একজনের পক্ষে কখনোই স্বাধীনতা আনা সম্ভব নয়। একক চেষ্টায় কখনোই একটি জাতি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। পুরোনো নেতাদের বদলে নূতন নেতা সৃষ্টি করার সজীবতা যদি একটি জাতি হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সেই জাতি বিলুপ্ত হইতে বাধ্য।

ভারতের মিশন

ভারতের সজীবতায় আমার বিশ্বাস আছে। নহিলে কখনোই আজ আমরা একটি অমর জাতি হইতে পারিব না। যখন অনেক সভ্যতা ও অনেক মতবাদের উত্থান-পতন ঘটিয়াছিল, তখনো ভারত বাঁচিয়া ছিল। কেননা তাহাকে যে একটি নিয়তি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করিতে হইবে! পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করাই ভারতের মিশন।

বহু জাতিভিত্তিক সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে আজিকার পৃথিবী ব্যর্থ হইয়াছে। নহিলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পৃথিবীর দেশে দেশান্তরে আদি বাসীদের এইভাবে ধ্বংসসাধন করিত না। তার কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতির বিচিত্র উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে ভারতে আমরা বিভিন্ন উপজাতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সাধনায় রত।

এই ঐক্যস্থাপনের দায়িত্ব দেশের যুবকদের কাঁধে আসিয়া পড়িয়াছে। যে মুহূর্তে এই দায়িত্ববোধ তরুণদের মনে জাগিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্তেই জাতির সৃজনী শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিবে।

আমি জানি, ভারত স্বাধীন হইবেই। কিন্তু কখন স্বাধীন হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে দেশের যুবকদের উপর। কেননা শুধুমাত্র যুবকরাই স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে ভালোবাসে। তাহারাই একমাত্র স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হইতে পারে। তাহারাই শুধু স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। কর্তৃপক্ষ কখনোই যুবকদের পছন্দ করে না। কেননা যুবকদের চিন্তা বাঁধাধরা ছকে চলে না, যেহেতু তাদের ভাব ও আদর্শের একটি অন্তর্নিহিত গতিবেগ আছে।

আর্থিক মুক্তি

দাসত্বের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে যুক্ত অপমানের পর অপমানের সামনে দাঁড়ানোর মতো শক্তি আমাদের অর্জন করিতে হইবে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। আজ ভারতীয়দের এমন অনেক স্থানে যাইতে দেওয়া হয় না যেখানে এমন-কি কুকুর-বিড়ালদেরও প্রবেশাধিকার আছে। জীবনের কোনো মহিমাবোধ না থাকায় এই দেশে জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যতদিন আমাদের তীব্র অপমানবোধ না জাগিতেছে, ততদিন আমাদের জাগরণ সম্ভব নয়।

মুক্তির প্রথম শর্ত হইতেছে স্বাধীনতার স্পৃহায় যুবকদের উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে হইবে। শুধুমাত্র আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়াই স্বাধীনতা লাভ করা যায়। মুক্তির আদর্শের জন্য জীবন পণ করা চাই। একবার যদি দেশের যুবকরা স্বাধীনতার স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোনো শক্তি নাই, এমন-কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও নয়, যাহার পক্ষে দেশের জাতীয়তাবোধের প্লাবনকে প্রতিহত করিতে পারে। ন্যায়ধর্ম আমাদের পক্ষে। আমাদের দেশে অন্যান্য জাতি যে-সব মৌলিক অধিকার ভোগ করিতেছে, সেগুলি আমাদের পাওয়া চাই।

নীতি এবং কার্যসূচী যুবকদের অন্তরে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগানোর উপায় মাত্র। আজ ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। বিক্ষুব্ধ ভারতকে লইয়া আজ ব্রিটেনের পক্ষে কোনো ক্রমেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া সম্ভব নয়। তাই আমরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতে চাই : ভারতের দাবিগুলি না মানিয়া লইলে যুদ্ধকালে আমরা ইংলন্ডকে কখনোই সমর্থন করিব না।

স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে হইবে

অবিলম্বে আমাদের স্বাধীনতা আমরা কাড়িয়া লইব। দেশের পরিস্থিতি তার পক্ষে খুবই অনুকূল কেননা এই প্রথমবার আমরা সাইমন কমিশন বয়কট ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বয়কট ব্যাপারটা একটা 'না'-ধর্মী নীতি। আর এইজন্যই আমরা সর্বদলীয় সম্মিলনে একটি সংবিধান রচনার চেষ্টা করিতেছি। লর্ড বার্কেনহেড এবং তাঁর মতো আরো অনেক ব্রিটিশ ভদ্রলোক আজ এই আশায় বসিয়া আছেন যে ভারতীয়রা সংবিধান রচনা করিতে পারিবে না। বোম্বাই শহরে যে সম্মিলন চলিতেছে, তাহা সফল হইলে এই সাফল্য হইবে ভারতে স্বরাষ্ট্র সচিবের মুখের মতো জবাব।

আমাদের দাবিগুলি কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে চাই সক্রিয় প্রচেষ্টা। এইজন্যই আমাদের বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিতে হইবে। এই বর্জন আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার আগে বস্ত্রশিল্পপতিদের সহযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আশ্বস্ত হওয়া চাই। আমাদের আবার চাই দেশজোড়া প্রচার। এইভাবেই শুধুমাত্র আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হইবে। জাতীয় সংগঠনসমূহের একটি জাল সারা দেশ জুড়িয়া পাতিতে হইবে। তখনই আইন অমান্য আন্দোলন আমরা সহজে আরম্ভ করিতে পারিব। এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিব।

অতীতে দিল্লী অনেক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সমাধিস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এবার দিল্লী ভারতের স্বাধীনতার দোলনা হইয়া উঠুক।

লিলুয়ায় লক-আউট : একটি আবেদন

নিখিলবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি জনসাধারণের পক্ষ হইতে লিলুয়ার লক-আউটে ক্ষতিগ্রস্ত, বারোহাজার বুভুক্ষু কর্মীর ব্যাপারটি হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। তাঁহারা যখন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহাদের সাহায্য করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আমি তাঁহাদের বলিয়াছি যে পূর্বভারতীয় রেলে একটি সহানুভূতিসূচক সাধারণ ধর্মঘট হওয়া উচিত। তাহা হইলে পূর্বভারতীয় রেল ও রেলওয়ে বোর্ডের উপর একটি বিশেষ চাপ পড়িবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে ক্ষুধার্ত বারোহাজার কর্মীর মুখে খাদ্য জোগাইতে হইবে। বিরাট আকারে ত্রাণ ব্যবস্থা করা চাই। কমপক্ষে দুই-তিনমাস ধরিয়া এই সংগ্রাম চালাইয়া নেওয়া চাই। কর্মীদের অভিযোগগুলি ন্যায়সংগত এবং যুক্তিপূর্ণ। কোম্পানির এজেন্টের মনোভাব এত উদাসীন যে, এমন-কি, কয়েকটি আংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। এই অবস্থায় নিঃশর্তভাবে কর্মীদের পক্ষে আত্মসমর্পণ অসম্ভব। তাই আমি আমাদের ক্ষুধার্ত ভাইদের উদ্ধার করিতে আগাইয়া আসার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাই। আমার কোনো সন্দেহ নাই যে আমাদের কংগ্রেস কর্মীরা আন্তরিকতার সহিত ত্রাণ সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

১৮ মে ১৯২৮

উপাসনার স্বাধীনতা

সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। কিন্তু আজিকার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত পরামর্শগুলি আমার নিকট যথার্থ মনে হয় নাই। পৌত্তলিক হিন্দুই হোক আর ব্রাহ্ম হিন্দুই হোক, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। আমি বরং জোর দিয়া বলিতে চাই উপাসনার স্বাধীনতা উভয়কেই দেওয়া হোক। ব্রাহ্মসমাজ এবং বাকি হিন্দু সমাজের পারস্পরিক যে সম্পর্ক, তা হিন্দু ও খৃস্টান অথবা হিন্দু ও মুসলমানদের অনুরূপ নয়। আমি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু-সমাজের একটি অংশ বলিয়া বিবেচনা করি। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ প্রবীন সভ্যদের দ্বারা আমার এই বিশ্বাস সমর্থিত হয়। এখন ইহা একটি রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ব্রাহ্মরা তাঁহাদের নিজেদের ব্রাহ্ম-হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন এবং বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকগণ হিন্দু মহাসভায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন! তাই ব্রাহ্ম হিন্দুদের পক্ষে উপযুক্ত হয় যদি তাঁহারা পৌত্তলিক হিন্দুদের আর-একটু বেশি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। কেননা ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গত দশবছরে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস আমরা তাঁহাদের পৌত্তলিক সহধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণে অনুরূপ পরিবর্তন আশা করিতে পারি।

সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যকার মতবিরোধের আলোচনায় আমি প্রবেশ করতে চাই না। এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে, আইনের দৃষ্টি-কোণ হইতে ছাত্ররা ঠিকই করিয়াছে। আমার এই বিবৃতি সিটি কলেজ ও রামমোহন রায় হস্টেলের তত্ত্বাবধান-সম্পর্কিত দলিলপত্রের একটি ধারা মতে সমর্থিত হয়। কিন্তু আমি এই সমস্যার আইনগত দিকটির সঙ্গে নিজেকে জড়াইতে চাই না। আমি শুধু শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে বলিতে চাই। এ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যদি কর্তৃপক্ষ আর-একটু কৌশল, কম প্রতিশোধস্পৃহা এবং বেশি সহিষ্ণুতা দেখাইতেন, তাহা হলে আদৌ কোনো গন্ডগোল দেখা দিত না। যাহা হউক তবু বর্তমান অবস্থার প্রতিকারের সময় অতিক্রান্ত হয় নাই। আমি আমার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বন্ধুদের সম্মুখে মূল সমস্যাটি তুলিয়া ধরিলাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আমি সাড়া আশা করিতেছি।

১৮ মে ১৯২৮

বিলাত-যাত্রী। ১৯১৯
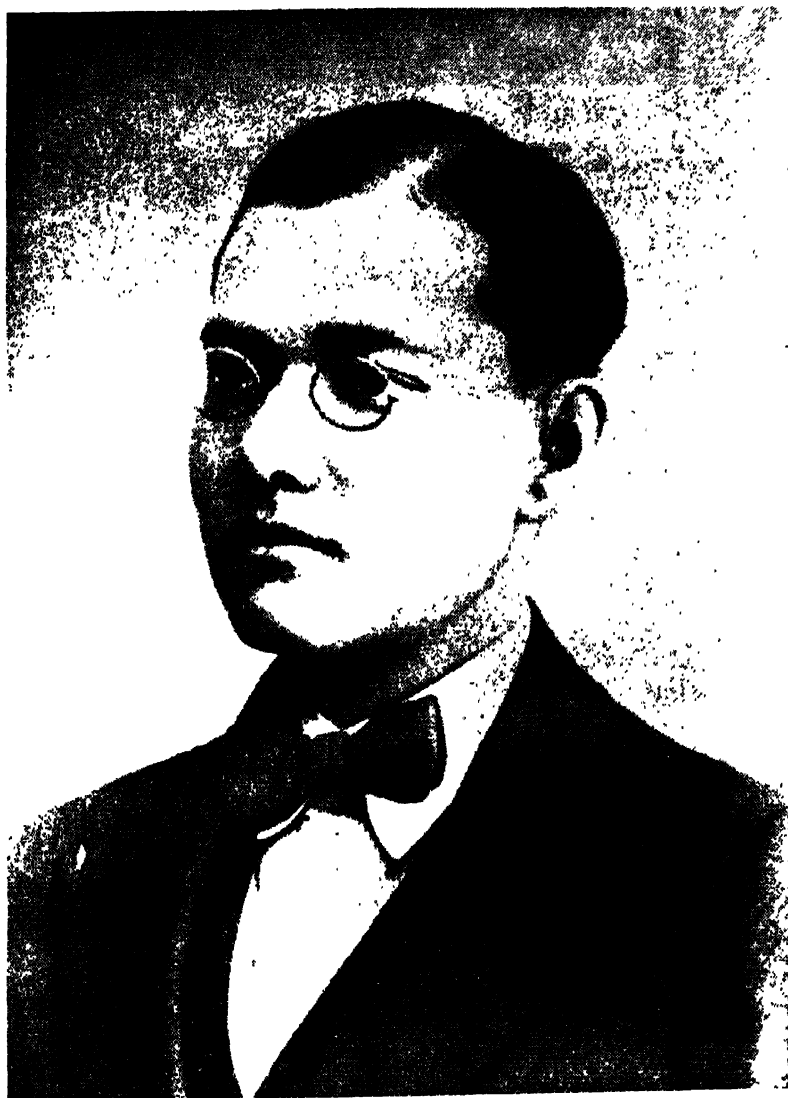
কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায়। ১৯২০

যৌবনের আদর্শ

২২ মে.১৯২৮ বোম্বাই শহরের অপেরা হাউসে প্রদত্ত ভাষণ।

তরুণদের মিশন হইতেছে তাঁহাদের নিজেদের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নূতন পৃথিবী রচনার দৃঢ় অঙ্গীকার। যুবকদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলনকে আমি যুব-আন্দোলন মনে করি না। যে আন্দোলন একটি আন্তরজাগরণপ্রসূত এবং ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে নূতন বিশ্বাস ও স্বপ্নের দ্বারা অনুপ্রেরিত, সেই আন্দোলনই একমাত্র যুব-আন্দোলন! তরুণের প্রথম মিশন: আপনার মধ্যে স্বরাজ এই অনুভূতি লাভ করা; দ্বিতীয় মিশন: সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সেই উপলব্ধিকে বাস্তবে রূপদান। আমি তরুণের এই মিশনে বিশ্বাস করি। কেননা তরুণদের সাহচর্যে আমাদের মধ্যেকার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা প্রকাশ লাভ করে। ভারতের যুবসমাজ যথেষ্ট পরিমাণে আত্মসচেতন নন। এই সমাজ যুব-আন্দোলনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অতঃপর জগৎ-সভায় ভারতের মিশন সম্পর্কেও তাঁহাদের অস্পষ্ট ধারণা তো আছেই। আমার তরুণ বন্ধুদের কাছে আমি এই মন্তব্যটি শুনিতে পাই যে আমাদের নেতারা যথার্থ নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হইয়াছেন। যুব-সম্প্রদায়ের কর্তব্য হইতেছে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের হাতে পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। চারিদিকে তাকাইয়া দেখুন এবং অনুভব করুন কিভাবে আধুনিক ইতালির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। তাহা সম্ভব হইয়াছে ম্যাজিনি এবং তাঁহার কর্মে ও স্বপ্নে সহযোগীদলের ধ্যানে ধারণায়। জার্মানী, পারস্য, চীন এবং আজিকার অন্যান্য দেশের রূপরেখা কোন্ কোন্ প্রেরণায় নির্দিষ্ট হইয়া উঠিতেছে? বলা বাহুল্য, সেই-সব দেশের যুবকদের স্বপ্নই সেই রূপরেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আমি আবার বলিতে চাই, ভারতীয় যুবকদের একটি ত্রুটি হইতেছে তাঁহারা যথেষ্ট আত্মসচেতন নন! আজ ভারতের লক্ষ্য দুইটি:— ১. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান; ২. বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতের দান তুলিয়া ধরা ও বিশ্বসমস্যার সমাধানে তাহার ভূমিকা পালন। এই মিশন কার্যকরী করিতে হইলে ভারতীয় যুবকদিগকে আমাদের ইতিহাসের অতীত সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হইতে হইবে এবং

তাঁহাদের এই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে হইবে। আর সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে ও যৌথ জীবনে রূপদানের জন্য একটি জ্বলন্ত আগ্রহ অতি অবশ্য চাই। আমি যেরকম বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে আজিকার সক্রিয় আদর্শগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসিত জাতিগুলির ফেডারেশন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহু সংস্কৃতির ফেডারেশন গঠন। ভারত নিজের জাতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলে তবেই বিশ্বসমস্যার সমাধানপ্রয়াসে স্বীয় অংশ লইতে পারিবে।

অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা

জাতীয় সমস্যার সফল সমাধানের জন্য ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং এদেশের সভ্যতার নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ভারতীয় যুবকদের সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া চাই। আমার দৃষ্টিতে সময়ের তটপ্লাবী একটি বিশাল নদীর মতো এই ভারতীয় সভ্যতা। সেই নদীতে আবার মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংস্কৃতির স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, বাংলা হইতে গুজরাট পর্যন্ত এই সভ্যতা একটি ঐক্যে বিধৃত। আপাত-বৈচিত্র্যও তাহার মধ্যে থাকিতে পারে। আমাদের ইতিহাস বলিতেছে তাহারা বিচিত্র কিন্তু বিদেশী-রচিত ইতিহাস হইতে আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহা আমাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমাদের অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকানো ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের সভ্যতায়, শিল্পে, দর্শনে, ধর্মে এবং সমাজ-বিজ্ঞানে এই সভ্যতার কীর্তি অনুভব করিবার মতো ইতিহাস-চেতনা আমাদের জাগাইয়া তোলা চাই। এই সভ্যতার মধ্যে হিন্দু বা মুসলমানের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নাই। ইহা বিভিন্ন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফলমাত্র। চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল তাজমহলের রূপের দিকে তাকাইয়া দেখুন এবং যে মন এই শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় ছিল, তাহার সৌন্দর্য অনুভব করুন। আমাদের বাঙালী কবি আশ্চর্যভাবে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন: 'এক বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল'। মুঘলরা যদি তাজমহল ব্যতীত কিছুই না রাখিয়া যাইতেন, তবু আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিতাম। ব্রিটিশ শাসনের দিন যেদিন শেষ হইয়া যাইবে, সেদিন এই সরকার পাশ্চাতে কী রাখিয়া যাইবে? কারাগারের কুৎসিত প্রাচীর এবং তাহার বিকট কারাকক্ষগুলি ছাড়া ব্রিটিশ সরকার আর কিছুই রাখিয়া যাইবে না।

ভারতের বিশেষ মিশনটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের এবং বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয় সঞ্চারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইউরোপও এই কাজটি চাহিয়াছে। কিন্তু কিভাবে? এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ইংলন্ড ও অন্যান্য দেশের কী কীর্তি? আফ্রিকা ও এশিয়ার যে-সব প্রাচীন অধিবাসী ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিয়াছিল, তাহাদের কী অবস্থা দাঁড়াইয়াছে? আমেরিকা নিগ্রো-সমস্যার সমাধান কিভাবে করিয়াছে? ইউরোপ-আমেরিকার সেই পথ ভারত পরিহার করিয়াছে। এ দেশ তাহার নিজের অন্তরের আলোতে সমস্যা-সমাধানের পথ সন্ধান করিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্য দিয়া বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমন্বয় সাধন ভারতবর্ষ করিয়াছে। কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরূপ। তাই এখন আমাদের আরো উদার বিজ্ঞাননির্ভর সমন্বয় চাই।

আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রগতি

আমি মনে করি ভারতীয় ইতিহাসের পরিচয় শুধু ধর্মে ও সংস্কৃতিতেই দেওয়া যায় না, এমন-কি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় দেওয়া যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারত তার স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হইতে পারে। ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে আরেক প্রান্তে ভারতীয় হকি খেলোয়াড় দল যেভাবে তাঁহাদের বিজয়ী ভ্রমণ সারিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে ভারত এই খেলোয়াড় দলের এক উপযুক্ত মাতৃভূমি। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধিত্বের জন্য এই দল নিশ্চয়ই গঠিত হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন একটি মস্তবড়ো কাজ। তাহাতে আমাদের ভয় পাইলে চলিবে না বরং এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদের উদ্দীপ্ত করুক। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইতেছে, ততদিন ভারতের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কখনোই সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে ভারতের নবজাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবে একটি যান্ত্রিক উপায়ে হয় নাই। আমি বিশ্বাস করি, ইংলন্ড যদি আজ ভারত হইতে তল্পিতল্পা গুটাইয়া নেয়, তথাপি ভারতের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। ভারত কখনোই অন্ধকার দিনগুলিতে ফিরিয়া যাইবে না। হে আমার তরুণের দল, আপনারা মশাল হাতে বাহির হইয়া পড়ুন, সারাদেশে বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইয়া দিন। গ্রেট ব্রিটেন দূরে থাক্, বিশ্বের কোনো শক্তিই সেই পবিত্র অগ্নি নির্বাপিত করিতে পারিবে না।

জাতীয় সংগ্রামে নারীর ভূমিকা

২২ মে ১৯২৮ বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় স্ত্রী-সভার উদ্যোগে মারোয়াড়ী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

স্বরাজলাভের জন্য বর্তমান মুহূর্ত বেশ সময়োচিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তির জীবনে সুযোগ ঘন ঘন আসে না। জাতির জীবনে তো নয়ই। মাতৃভূমির সেবার জন্য সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ায় আমাদের নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করা উচিত। এমনও হইতে পারে যে শুধুমাত্র দুঃখই আমাদের ভাগ্যে আছে। কিন্তু মনে রাখিবেন স্বাধীনতার জন্য ত্যাগবরণ একটি অনন্য সৌভাগ্য। আমরা ক্রীতদাস রূপে জন্মিয়াছি। কিন্তু দেখিতে হইবে যাহাতে ক্রীতদাসরূপে আমাদের মরিতে না হয়।

আমার নিকট ইহা একটি আনন্দ ও প্রেরণার সংবাদ যে অন্ততপক্ষে বোম্বাই শহরে রাষ্ট্রীয় স্ত্রী-সভা নামে মহিলাদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন আছে। ভারতের যুবকরা রাজনীতির ভয় কাটাইয়া উঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সারাদেশ জুড়িয়া মহিলাদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার কাজ ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে হাতে লইতে হইবে। নারীসমাজের সক্রিয় সমর্থন অপরিহার্য। কেননা তা ছাড়া সত্যিকারের কাজের কাজ করা যায় না।

কোনো কোনো ছিদ্রান্বেষী মানুষ বলিয়া থাকেন যে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। এই মত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। আমি দেখিতে পাইতেছি আমরা এখনো আন্দোলনের মাঝখানে আছি। আন্দোলন এখনো চলিয়াছে। অনেক কর্মী এই আন্দোলনে গতি সঞ্চার করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সূত্রপাত ১৯১৯-এর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্য দিয়া ঘটিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন সেই সময়েই শুরু হইয়াছে। অতঃপর মূলত এই আন্দোলন পরিবর্তিত হয় নাই— শুধুমাত্র বাহিরে কিছু কিছু অদলবদল হইয়াছে। আমরা এবারে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছি। যথাসর্বস্ব ত্যাগই এখন আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তাহা হইলেই এই সংগ্রাম প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করিবে।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী। মোটের উপর ১৯২১-এর তুলনায় আমরা এখন অনেক শক্তিশালী। নিশ্চয়ই ১৯২১-এ অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তবু আমরা বর্তমানে আরো শক্তিশালী কারণ আমাদের মধ্যে আরো অনেক মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে। সাইমন কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত লিবারেল ফেডারেশনও গ্রহণ করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ভূমিকার দিক হইতে গ্রেট ব্রিটেন এখন রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেননা ভারতের মর্যাদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা একটি মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জনের দেশব্যাপী কার্যকরী অভিযান— আমরা, ভারতীয়রা যদি চালাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে তা আমাদের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক হইবে।

সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী

ফরওয়ার্ডের নিজস্ব প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারে সর্বদলীয় সম্মিলন সম্পর্কে বক্তব্য।

বিশেষভাবে সব দল ও সংগঠন যোগদান করায় সমাবেশটি বেশ বড়ো হইয়াছিল। সত্যি কথা বলিতে কি, আমি আশাই করিতে পারি নাই যে এমন একটি বৃহৎ সমাবেশ হইবে। প্রবীণ এবং বিখ্যাত নেতাদের কেহ কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছি। আমার মনে হয় বোম্বাই হইতে দূরত্ব এবং গরম আবহাওয়াই তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ।

এই সম্মিলন সংবিধানের মূলনীতিগুলির খসড়া করার জন্য সংগতভাবেই একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব সকলের সমর্থন লাভ করিয়াছিল। বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি প্রশ্নের বিবেচনার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সব প্রশ্নের আলোচনা অভিপ্রেত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। কেননা তাহার মধ্য দিয়া প্রতিটি প্রশ্নকে নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্নিহিত গুণাগুণ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা সম্ভব হইবে।

যে সর্বদলীয় সম্মিলন এখন পর্যন্ত চলিয়াছে তাহার আলোচনাগুলি হইতে গঠিত কমিটি সাহায্য লাভ করিবে। এই সম্মিলনের সম্মুখে যে-সব সমস্যা রহিয়াছে, তাহার কোনো-কোনোটি নিঃসন্দেহে জটিল। একবার যদি এই-সব সমস্যা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসা যায়, তাহা হইলে এগুলির সমাধান অধিবেশনের সামনে সহজ হইয়া যাইবে। তাহার ফলে ঐক্যে পৌঁছানো সম্ভব হইবে।

এই কমিটিতে সকল পক্ষের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই আমি ইঁহাদের কাজকর্মের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী।

২৩ মে ১৯২৮

দুর্ভিক্ষ হয় কেন

২৬ মে ১৯২৮ বালুরঘাট পাবলিক আঞ্জুমান ইসলামিয়া, মহিলা সমিতি ও রেণু সংঘের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার উত্তরে ভাষণ।

দুর্ভিক্ষ এখানে সর্বনাশ করিয়াছে তাহা বাহির হইতে বোঝা অতি কঠিন। পৃথিবীতে তো আরো দেশ রহিয়াছে— সেখানে দুর্ভিক্ষ হয় না কেন? আমাদের এই সোনার বাংলায় যেখানে অপর্যাপ্ত শস্য হয় সেখানে প্রতি বৎসরই দুর্ভিক্ষের এই তাণ্ডব নৃত্য কেন? এই তো সেদিন উত্তরবঙ্গে ভীষণ প্লাবন হইয়া গেল। দেশের লোক বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নই প্রথমে মনে জাগে যে, বন্যা হয় কেন? উত্তর হইবে— অতিবৃষ্টির জন্য বন্যা হয়— ইহার প্রতিরোধ করা মানুষের অসাধ্য। দুর্ভিক্ষ হয় কেন? বৃষ্টির অভাবেই দুর্ভিক্ষ হয়— ইহার প্রতিকার করার ক্ষমতাও মানুষের নাই। কিন্তু এই উত্তরেই কি সন্তুষ্ট থাকা যায়? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে তাকাইয়া দেখুন, সে-সব দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হইলে মানুষের ক্ষমতায় তাহা অবিলম্বে নিবারিত হয় এবং বর্ষে বর্ষে আমাদের দেশের মতো সে-সব দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হয় না। এক বাংলায় যে শস্য হয় তাহা সমগ্র ভারতবর্ষ দুই বৎসরে খাইয়া ফুরাইতে পারে না— তথাপি আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন?

ভারতের উপায়হীনতা

আমাদের দেশে যখন প্রচুর শস্য হয় তখন কোনোস্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে সেখানে অনায়াসেই শস্য পাঠানো যায় কিন্তু কার্যত তাহা কখনো হয় না। ইংলন্ডে যে শস্য জন্মে তাহাতে ২/৩ মাসের বেশি সে দেশের লোকের চলে না। সুতরাং অন্যদেশ হইতে শস্য আমদানী করিতে হয় এবং সে অন্যদেশ প্রধানতই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও এই দেশ হইতেই ইংরেজদের অভাব পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত শস্য রপ্তানী করা হয়। যতদিন না রপ্তানী বন্ধ হয় ততদিন ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ কিছুতেই নিবারিত হইবে না। কিন্তু ইহা বুঝা সত্ত্বেও আমাদের এমন অবস্থা যে, আমরা কোনোরূপেই রপ্তানী বন্ধ করিতে পারি না।

স্বরাজ একমাত্র মহৌষধ

এই-সব কথা বেশ ভালো করিয়া আলোচনা ও বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে যে, দেশের শাসন দেশের লোকের কর্তৃত্ব যতদিন না সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিনই আমাদিগকে এইরূপ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই-সমস্ত দুঃখকষ্টের একমাত্র মহৌষধ স্বরাজলাভ। কয়েকদিন পূর্বে উইলকক্স নামক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন যে বাংলার নদীনালার সংস্কার হইলেই বাংলার অবস্থা আবার উন্নত হইবে। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট এই-সমস্ত কথায় কর্ণপাত করেন না। স্বাস্থ্য, জলপথের সংস্কার বা অন্য কোনোরূপ দেশের মঙ্গলজনক কার্যের প্রস্তাব উঠিলেই গভর্নমেন্ট টাকার অভাব বলিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করেন। কিন্তু পুলিসের মশারি বা সেতু তৈয়ারির জন্য গভর্নমেন্টের কখনো টাকার অভাব হয় না। এই-সমস্তের একমাত্র কারণ এই-যে, গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে আদৌ বিশ্বাস করেন না। যদি গভর্নমেন্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে সৈন্য-বিভাগের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ না করিয়াও দেশের লোকের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু অবিশ্বাসের ভিত্তির উপর কোনো সাম্রাজ্য টিকিতে পারে না।

বিদেশী মনোভাব বর্জন করিতে হইবে

আমাদিগকে সর্বতোভাবে বিদেশী মনোভাব বর্জন করিতে হইবে। বিদেশের সবই ভালো, দেশের সবই মন্দ— এই ধারণা যাঁহাদের থাকে তাঁহারা দেশের জন্য কখনো ভাবিতে পারেন না। দেশের রাজনৈতিক উত্থানের জন্য মহিলাদের বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত। আমি মহিলাদের নিকট আবেদন করিতেছি, আপনারা দেশের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুন। স্বরাজ সংগ্রামের জন্য যুবকদের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। এই জেলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব দেখিয়া আমার বড়োই আশা হইতেছে।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই, যতদিন পর্যন্ত না দেশের লোক দেশের ভাগ্যবিধাতা হইতেছে, যতদিন না দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এই দেশে চিরস্থায়ী হইয়াই থাকিবে।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায়

এই কষ্টভোগ বন্ধ করার উপায় হইল সারা জেলায় নূতন কংগ্রেস কমিটি গঠন করা ; মুমূর্ষু কমিটিগুলিকে বাঁচাইয়া তোলা ও সকল রকম ব্রিটিশ পণ্য সাফল্যের সঙ্গে বয়কট করা। এখানে একটি কংগ্রেস কমিটি ছিল বলিয়া জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা তাহারা সকলের গোচরে আনিয়াছে ও সরকারও নড়িয়া বসিয়াছে। এখানে যদি কোনো কংগ্রেস সংগঠন না থাকিত তবে শত শত লোক মরিয়া গেলেও সরকার সেদিকে ফিরিয়াও চাহিত না।

আমি যদি দেশের প্রশাসনের কর্তৃত্বে থাকিতাম তবে এখানে উদ্দাম গতিতে যে দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহা সমূলে দূর করিয়া দিতাম। আমি শুধু দুইটি প্রতিরোধক ব্যবস্থা লইতাম, যেমন : ১. যতদিন দেশে দুর্ভিক্ষ থাকিবে ততদিন খাদ্য রপ্তানী করা হইবে না ; ২. দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের জন্য অন্যান্য স্থান হইতে খাদ্য আমদানী করা হইবে। জনসাধারণের দুরবস্থা না কাটিয়া যাওয়া পর্যন্ত আমি সরকারের পক্ষ হইতে সকল রকম সাহায্যও দিতাম।

২৯ মে ১৯২৮

দেশকে নেতৃত্ব দাও

২৯ মে ১৯২৮ দিনাজপুর শহরে থিয়েটার হলে কালীতলা ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন ও দিনাজপুর ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

স্বরাজের সংগ্রামে তোমরা দেশকে নেতৃত্ব দাও। তোমরা কংগ্রেস কমিটি গঠন করো। মেয়েরা মহিলা সমিতি গঠন করুন। তোমাদের পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার দেশে ও বিদেশে জাতি হিসাবে তোমাদের অবস্থা কী। বিদেশে তোমাদের সঙ্গে কুলির মতো আচরণ করা হয়, আর ভারতে তোমরা অনাহারে মারা গেলেও সরকার সহানুভূতি দেখানোর বদলে তোমাদের দুর্দশাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে ও প্রচার করিবে যে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নাই। শাসকদের মতে অনাহারে কাহারোও মৃত্যু হয় না, মৃত্যু হয় রোগে। যতদিন জাতির

ভাগ্য নির্ধারণ করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ শাসন ক্ষমতায় না অধিষ্ঠিত হইতেছেন ততদিন পর্যন্ত শাসকদের এই হৃদয়হীনতা চলিতে থাকিবে। বাংলার তরুণদের কাছে আমার অসীম প্রত্যাশা। আমি নিশ্চিত জানি স্বরাজের সংগ্রামে তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। তাহারা এই সংগ্রামকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে।

জাতীয় আন্দোলন

৩১ মে ১৯২৮ দিনাজপুর কংগ্রেস ময়দানে জনসভায় ভাষণ।

গত দুই বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের কাজ কর্মে ভাঁটা পড়িয়াছে। জনসাধারণকে কংগ্রেসের ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ করিতে নেতারা ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়াই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন দেশবন্ধু দাশের তিরোধানের ফলে কংগ্রেসের কাজকর্ম যে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নেতারা যদি দেশে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রচার করিয়া যাইতেন তাহা হইলে দেশবন্ধুর তিরোধানে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা কতকটা কাটাইয়া উঠা যাইত। যাহা হউক, বর্তমানে জীবন ও কর্মের লক্ষণ আবার দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে শুনিতে পাই যে অসহযোগ আন্দোলন শেষ হইয়া গিয়াছে, উহা ব্যর্থও হইয়াছে। আমি এই সমালোচকদের আরো একটু ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিব। এখনো বিচারকের রায় ঘোষণা করার সময় আসে নাই। অসহযোগ আন্দোলন এখনো চলিতেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা সমাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে তাড়িঘড়ি কোনো রায় দেওয়া উচিত হইবে না।

বাংলায় গত ত্রিশ বছরের জাতীয় আন্দোলনের ধারা আলোচনা করিলে তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব দেখা যাইবে। এক-একটি পর্বের মেয়াদ দশ বছর। মর্লেমিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্ব শেষ হয়। এক বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতা ও এক বিশেষ সম্প্রদায় এই শাসন সংস্কার গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তৃপ্ত হয় নাই। তাই আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পর্বে শুরু হইল বৈপ্লবিক যুগ। বিপ্লবীরা যে কর্মপদ্ধতি

গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভালো কি মন্দ সে আলোচনায় আমি প্রবেশ করিতে চাই না। তবে ইহা অস্বীকার করা চলে না যে দেশের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বৈপ্লবিক ও হিংসাত্মক পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। আবার দেশ দুইটি শিবিরে ভাগ হইয়া যায়— এক ভাগ শাসন সংস্কার স্বীকার করিয়া লয়, কিন্তু সমগ্রভাবে দেশ উহা মানে নাই।

তখন শুরু হইল তৃতীয় পর্ব। এই পর্বের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। এই আন্দোলন এখনো চলিতেছে এবং উহা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্কে মতামত জাহির করা সমালোচকদের পক্ষে সংগত হইবে না। এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে আমরা কতখানি আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি তাহার উপর।

তাই জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে আগামী দুই বৎসর খুব গুরুত্বপূর্ণ হইবে। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আগামী দুই বৎসর যে গুরুত্বপূর্ণ হইবে ইহা আমি কোন্ লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছি। এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলিব যে ১৯২০ সালেও দেশবাসীর একাংশ আমলাতন্ত্রের সংগে সহযোগিতা করিতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল। তাই ভারতীয় জনমতের যে ঐক্য আমাদের কাম্য তাহা তখন বাঞ্ছিত রূপে দেখা যায় নাই।

বিশ্ব পরিস্থিতিও তখন ভারতের অনুকূলে ছিল না। ইংলন্ড তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। তাহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটাইয়া গিয়াছে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইংলন্ডের যে অপরাজেয় অবস্থা ছিল আজ আর তাহা নাই। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক জাতি যে-কোনো মুহূর্তে আর-একটি যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার আশংকা করিতেছে ও সর্ব শক্তিতে সেই সংকটের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

ইংলন্ড নিশ্চয়ই আগামী বিশ্বযুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। বিশেষত তাহার যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মতো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিসামর্থ্য আর নাই। ভারত যদি ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলন নাও করিত তাহা হইলেও ইংলন্ডের শিল্পগুলির অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক থাকিত না। তাহা ছাড়া, ১৯২০ সালে ভারতের নেতাদের মধ্যে যে ঐকমত্য দেখা যায় নাই আজ তাহা দেখা যাইতেছে।

বিশ্ব পরিস্থিতি ভারতকে যে সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিয়াছে ভারত কি তাহা গ্রহণ করিবে না? সন্দেহ নাই যে ভারত দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে জর্জরিত হইতেছে। কিন্তু ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হইয়া নিরস্ত্র ভারতকে একটি নতুন অস্ত্র দান করিয়াছেন। যে দুইটি অস্ত্র দ্বারা ব্রিটেনকে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য করা যাইত তাহার মধ্যে একটি অস্ত্র ভারত গ্রহণ করিতে অক্ষম। দ্বিতীয় অস্ত্রটি হইল ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের দ্বারা কিভাবে ইংরেজকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা যাইবে। আমি তাঁহাদের জার্মানীর কথা মনে করাইয়া দিব। জার্মানী তখনো পরাজিত হয় নাই, ফ্রান্সের কিছু অংশ সে তখনো দখল করিয়া আছে;— এমন অবস্থায় জার্মানী শান্তি ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও জার্মানী যে শান্তি ভিক্ষা করিয়াছিল তাহার কারণ গোটা জার্মান সাম্রাজ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল ও জার্মানী তখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। জাতি হিসাবে আত্মহত্যা অনিবার্য হইয়া পড়ে, এবং উহা নিবৃত্ত করার আর কোনো উপায় ছিল না বলিয়াই জার্মানী শান্তি ভিক্ষা করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রও ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় না দেখিলে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতও তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামে, অনুরূপভাবে, সেই ব্যবস্থা খুব সহজেই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লইতে পারে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে ইংলন্ডে শিল্পে সাফল্যের চাবিকাঠি ভারতেই রহিয়াছে।

ইংলন্ডের দখলে ভারত ছিল বলিয়াই ইংলন্ড শিল্পে এত সাফল্য লাভ করিয়াছে। ইহা কি সত্য নয় যে ইংলন্ডে সারা বছরে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা ইংরেজদের দুমাসের খাদ্য জোগানোর পক্ষেও যথেষ্ট নয়? তাই সে অন্যান্য দেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়; ভারত তাহার ভান্ডার। ভারত হইতে খাদ্য কিনিতে যে অর্থ লাগে ইংলন্ড হইতে ভারতে শিল্পজাত পণ্য আমদানী করিয়া সেই টাকা সংগৃহীত হয়।

প্রতি বৎসর ভারত ব্রিটেনের নিকট হইতে ১১১ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য কেনে। ভারতে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় করিয়া এত প্রভূত পরিমাণ অর্থ জোগাড় করিতে পারে বলিয়াই ব্রিটিশ জাতি বাঁচিয়া আছে। এই টাকা যদি

ভারত হইতে আমরা বাহির হইতে না দিই তাহা হইলে কী অবস্থা দাঁড়াইবে ? সন্দেহ নাই সেক্ষেত্রে সাংঘাতিক সংকট দেখা দিবে। কারখানার মজুর ও শ্রমিকরা সংগে সংগে কর্মচ্যুত হইবে। তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারা প্রতিকার দাবি করিবে। তাহার ফলে ইংলন্ডে সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়া যাইতে পারে। ইংলন্ড এরূপ সংকটের আবর্তে পড়ুক এরূপ ইচ্ছা তিল মাত্রও আমাদের নাই। ধরাপৃষ্ঠে কোনো জাতি মৃত্যু বরণ করুক বা ধ্বংস হউক বা ক্লেশ ভোগ করুক ভারত তাহা চায় না। ভারত কোনো জাতিকেই আহত করিতে চায় না। ভারত নিজের কল্যাণ চায়। ভারত চায় স্বরাজ। তাহাতে যদি কোনো জাতির সামান্য ক্ষতিও হয় তবে সেজন্য ভারতকে তো দায়ী করা চলে না। এমন-কি ব্রিটেনের কোনো ক্ষোভ প্রকাশেরও অধিকার নাই— কারণ ভারত দীর্ঘকাল যাবৎ একটি মীমাংসায় আসার জন্য তাহার নিকট আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন তো সাড়া দেয় নাই। তাই ভারত যে পথে চলিতে শুরু করিয়াছে তাহা ছাড়া আর কোনো পথ আমাদের নাই। ইংলন্ড যদি ভারতের দাবি মানিয়া লয় তবে ভারতের স্বেচ্ছায় দত্ত সহযোগিতা লইয়া ইংলন্ড এমন-কি জগতে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি দেখা দিয়াছে তাহা বন্ধ করিতেও পারিবে।

ভারতের দাবি ন্যায়সংগত। ভারত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোনো অংশে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চায় না। ইংরেজরা ইংলন্ডে যে অধিকার ভোগ করে আমরা ভারতে সেই অধিকারই ভোগ করিতে চাই। যতদিন পর্যন্ত এই অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া না হয় ততদিন পর্যন্ত ভারতের আরব্ধ সংগ্রাম চলিবে। ভারত ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করিতে চায় ইংলন্ডকে দুঃখ দিবার জন্য নয়। নিজের কল্যাণ সাধনই তাহার উদ্দেশ্য।

বয়কট কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সারা দেশে নূতন নূতন কংগ্রেস কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে ও মুমূর্ষু শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র এই উপায়েই আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিব। সমগ্র জাতি যেদিন স্বাধীন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে সেদিনই স্বরাজ লাভ হইবে। কংগ্রেস জাতির সম্মুখে সময়ে সময়ে যে বিভিন্ন কর্মসূচী পেশ করিতেছে তাহার উদ্দেশ্য হইল জাতির চিত্তে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা, সারা দেশে স্বরাজের মানসিকতা সৃষ্টি করা। এমন লোক যদি থাকেন যাঁহারা অন্য পন্থায় বিশ্বাসী ও অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চান তাহাতে

কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু যাহা অনিবার্য ও গুরুতরভাবে দরকার তাহা হইল স্বাধীনতার মনোভাব. স্বরাজের প্রতি পাগল করা ভালোবাসা ছড়াইয়া দেওয়া। ইহা বিরাট কাজ। এই কাজের প্রচুর ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাই পন্থা লইয়া কলহ করার প্রয়োজন নাই। কখনো কখনো বিশেষ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার হয়। এই মুহূর্তে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট ও আরো খদ্দর উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। তাহার অর্থ এই নয় যে আমরা জাতীয় শিক্ষা, সালিশী বোর্ড বা জাতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন চাই না। সকল দিক হইতেই জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। দেশে সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। স্বাধীনতার মনোভাব জাগ্রত করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য লইয়া সর্বত্র প্রচার চালাইতে হইবে। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আশা এই যে ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশে আবার অসহযোগের মনোভাব ফিরিয়া আসিবে।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের কী দুর্দশা ঘটিয়াছে। সেদিন আমি পুণা সংগ্রহশালায় ঢাকাই মসলিনের নমুনা দেখিলাম। ইংরেজরা অন্যায় উপায় অবলম্বনের দ্বারা জোর করিয়া আমাদের এই শিল্পটিকে ধ্বংস করিয়াছে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ বস্ত্র গ্রহণ করিতে ভারতকে বাধ্য করা হইয়াছে। ভারতে বস্ত্রশিল্প ধংস করিতে ইংলন্ড যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারত প্রত্যাঘাত করিতে পারে নাই। যেদিন ব্রিটিশ বস্ত্র ভারতের বন্দরে উপনীত হইয়াছিল, অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ভারত সেদিন তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবসানের সেদিনই সূচনা হইয়াছিল। যে পরিমাণে বিদেশী পণ্য ভারতে বিক্রয় হইতে লাগিল, ভারতে বেকারের সংখ্যা সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। হাজার হাজার লোক, যাহারা একদিন বস্ত্র, চিনি, লবণ উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল, তাহারা অনাহারে থাকিতে লাগিল। জীবিকা সংগ্রহের কোনো উপায় তাহাদের রহিল না। এইভাবে এই প্রাচুর্যের দেশে, ভাগ্য যাহাকে নানা সম্পদে সাজাইয়াছে— সে দেশের সন্তানগণ অভাব অনটনে মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল।

আজ ৫০ কোটি টাকার বস্ত্র ইংলন্ড হইতে এ দেশে আমদানী করা হয়। ভারত যদি আজ এই আমদানীর বন্যা বন্ধ করিতে পারে, যদি তাহার নিজের চাহিদা মিটাইবার মতো বস্ত্র এখানেই উৎপাদন করিতে পারে, তবে সে তাহার

অগণিত সন্তানের কর্মসংস্থান করিতে পারিবে। যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দিনে দিনে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে তাহারও অনেকাংশে সমাধান হইবে।

বয়কট আন্দোলন চালাইয়া যাইতে ভারত দৃঢ়সংকল্প। তাহার মূল হেতু দুইটি: ১. জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা ২. স্বাধীনতা অর্জন। ইহা সত্য যে ১৯০৫ সালে ভারত যে-পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করিত এখন সে তুলনায় বেশি বস্ত্র উৎপাদন করে। সে সময় খদ্দর ছিল না, ছিল শুধু কয়েকটি মাত্র কারখানা। এখন সব জায়গায়ই খদ্দর পাওয়া যায়। বছরে ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের খদ্দর দেশে উৎপন্ন হইতেছে। বাংলায় বছরে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হয়। তাহা ছাড়া দেশে বেশ কয়েকটি কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় সংস্থাগুলি স্বদেশী বস্ত্রের আরো চাহিদা মিটাইতে পারিবে। অতএব স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা দেশে আগে বাড়াইতে হইবে।

মহিলাদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা আন্তরিক আগ্রহে চরকা গ্রহণ করুন। ভারত এখন সংকটজনক অবস্থায় আছে। আপনারা পুরা দমে কাজ করুন। যুবকরা কংগ্রেসের কাজে যোগ দাও। সারা দেশে তোমরা খদ্দর ও বয়কটের বাণী প্রচার করো।

বালুরঘাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সেখানে অসহায় অবস্থায় লোক জীবন যাপন করিতেছে। তাহারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়িতেছে। যতদিন পর্যন্ত দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন মাঝে মাঝেই এ রকম সংকটে আমাদের ভুগিতে হইবে। ভারত স্বাধীন হইবেই। সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা কত শীঘ্র আসিবে তাহা নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের উপর। যে পরিমাণে আমরা জাতির জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিব স্বাধীনতা তত দ্রুততর গতিতে লাভ করিব। পুরুষ ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান— ভারতীয় জাতি ইহাদের লইয়াই গঠিত। তাহাদের সকলকেই স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। স্বাধীনতা সুলভ জিনিস নয়, উহা ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীও নয়, স্বরাজের জন্য আপনারা সবাই সর্বান্তঃকরণে ও অবিচ্ছেদে কাজ করুন।

পল্লীর রূপ— বাংলার রূপ

৫ জুন ১৯২৮ মুড়াগাছায় প্রদত্ত ভাষণ।

পল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া বড়ো আনন্দ পাইলাম ; দেশের প্রাণ পল্লীর ভিতরেই পাওয়া যায়। দেশের দুঃখকষ্টও পল্লীর ভিতরে পাওয়া যায়। পল্লীর রূপ— সমস্ত বাংলার রূপ।

অধোগতির কারণ

পল্লীর আজ সকল দিক দিয়া অবনতি। গ্রামের উদ্ধারের জন্য এই অধোগতির কারণ জানা দরকার। অধোগতির প্রধান কারণ আমলাতন্ত্রের শাসনের সঙ্গে শোষণ। যারা বিদেশ হইতে আসিয়াছে তাহাদের প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্যের বিস্তার।

স্বাধীনতা সঞ্জীবনী সুধা

মৃতসঞ্জীবনী সুধা আনিয়া আজ জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের সংকল্প সেই মৃতসঞ্জীবনী সুধা। সামাজিক ও রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে আমরা আজ মুক্তি চাই। এই মুক্তির মূলে স্বাধীন হইবার প্রেরণা।

অর্জুনের ক্লৈব্য

ক্লৈব্য আসিয়া আমাদের দেশকে আজ আক্রমণ করিয়াছে। এমনি ক্লৈব্য একদিন কুরুক্ষেত্র-সমরের পূর্বে অর্জুনকেও আক্রমণ করিয়াছিল। এই ক্লৈব্যের জন্যই অর্জুনের মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। দেশের অনেক লোকের মনে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সংশয় জাগে তাহার কারণ অর্জুনের ক্লৈব্য।

শক্তি নিজের মধ্যে

আমাদের নিজেদের মধ্যে অসীম শক্তি আছে ; আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোর উৎস আছে। সেই আলোকে আমাদিগকে মুক্তির পথ চিনিয়া লইতে হইবে।

দারিদ্র্যের কারণ

ব্রিটিশ জাতি আমাদের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করিয়াছে। ১১১ কোটি টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আসে। শুধুমাত্র কাপড়ের জন্য বিলাতকে আমরা

৫৫ কোটি টাকা দিয়া থাকি। নিজের দেশে আমরা নুন পর্যন্ত তৈয়ারি করিতে পারি না— তাও বিদেশ হইতে আসে।

বর্জন ও প্রতিষ্ঠা

মুক্তি পাইতে হইলে চাই একই সঙ্গে বর্জন ও প্রতিষ্ঠা। বিদেশের বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পবস্তু আমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে। আর-এক দিক দিয়া স্বদেশী শিল্প আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দেশের লোককে হত্যা করা

বিলাতী ক্রয় করার ফল দেশের লোককে হত্যা করা। ঘরের পাশে তাঁতি জোলা কাটুনি শুকাইয়া মরে— তাহারা খাইতে পায় না— অথচ পরের কাপড় কিনিতে যখন আমরা দ্বিধা করি না তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে নরহত্যা করি।

খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা

খদ্দর একলক্ষ লোককে পালন করিতেছে। যেদিন আমরা বিলাতী বস্ত্র বর্জন করিতে পারিব সেদিন আমরা এক কোটি লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইব।

৫ জুন ১৯২৮

নির্বাচন : মিথ্যা রটনা

৮ জুন ১৯২৮ নদীয়ায় মেহেরপুর স্কুল-প্রাঙ্গণে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মান আমি শিরোধার্য করিতেছি কেননা এই সম্মান আমাকে করা হইতেছে না— এই সম্মান করা হইতেছে একটা আদর্শকে, যাহাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে যুবকদের সহায়তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যুবকদের মধ্যে কী শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহা তাহারা জানে না। তাহাদিগকে সংহত করিয়া এই সুষুপ্ত শক্তির উদ্‌বোধন করিতে হইবে।

যুবকদের ইহা বোঝা উচিত যে, তাহারা মরিয়া হইয়া দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ না করিলে ভারতের মুক্তির আশা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

ব্যবস্থাপক সভায় বসিবার ব্যবস্থা দেখিয়া ইহা বেশ বোঝা যায় যে, সভায় ও দেশে দুইটা মাত্র দল আছে। একটা সরকারী দল ও আর-একটা জনসাধারণের দল। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ পক্ষে ভোট দিলে বাস্তবিক জনসাধারণের উপকার হইবে।

গুজব রটিয়াছে, শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী কংগ্রেসকে ঘুষ দিয়া কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে আমি বলিতেছি যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহা কংগ্রেসের বিরুদ্ধপক্ষের মিথ্যা রটনা।

কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী, নির্বাচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং সকলকেই ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ করিতে হইবে। দেড় বৎসর বাদেই আবার নির্বাচন হইবে ; সুতরাং ইতিমধ্যে বর্তমান প্রার্থীর পরীক্ষা হইয়া যাইবে। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহা হইলে আগামী নির্বাচনে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা যাইবে।

শাসন-সংস্কারের একমাত্র সুফল ভোট দিবার অধিকার লাভ। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাঁহাকে ভোট দিলে দেশের অপকার না হয় তাঁহাকে ভোট দিতে হইবে। সকল স্থান হইতে কংগ্রেসের মনোনীত লোকদিগকে ভোট দেওয়ায় গভর্নমেন্টের বর্তমান শাসনপদ্ধতিতে দেশের লোক যে অত্যন্ত বিতৃষ্ণ হইয়াছে ইহা বেশ বোঝা যায়।

নির্বাচন

৮ জুন ১৯২৮ চুয়াডাঙা শহরে হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় ইউনিয়ন বোর্ড ও ইয়ংমেন্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

আপনাদের প্রদত্ত সম্মান আমি গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি, কারণ আমি জানি, এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানানো হইতেছে না— যে আদর্শ লইয়া আমি দাঁড়াইয়াছি সেই আদর্শকেই আপনারা সম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

আমাদের লক্ষ্য লাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাময় শক্তি হইল যুবকদের আদর্শবাদ। সেই শক্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে ও জড়তার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। উহাকে সংগঠিত করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যুবকদের উপলব্ধি করিতে হইবে যে তাহারা যদি চরম দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত না হয় তবে ভারতের মুক্তি অলীক থাকিয়া যাইবে।

এখানে একটি উপনির্বাচন হইবে। বিধান পরিষদের সদস্যদের আসন যেভাবে সাজানো হইয়াছে তাহাতে ইহাই স্বীকৃত যে বিধান পরিষদে ও দেশে দুইটি পক্ষ আছে— এক পক্ষ জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম-রত, অপর পক্ষ জনস্বার্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ভোটদাতাদের স্বার্থ কোন্ পক্ষের সঙ্গে জড়িত তাহা তো সহজেই ও এক কথায় বোঝা যায়।

একটি ভিত্তিহীন গুজব রটিয়াছে যে শ্রীযুক্ত পালচৌধুরী কংগ্রেসকে ঘুষ দিয়া মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছি। দেশবন্ধু বলিতেন: 'কঠোর সংগ্রাম করো, কিন্তু নির্মল থাকিয়া সংগ্রাম করো।' আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই বাণী মানিয়া চলিতেছি।

কংগ্রেস একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। ইহার লক্ষ্য ও আদর্শ চিরস্থায়ী তাই আমরা সর্বপ্রথম ইহা বিবেচনা করিয়া চলি যেন কোনোমতেই এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠীর আর-একটি নির্বাচনী অপপ্রচার এই যে কংগ্রেস যদি শ্রীযুক্ত ইন্দু ভাদুড়ীকে মনোনয়ন দিত তবে মিঃ মুখার্জি নির্বাচনে দাঁড়াইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মনোনয়ন পত্র জমা দিবার পর মিঃ মুখার্জি এই-সব কথা তুলিতেছেন।

কংগ্রেস প্রার্থী শপথ লইয়াছেন যে বিধান পরিষদে প্রতিটি বিষয়ে কংগ্রেস পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি ভোট দিবেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল যখন পরিষদে বিবেচিত হইবে তখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তিনি মানিয়া চলিবেন।

আমি ভোটদাতাদের মনে করাইয়া দিতেছি দেড় বছর পরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে বর্তমান প্রার্থীকে সুযোগ দিতে হইবে। তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তবে আগামী নির্বাচনের সময় তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

তথাকথিত শাসন-সংস্কারের ফলে একমাত্র যাহা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা

হইল এই ভোট দানের অধিকার। এই অধিকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ইহা পবিত্র ন্যাস স্বরূপ। দেশ যাহাতে লাভবান হয় তাহা বিবেচনা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। কংগ্রেস বা কোনো কোনো ব্যক্তি ভুল করিতে পারে কিন্তু দেশ তো কোনো অপরাধ করে নাই। তাই ভোটের অধিকার এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয় যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। কংগ্রেসকে গালি দিয়া লাভ নাই। কংগ্রেস কি ? সে তো আপনাদের ও দেশবাসীকে লইয়াই গঠিত।

প্রতিটি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিয়া ভোটদাতারা জানাইয়া দিয়াছেন যে বর্তমান শাসনপদ্ধতিকে তাঁহারা আদৌ সমর্থন করেন না ও তাঁহারা ইহাতে বীতশ্রদ্ধ।

সম্প্রতি বাঁকুড়া ও বালুরঘাটে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্ব বিষয়েই দেশে সংকট। এই সর্বনাশা শোষণমূলক ব্যবস্থার দ্রুত অবসান ঘটানো দরকার। ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট করিতে পারিলে এই ব্যবস্থাকে মারাত্মক আঘাত দেওয়া যাইবে।

স্বাধীন হইবার দৃঢ় সংকল্প চাই

১০ জুন ১৯২৮ কৃষ্ণনগর টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

বাংলার সংস্কৃতিতে নদীয়ার অবদান সবচেয়ে বেশি। নদীয়া বাংলাকে দিয়াছে অদ্বৈতবাদ, তন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র। কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট অংশের মতোই নদীয়াও আপন মহিমা ভুলিয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু বলিতেন যে বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। নবজাগরণ না ঘটিলে আর আশা নাই। কেহ কেহ বলেন, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার না হইলে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের শাসকরাও একই সুরে কথা বলেন। তাঁহারা আরো বলেন যে ভারতে বহু ভাষাভাষী ও বহু বিচিত্র জাতি বাস করে, তাই ভারত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করার যোগ্য নয়। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে আমরা কী দেখিতে পাই? সুইজারল্যান্ডে সাতটি ভাষা প্রচলিত আছে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় আছে পাঁচটি ভাষা।

যদি ধর্মসম্প্রদায়ের কথা বলা হয় তবে আয়ার্ল্যান্ড, ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কি রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা কলহ করে নাই?

যদি শিক্ষার অভাবের কথা বলা হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিব দেড় শত বৎসর আগে ইংলন্ডে শিক্ষিতের হার কী ছিল? আফগানিস্তান, বুলগেরিয়া, রুমানিয়ায় বর্তমানে শিক্ষিতের হার কত?

তারপর সমাজ-সংস্কারের কথা। আমি জানি ভারতে অস্পৃশ্যদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার অবস্থা কী? সে দেশে রেস্তরাঁয় ও বিশ্রামাগারে কুকুর বিড়াল প্রবেশে নিষেধ নাই, কিন্তু নিগ্রোদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সে দেশে যখন এই-সব জিনিস চলে তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করার স্পর্ধা মিস মেয়ো পান কিভাবে? এই-সব সমালোচনা ও কুৎসা আমাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নয় করা হয় বিশ্বসমক্ষে আমাদের হেয় করার উদ্দেশ্যে।

সমালোচকরা আমাদের শিল্পের উন্নতি ঘটানোর কথা বলেন। এক শতাব্দী আগে, শিল্পবিপ্লবের পূর্বাহ্ণে ইংলন্ডের অবস্থা কেমন ছিল?

একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে আফগানিস্তানকে পরাধীন করা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ বিদেশী আক্রমণ ঘটিলে আফগানিস্তানের প্রতিটি পুরুষ, নারী, এমন-কি শিশুও শত্রুর সংগে লড়াই করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান

হইবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন হইবার দৃঢ় সংকল্প না দেখা দেয় ততক্ষণ ভারতের স্বাধীনতা লাভের কোনো আশা নাই।

কংগ্রেসের সামনে গঠনমূলক কর্মসূচী আছে। কিন্তু উহা ব্যাপকভাবে রূপায়িত করিতে হইলে কাজের স্বাধীনতা অবশ্যই চাই। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ থাকা দরকার। সরকারের সঙ্গে সংঘাত না হইলে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ জাগিবে না। উৎসাহ না জাগিলে গঠনাত্মক কাজও চালাইয়া যাওয়া যায় না। এই উদ্দেশ্য লইয়া, যে-সব সরকারী দুর্গ আমাদের মধ্যে খাঁটি মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে-সব দুর্গ দখল করিতে হইবে।

আইন পরিষদেও গঠনাত্মক কাজ করা যায়। সেখানে নির্ভীকভাবে জনমত ব্যক্ত করিতে হইবে। বহির্বিশ্বের কাছে সরকারের ভণ্ডামি এইভাবে খুলিয়া ধরিতে হইবে।

নদীয়ার ভোটদাতাদের কাছে সাইমন কমিশনের প্রশ্নটিও একটি বিবেচ্য বিষয়। এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসাধারণ যদি জয়লাভ করে তবে আমরা বর্তমান বিধান পরিষদ ভাঙিয়া দিয়া, সাইমন কমিশনের প্রশ্নে বাংলার জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে, সরকারকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে চ্যালেঞ্জ জানাইব।

শ্রীরণজিৎ পালচৌধুরী নাকি কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইবার জন্য কংগ্রেসকে ঘুষ দিয়াছেন। আমি এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্য ক্ষণিকের নয়। আমরা আপনাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে আবার আপনাদের কাছে আসিব। জনসাধারণকে প্রতারিত করার কথা আমরা ভাবিতেই পারি না। ১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের সময় একজন কোটিপতি মেয়র পদের বিনিময়ে কংগ্রেসকে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুকে আমাদের অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। তিনি এক লক্ষ টাকার তুলনায় অনেক বড়ো সম্পদ ছিলেন। তাই ঐ প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম।

কংগ্রেস শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীকে কেন মনোনয়ন দেয় নাই এ প্রশ্নও উঠিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কোনো ধনী ব্যক্তি আগাইয়া আসিলে কংগ্রেসকেও একজন ধনী প্রার্থী দাঁড় করাইতে হয়। গত সাধারণ নির্বাচনের সময় নদীয়া কংগ্রেসে যে আভ্যন্তরীণ

কলহ দেখা দিয়াছিল তাহাও মিটাইয়া ফেলা দরকার। বর্তমানে কংগ্রেস যেভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করে তাহা আপসের ও দলীয় ভুলবোঝাবুঝি মেটানোর প্রয়াস মাত্র।

আমরা ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। যখন বাংলার কোথাও দুর্ভিক্ষ হয় তখন সরকার দার্জিলিঙে আরাম করিয়া বসিয়া থাকেন। আর নির্লজ্জ ও দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত বিবৃতি বাহির করেন। উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় সরকারী সাহায্য চাওয়া হইলে সরকার এই গাত্রদাহকর উত্তর দিয়াছিলেন যে সরকার তো আর দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়।

তৎসত্ত্বেও জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতীয় মহত্ত্ব রক্ষিত হইতেছে। সেদিন গামা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানকে পরাস্ত করিয়াছেন। আলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় হকি দল চমকপ্রদ ফল করিয়াছে। ইউরোপের সকল দেশে তাহাদের প্রশংসা হইয়াছে। যখন আমাদের তরুণরা মৃত্যুকে জয় করিবে তখন স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত হইবে।

ভাষণ

১

কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া সেবক সংঘে প্রদত্ত।

সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলার উপর আমার অসীম আশা আছে এবং ততোধিক আশা আছে বাংলার তরুণগণের উপর। বাংলার তরুণগণের মধ্যে ভাবের প্রেরণা, প্রাণের চাঞ্চল্য প্রচুর আছে কিন্তু আমি চাই যে বাংলার তরুণ যেন চরিত্রে, স্বাস্থ্যে, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে। বাংলার তরুণগণকে জয়যাত্রায় বাহির হইতে হইবে। দেশের যাহা-কিছু সবই এই তরুণগণের উপর নির্ভর করিতেছে। বাংলার তরুণগণের সম্মুখে এক বিপুল আদর্শ আছে। কিন্তু আদর্শকে জানিলেই শুধু হইবে না তাহাকে পাইতে হইবে এবং তাহা পাইতে হইলে তাহাকে কঠিন সাধনা করিতে হইবে। এই সাধনাই তাহাকে তাহার আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবে।

জুন ১৯২৮

২

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক মানপত্র প্রদান ও অভিনন্দনের উত্তর।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলি স্বায়ত্ত-শাসনের ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্য দিয়া আমরা দেশ-শাসনের শিক্ষা লাভ করিব। যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেই আমরা দেশ-শাসনের উপযুক্ত হইতে পারিব। মিউনিসিপ্যালিটিগুলি রোগ দূর, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা প্রভৃতির অনেক কিছু উন্নতি করিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটি যেন তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া শহরের উন্নতির চেষ্টা করেন।

১০ জুন ১৯২৮

৩

কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে প্রদত্ত।

বাংলাদেশ ভারতের মূলগত ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নদীয়ার দান তাহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও নব্য-ন্যায়···। বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা ক্রমাগতই আমাদের অযোগ্যতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এই কথা শুনিয়া শুনিয়া সত্যই আমরা নিজেদের শক্তি ভুলিয়া গিয়াছি। যেহেতু আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি নাই— আমরা স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত নই। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের এখন যাহা আছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি লইয়া অনেক দেশ পূর্বে স্বাধীন ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু তাহাদের বেলায় যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা উঠে নাই— কেবল প্রশ্ন উঠে আমাদের বেলায়। কেননা, আমাদের কর্ণে বারম্বার এই কথা বলিয়া আমাদের অচেতন করিয়া রাখাই যে কর্তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ, যে, স্বাধীনতালাভের জন্য নানা জনে নানা পন্থার কথা বলেন কিন্তু স্বাধীনতালাভের কোনো নির্দিষ্ট পন্থা নাই। যদি আমরা পরাধীনতার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে পারি তবেই আমরা স্বাধীনতা পাইব। পথ তখন আপনিই আসিবে। কংগ্রেসের দুইটি কাজ আছে। প্রথম গঠনমূলক কাজ ও দ্বিতীয় সংগ্রামের ভাব জাগরিত করা। এই সংগ্রাম-ভাবের জন্য কংগ্রেস দল কাউন্সিল দখল করিয়াছিলেন। সংগ্রাম মানে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ নয়— গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিরোধিতা। কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে এই সংঘর্ষের উদ্দীপনাই গঠনমূলক কার্যকে অগ্রসর করিয়া দিবে। তরুণগণের উপরেই দেশের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে।··· দৃঢ় সংকল্পে অবিচলিত থাকিয়া মৃত্যুভয় জয় করিয়া হাজার হাজার যুবক যখন অগ্রসর হইবে তখন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল খসিয়া যাইবে।

১০ জুন ১৯২৮

৪

নদীয়ার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

১২ জুন ১৯২৮ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি ও বিবুধ-জননী সভা কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

নদীয়ার দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও নব্য-ন্যায় ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার দুইটি বিশেষ দান। নবদ্বীপ ন্যায় ও প্রেমের অপূর্ব মিলনস্থান। দেশবন্ধু এইরূপ মিলনের মূর্তি ও আদর্শ স্বরূপ ছিলেন।

দেশবন্ধু দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, কিন্তু তিনি আশা ও বিশ্বাস করিতেন যে, তাহাদের অতীত গৌরবের অনুভূতি একদিন ফিরিয়া আসিবেই এবং সেইদিন জাতীয় স্বাধীনতালাভ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা যদি ভারতকে স্বাধীন করিতে ও আমাদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে চাই, তাহা হইলে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া তাহাকে শক্তিশালী করা আমাদের কর্তব্য। কংগ্রেসের দ্বার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের নিকট মুক্ত; হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র, সকলেই কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন। সেখানে আপনি আপনার সত্তা ভুলিয়া গিয়া সমগ্র দেশের জন্য কাজ করিবেন।

শাসক ও শোষিতের অর্থ এক নহে। শাসকের লক্ষ্য নিজেদের ব্যবসাবৃদ্ধি অর্থাৎ এ দেশের আর্থিক শোষণ।

নদীয়া উপনির্বাচনে অন্যতম সদস্যপ্রার্থী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছেন। ইহাতে তিনি যে গভর্নমেন্ট দলের লোক তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

যে দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে লোকসকল বাজারের পণ্যের মতো আপনাদের প্রিয়জনকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং যেখানে বিদেশী গভর্নমেন্ট জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে, সেখানে কি শাসকবৃন্দ ও জনসাধারণের স্বার্থ এক হইতে পারে?

আমরা কেবল ভোটাধিকার পরিচালনা দ্বারাই গভর্নমেন্টের সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা কী তাহা গভর্নমেন্টকে জানাইয়া দিতে পারি। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত ভোট প্রদান করা উচিত। আগামী ১৬

জুন নদীয়া উপনির্বাচন সম্পর্কে ভোট গৃহীত হইবে। ঐ দিন পুণ্যস্মৃতি দেশবন্ধুর মৃত্যু-বার্ষিকী। বাংলায় কংগ্রেস, বিশেষ করিয়া কাউন্সিল পার্টি গঠনে তিনি কী করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারো অবিদিত নহে। এখন যদি আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের কি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইবে না? তিনি যে কংগ্রেসকে এত ভালোবাসিতেন সেই দল যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে পরলোকগত দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

দেশবন্ধুর জীবনী ও শিক্ষা

১৮ জুন ১৯২৮ সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট হলে নিখিল-বঙ্গ-যুবক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আমাদের যুবক সমিতির সম্পাদক নরেশবাবু দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবসে কিরূপ ভাবে কাজ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যখন আমার নিকট গমন করেন, তখন আমি প্রস্তাব করি, গতানুগতিকভাবে দেশবন্ধুর মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন না করিয়া এই পুণ্য দিবসে তাঁহার মহিমাময় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবে। দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দেশবন্ধুর জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অতি সুন্দর রূপে আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাব করার ভার সর্বপ্রথম আমার উপরই পড়ে। আমি এখনো দেশবন্ধু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার উপযুক্ত হই নাই। তাঁহার জীবন এত গভীর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল যে, আমি তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম করিতে পারি নাই। বহুদিনের আলোচনার পর তবে তাঁহার গৌরবময় জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। তথাপি শুধু গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ আমিই এই কাজ আরম্ভ করিলাম। যাহা আমি বলিব, তাহাতে লোকের মনে দেশবন্ধু সম্বন্ধে চিন্তার উদ্রেক হইলে আমার আজিকার বলা কিছু সার্থক হইবে।

দেশবন্ধুর জীবনের বৈচিত্র্য

দেশবন্ধু সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায়, তাঁহার জীবন বৈচিত্র্য-পূর্ণ ছিল। অন্যান্য মনীষীদের সহিত তুলনায় তাঁহার মন গতিশীল ছিল। তিনি কখনোই একটা নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহাতেই দেশের লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার জীবনে এমন কতকগুলি উপাদান ছিল যাহার জন্য সকলেই মুগ্ধ হইত। প্রথম উপাদান এই মানুষ যাহাকে আদর বা সম্মান দিতে চায়, তাহার মধ্যে মানসিক প্রতিভার একটা আদর্শ থাকা চাই। শুধু ইহা থাকিলেই চলিবে না— হৃদয় থাকা চাই। কেবল তাহাই নহে— হৃদয় উদার হওয়া চাই। বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। অনেকেই ইহা তাহার দুর্বলতা বলিয়া

আখ্যাত করেন। কিন্তু আমি ইহাতে তাহার কোনো দোষ দেখি না। আমরা এই হৃদয়ের মধ্যে একটা সাহস, বীর্য এবং পৌরুষ চাই। দুর্বল হইলে চলিবে না। যদি কেহ নিজ চরিত্রে এই তিনটি বিষয়ের অর্থাৎ মানসিক প্রতিভা, হৃদয় এবং পৌরুষের সমন্বয় করিতে পারে তবেই তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ, তবেই সকলে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবে। ইহাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। দেশবন্ধুর চরিত্রে এই তিন বিষয়ের সমন্বয় হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব।

দেশবন্ধুর জীবনের আদর্শ

জীবন সম্বন্ধে দেশবন্ধুর কী আদর্শ ছিল তাহা দেখিতে হইবে। তিনি নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেন— অর্থাৎ, তিনি বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করিতেন না। বাৎসল্য রস, সখ্যরস ইত্যাদি তিনি স্বীকার করিতেন। যিনি বৈদান্তিক, মায়াবাদী— তিনি 'নেতি' 'নেতি' করিয়া চরম সত্যে উপনীত হন। যেগুলি 'নেতি' 'নেতি' করিয়া করেন, সেগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। বৈষ্ণব এই-সব অস্বীকার করেন না। তিনি 'এহ বাহ্য' "এহ বাহ্য" বলিয়া চরম তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হন। যখন বৈষ্ণব সাধক উচ্চতর সত্যে পেঁছেন, তখন তিনি বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেন না। চরম সত্যে পেঁাছিলেও সাধক বাস্তব-জগতের বাৎসল্য রস, সখ্য রস ইত্যাদি গ্রহণ করেন— অস্বীকার করেন না। তিনি এগুলি অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। সমগ্র জগৎই তাঁহার নিকট অন্য রূপে দেখা দেয়।

রূপান্তরের কথায় দেশবন্ধু এই-সব কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনে এই-সব' বিষয়ে উপলব্ধি না হইলে তিনি তৎসমুদয় লিখিতে পারিতেন না।

একের সহিত বহুর মিলন : বাংলার বৈশিষ্ট্য

বাস্তবিক এই সত্য অস্বীকার করিলে চলিবে না, পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দও সত্যই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, মানুষ কখনোই অসত্য হইতে সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না— সে উচ্চ সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে পেঁছায়। সত্যের কোনো স্তরকেই সে অস্বীকার করে না। এক যেমন সত্য, বহুও তেমনি সত্য। একের সহিত বহুর মিলন— ইহাই সাধকের সাধনা। এই সম্মিলনই বাংলার বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে যত

সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যের সমন্বয় করিয়া বাংলাদেশকে গৌরবময়, বৈচিত্র্যময় এবং সুন্দর করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিম, ভূদেবও এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই মত নূতন নয়। যে উৎস হইতে দেশবন্ধু তাঁহার চিন্তাধারা পাইয়াছিলেন, তাহার আরম্ভ ভূদেব বঙ্কিম হইতে। তাঁহারা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, দেশবন্ধু তাহাই নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বাংলার গৌরবময় যুগ বৈষ্ণব যুগ

বৈষ্ণবযুগ বাংলার গৌরবময় যুগ। মহাপ্রভুর ভিতর দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই যুগে দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের সমন্বয় হয়।

বৈষ্ণব মহাপ্রভু, তান্ত্রিক আগমবাগীশ, স্মার্ত রঘুনন্দন এবং নৈয়ায়িক শিরোমণি একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে বাংলার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। দেশবন্ধু বলিতেন, ইঁহারা নবদ্বীপ-ধামে ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলায় ভাগবত, তন্ত্র, স্মৃতি এবং নব্য-ন্যায়ের মিলন সাধিত হইয়াছিল। এই যুগ বাংলার গৌরবময় যুগ। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, ইহা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন। তথাপি তিনি বিশ্বাস করিতেন, বাঙালীর সেই পূর্বশিক্ষাদীক্ষা-পরিপূর্ণ গৌরবময় যুগ আবার ফিরিয়া আসিবে।

অন্ধকার যুগ

তার পর অন্ধকার যুগ। এই যুগে ইংরেজদের আগমন। এই যুগে মেকলে প্রমুখ যেভাবে বাঙালীকে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল ইহাই বুঝি বাঙালীর প্রকৃত রূপ। মেকলের সহিত যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল তাঁহারা সে অন্ধকার যুগেও আদর্শ বাঙালী নহেন। যাহা হউক, মেকলের বর্ণিত সমস্ত চিত্র অমূলক এবং অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বাংলার নবজাগরণ : ভারতীয় জাতীয়তার তত্ত্ব

তার পর বাংলার নবজাগরণ। রামমোহনের আমল হইতে এই যুগের আরম্ভ। আমাদের জাতীয় সভ্যতার মূল উৎস হইতে এই নবজাগরণের ধারা উৎসারিত। একের সহিত বহুর সমন্বয়— ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের গোড়ার কথা।

ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শের মধ্যেও এই ভাব রহিয়াছে। আমরা কিছুই ধ্বংস করিতে চাহি না। সমস্তই সত্য, শুধু স্তরভেদ। একও সত্য, বহুও সত্য। ইহাই জীবনের তত্ত্ব। যাহা আমাদের জীবনের তত্ত্ব, তাহা আমাদের জাতীয়তারও তত্ত্ব। যাহা আমাদের জীবনের ধর্ম, তাহা আমাদের জাতীয়তারও ধর্ম। বহুত্বের সহিত একত্বের এবং একত্বের সহিত বহুত্বের সমন্বয়— ব্যক্তির জীবনের ন্যায় জাতির জীবনেরও ইহাই মূলতত্ত্ব, ইহাই বাঙালীর প্রাণের কথা। বাংলার এই প্রাণের কথার প্রকাশ আরম্ভ হয় বঙ্কিম-সাহিত্যে। তারপর দেশবন্ধুর প্রাণে এই কথাটা ফুটিয়া উঠে।

বিশ্বজনীন সভ্যতায় বৈচিত্র্য

একটা কথা আরম্ভ হইয়াছে যে, বিশ্বজনীন সভ্যতায় বৈচিত্র্য থাকা উচিত নহে। আমি ইহা স্বীকার করি না। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও এ সমুদয়ের সংমিশ্রণে এবং সমন্বয়ে এক বিশ্বজনীন ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে। 'নারায়ণে' এবং পরে 'বাংলার কথা'য় দেশবন্ধু এই কথাই প্রচার করিয়াছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র দেশ। এখানে বিবিধ ভষা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ জাতীয়তা গঠিত হইয়াছে। সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া একটা অসাড় সমন্বয় করিয়া একটা নূতন জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে— ইহা দেশবন্ধু স্বীকার করেন নাই। বাংলার তন্ত্র, ভাগবত, এবং ন্যায়— ইহারই উপর দাঁড়াইয়া আমাদের বহুর মধ্যে একত্বের সাধনা করিতে হইবে। দেশবন্ধু ইহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক রক্ত ও চিন্তার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়

যুগের পর যুগ এ দেশে অনেক জাতি— গ্রীক, শক, হূন প্রভৃতি আসিয়াছে। কাজেই আমাদের মধ্যে বিবিধ জাতির রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের উন্নতির কারণ— আমার মনে হয়— এই সমন্বয় বা সংমিশ্রণ।

ধর্মে সমন্বয়

প্রাচীন বৈদিক ধর্মের সহিত বর্তমান কালের ধর্ম পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহারও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। হর-গৌরী, হরি-হর, কালী-শিব ইত্যাদি মূর্তি কল্পনা শিল্পের মধ্য দিয়া সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কালে কালে যুগের প্রয়োজনে একটা ক্রমবিকাশ, সমন্বয় এবং মন্ত্র-সংমিশ্রণ চলিয়াছে। এইভাবে জাতি নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। জাতি জীবিত কি মৃত তাহার পরীক্ষা হইতেছে— চিন্তাজগতে কোনো নূতন সৃষ্টি হইয়াছে কি না। চিন্তায় গতিহীনতার ভাব আসিলেই বোঝা গেল জাতি মরিয়াছে।

দেশবন্ধুর হৃদয়ের প্রসার

দেশবন্ধুর জীবনে এই সমন্বয় দেখা দিয়াছিল, তাই তাঁহার হৃদয় এত বড়ো হইয়াছিল। তিনি বহু দান করিয়াছেন— অনেক সময় অপাত্রে অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রভূত অর্থ দিয়াছেন। প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিতেন: 'দান করাই আমার অধিকার, গ্রহীতার গুণাগুণ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।' ইহার কারণ তাঁহার হৃদয়ে সমন্বয় ছিল। তাঁহার হৃদয়ে সকলেরই স্থান ছিল।

দেশবন্ধুর জীবনের ঘটনাবলী : বিভিন্ন ভাবের বিকাশ

দেশবন্ধুর জীবনের ঘটনা আমি সব জানি না। তাঁহার শেষ জীবনে মাত্র কয়েক বৎসর তাঁহার সাহচর্য করিতে পারিয়াছিলাম।

প্রথম জীবনে তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। ক্রমে তিনি সত্য-শিব-সুন্দরের উপলব্ধি করিতে থাকেন। বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে ডুবাইয়া দেন। তারপর বেদান্তের মায়াবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করে। তারপর বৈষ্ণবভাব। তাঁর জীবনে বৈষ্ণবের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ পরিলক্ষিত হয়।

তিনি এইভাবে আগাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই চরম সত্যে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে অতি আশ্চর্যরূপ ক্রমবিকাশ দেখা গিয়াছিল।

দেশবন্ধুর ত্যাগ আকস্মিক নহে

আমরা অনেক সময় ভাবিয়া বিস্মিত হই, এত বড়ো পশার তিনি কেমন করিয়া ছাড়িলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে যে অনুভূতি উদিত হইয়াছিল, হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে, কিছুই অবিশ্বাস্য থাকে না।

ত্যাগ ও অনুভূতি

যখন তাঁহার জীবনে এই চরম অনুভূতি আসিল তখন তিনি বাহিরের ঐশ্বর্য ছাড়িতে বাধ্যহইলেন। বাহিরের ঐশ্বর্য পাইলে তবে হৃদয়ের ঐশ্বর্যের উন্মেষ হয়।

স্বদেশগতপ্রাণ দেশবন্ধু

জীবনের শেষ অবস্থায় কেবল দেশের কথা দেশের চিন্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে জীবিকা ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আলো জ্বলিয়াছিল সে আলোকে তিনি নিজের বাঞ্ছিত পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বাঙালীর ভাবপ্রবণতা

তিনি জানিতেন, বাঙালীর মধ্যে ভাবপ্রবণতা আছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যদি ইহাদের মধ্যে একবার আগুন জ্বালাইতে পারি তবে অসম দুঃসাহসিক কাজ সাধিত হইতে পারে।

দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। স্বরাজ্য দলে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আপন ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তাঁহাদের সমন্বয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে দলে বিষম বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হয়। জয়কার, মুঞ্জে প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এখন পারস্পরিক সহযোগী। কিন্তু দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁহারা এখন তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেছেন।

দেশবন্ধুর বাঙালীত্বে গৌরব

দেশবন্ধুর হৃদয়ে সকল প্রদেশের, সকল সম্প্রদায়ের লোকের— এমন-কি, পেরিয়া, পঞ্চম প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিদেরও স্থান ছিল। তথাপি তাঁহার সর্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় ছিল— তিনি বাঙালী। অথচ তিনি বিশ্ব-প্রেমিক —বিশ্ব-মানবের স্থান তাঁহার অন্তরে ছিল।

দেশবন্ধুর জীবনের শিক্ষা

আজ দেশবন্ধুর জীবন আলোচনার সময় আসিয়াছে। যদি বাঙালী তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করে, তবে তাঁহার জীবনের যা-কিছু উৎকর্ষ তাহা লাভ করিতে পারিবে।

ব্যক্তির জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিলেই জাতির জীবন গড়িয়া উঠিবে। স্বামীজীর আদর্শ ছিল মানুষ গঠন। দেশবন্ধুর আদর্শ ছিল মানুষ গঠন করিয়া জাতি গঠন। কংগ্রেস কমিটির মধ্য দিয়া তিনি এই কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যখন আহ্বান করিলেন, তখন শত শত বাঙালী যুবক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাংলার গীতিকবিতার আলোচনায় যখন তিনি বলিলেন, 'বাংলার মাটি বাংলার জলের মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে', তখন বাঙালী মুগ্ধ হইয়া গেল।

সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা

১৯ জুন ১০২৮ অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত ভাষণ।

আপনারা ইতিপূর্বেই শুনিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিতেছেন এই আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণ আছেন। এইরূপ যে বলা হইবে তাহা আমি পূর্বেই জানিতাম। চিরদিনই দেখা গিয়াছে, যখনই দেশে কোনো গোলমাল হইয়াছে, তখনই দোষ চাপানো হইয়াছে আমাদের ঘাড়ে। লিলুয়ার ব্যাপারেও ইহা দেখা গিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ছাত্ররা আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই আন্দোলন আরম্ভ করেন নাই।— তাঁহারা যখন আমাদের কাছে গেলেন, তখন বলিলাম, যদি আন্দোলন করিতে হয় তবে সংযত এবং দৃঢ়তার সহিত করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের যুক্তি

রবিবাবু এবং মিঃ এন্ডরুজ এই ব্যাপারে আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া বড়োই দুঃখিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ থাকাই সংগত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু··· এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁহাকে ডাকা হইল এবং কেনই বা তিনি আসিলেন, বুঝি না। তাঁহার প্রবন্ধে তিনি সিটি কলেজের ব্যাপার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন আনিয়াছিলেন। ধৃষ্টতা হইলেও বলিব, তাঁহার এই যুক্তি অসার। সিটি কলেজের ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা ঠিক শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের ন্যায়। আর-এক প্রশ্ন উঠানো হইয়াছে। যেখানে এতদিন ছাত্ররা এই পূজা করেন নাই, সেখানে এবার কেন এত জোরের সহিত এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে? তবে কি দেড়শত বছর পরাধীন থাকার জন্য আমাদের এখনো স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াই থাকিতে হইবে?

ধর্মে সমন্বয়

আমাদের দেশে ধর্মে বিরোধ উপস্থিত হইলে চিরদিনই সমন্বয় হইয়াছে। হরি-হর, কালী-শিব, হর-গৌরী, কালী-কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি এই সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করিব। মূর্তির মধ্যে ভগবানের

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি। সসীমের মধ্যে অসীমকে আরোপ করিয়া পূজা করি। কাজেই বিরোধের কিছুই নাই। হিন্দুগণ মূর্তিপূজা করিলে তাহাতে ব্রাহ্মদের ধর্মমত কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

সহিষ্ণুতার কথা

পরমতসহিষ্ণুতার কথা উঠিয়াছে। সহিষ্ণুতার অর্থ ইহা নয় যে, নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুযায়ী ধর্ম পালন করিতে পারিলে তাহাই প্রকৃত সহিষ্ণুতা। আমার মতে ছাত্রগণকে পূজা করিতে না দিয়া ব্রাহ্মগণই বেশি অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন।

পূজার সামাজিক দিক

সামাজিক দিক দিয়াও সরস্বতী পূজার একটা মূল্য আছে। ইহা একটি সামাজিক উৎসব। আমাদের সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে আনন্দের অভাব। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একটা নির্মল অনাবিল আনন্দ ভোগ করা যায়। এই আনন্দ হইতে সমাজকে বঞ্চিত করা কখনোই সংগত নহে। তার পর শিল্প-কলার দিক দিয়াও ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে, প্রয়োজন আছে! যদি আর্ট-জগতে প্রতীকের প্রয়োজন থাকে, তবে ধর্মজগতে তাহার প্রয়োজন থাকিতে আপত্তি কি?

রাজা রামমোহনের অসম্মান

বলা হইয়াছে, কলেজ হস্টেলে পূজা করিলে রাজা রামমোহনের অসম্মান হয়। এই যুক্তির কোনো সারবত্তা নাই। তিনি অবশ্য প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। কিন্তু যখন পাদরীগণ হিন্দুর প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তখন তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

আমি মনে করি ছাত্রদের দাবি ন্যায়সংগত। সম্মানজনক শর্ত হইলে যে-কোনো মুহূর্তে আপস হইতে পারে।

রাজবন্দী সম্পর্কে ভ্রান্ত-উক্তি

বাংলার কথা প্রতিনিধির নিকট বক্তব্য।

বর্তমানে কারাগারে মাত্র আট জন রাজবন্দী আবদ্ধ আছেন— আমি জোর দিয়া বলিতে পারি যে এ কথা সত্য নহে। আবদ্ধ রাজবন্দীর সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশি। এতদ্ভিন্ন সুদূর পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে এবং সর্পবহুল জলাভূমিতে প্রায় চল্লিশ জন রাজবন্দীকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা জেলে আবদ্ধ রাজবন্দী হইতেও শোচনীয়। আমার ন্যায় বিনা শর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এরূপ রাজবন্দীর সংখ্যা ছয়জনের বেশি নহে। যাঁহারা তথাকথিত মুক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক রাজবন্দীর উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ জারী করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। আমি যাহা বলিলাম, তাহা যদি সত্য না হয় তবে গভর্নমেন্ট তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন।

২১ জুন ১৯২৮

বিবৃতি

১

২১ জুন ১৯২৮ লিলুয়ার ধর্মঘটকারীদের জন্য আবেদন।

জনসাধারণ অবগত আছেন যে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মঘটকারীদের আলোচনা আবার ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘটকারীরা যে শর্ত দিয়াছিলেন, তাহা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। কিন্তু প্রতিনিধি তাহাও গ্রহণ করেন নাই। তিনি আরো অপমানজনক শর্ত জুড়িয়া দিতে চান। ধর্মঘটকারীরা আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একমত হইবেন যে তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন একমাত্র সেই পথই তাঁহাদের সম্মুখে খোলা আছে। এই লড়াই চলিতেছে ধর্মঘটকারীদের সঙ্গে সর্বক্ষমতাবান রাষ্ট্রের। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে আমি আমার দেশবাসীর কাছে, শ্রমিকদের এই অগ্নিপরীক্ষার সময়, তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি। লিলুয়ার ধর্মঘটকারীরা বিপুল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। তাঁহারা যাহাতে অনশনের ফলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য না হন সেজন্য তাঁহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা আমাদের কর্তব্য। ধর্মঘটকারীরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিলে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মৃত্যু হইবে।

২

২১ জুন ১৯২৮ নির্বাচকগণ ও কর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে আমি উপ-নির্বাচনের ফলাফলের জন্য নদীয়ার নির্বাচকদের অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহারা দেশের ডাকে যথাযোগ্য সাড়া দিয়াছেন। সাইমন কমিশন, বর্তমান মন্ত্রীসভা ও বিনাবিচারে বন্দী প্রভৃতি যে কয়টি প্রধান বিষয় এখন জনসাধারণের সম্মুখে আছে সেই কয়টি বিষয়ে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে মতামত জানাইয়া দিয়াছেন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশের যে শত শত স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়া তাঁহাদের প্রার্থীর সাফল্যের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

রাজবন্দী দিবস

২৪ জনুন ১৯২৮ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অ্যালবার্ট হলে 'রাজবন্দী দিবস' উপলক্ষে সভায় প্রদত্ত।

আমি দুঃখের মাঝে একটি সুখের কথা বলিতে চাই। সরকার বাহাদুরের চণ্ড-নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। যখন তাঁহারা দেখিলেন, কেহই একরারনামা দিয়া মুক্তি চাহিলেন না, তখন তাঁহারা জোর করিয়া এক নোটিশ দিয়া রাজ-বন্দীদের ছাড়িতে লাগিলেন। এ কথা মুক্তকণ্ঠে এবং সরল অন্তঃকরণে বলিতে পারি যে, যে শক্তি রাজবন্দীরা দেখাইয়াছেন, সে শক্তি আপনারাও দেখাইতে পারেন।

নবজাগ্রত শক্তি

বিপদের সম্মুখীন না হইলে ভিতরের শক্তি বোঝা যায় না। বাংলার তরুণদের মধ্যে যে শক্তি জাগ্রত হইয়াছে তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিবে।

মানসিক নির্যাতন

এখন শারীরিক নির্যাতনের পরিবর্তে মানসিক নির্যাতন আরম্ভ হইয়াছে। এমন সব স্থান নির্বাচন করা হয় যেগুলি নরকতুল্য। সেখানে গেলেই নানারূপ কঠিন ব্যারামের আক্রমণ আরম্ভ হয়। আমরা যখন জেলে, তখন কমন্স সভায় মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন আমাদের নাকি জেলের মধ্যেই বিচার করা হইয়াছে। এত বড়ো নির্লজ্জ মিথ্যা কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এরূপ ভণ্ডামি আর কোথাও দেখা যায় না।

দুইটি জিনিসের প্রমাণ

দুইটি জিনিস প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম জাতি হিসাবে আমরা এত দুর্বল যে সভা-সমিতি ছাড়া আর কিছু করিতে পারি না। দ্বিতীয়, ইংরেজ এখন আইন ছাড়িয়া দিয়া বিনা বিচারে আটক না করিয়া আর ব্রিটিশ-শাসন রাখিতে পারিতেছেন না। আমি মনে করি, ইংরেজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে;

আর আমরাও ক্রমে জাগিতেছি। একদিন তাঁহাদিগকে আমাদের দাবি স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অদূর ভবিষ্যতের আকাশে মহাসমরের কালোমেঘ দেখা যাইতেছে। ইংরেজ বুঝিতে পারিয়াছে, ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত না হইলে কোনো সাহায্য পাইবে না। তাই সাইমন কমিশন দিয়া ইংরেজ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চায়।

ইংরেজের কূটনীতি

ইংরেজ কূটনীতি-বিশারদ। কখন ঘাড় ধরিতে হয় এবং কখনই-বা নতজানু হইতে হয় তাহা ইংরেজ জানে। সুতরাং, প্রয়োজন হইলে, ইংরেজ আমাদের ষোলো-আনা দাবিই স্বীকার করিবে।

পরাধীনতার তীব্রজ্বালা

পরাধীনতাই সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশার মূল। স্বাধীন হইলে দুর্ভিক্ষ-মহামারী সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে। কাজেই পরাধীনতার তীব্র বেদনা. আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। তাহা হইলেই স্বাধীনতার স্পৃহা ও দৃঢ় সংকল্প জাগিবে। আর তখনই স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হইবে।

উৎকল-মণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস

২৭ জুন ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস-স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

পণ্ডিত গোপবন্ধু উড়িষ্যাতে কী স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহা উড়িষ্যা-বাসী না হইলে সম্যক অনুভব করা যায় না। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁহার অভাব উড়িষ্যাবাসীর ন্যায় কেহ বুঝিবে না।

উড়িষ্যায় কর্মীদল গঠন

উড়িষ্যায় খাঁটি কর্মীর অভাব। খাঁটি জাতীয়ভাবে আন্দোলন, সর্ব-প্রথম পণ্ডিত গোপবন্ধুই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের কাজ অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে হইতে আরম্ভ হয়। তিনি জীবনের প্রথমেই উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে জাতি-গঠন কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময় কতকগুলি কর্মী তৈয়ারি হইয়াছিল। এই-সব কর্মী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মহত্ত্ব ও বিনয়ের সমাবেশ

পণ্ডিত গোপবন্ধুর মধ্যে মহত্ত্ব এবং বিনয়ের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার মহৎ চরিত্রে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেই তিনি যে কত মহৎ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইত। তাঁহার চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইত।

বিবিধ দেশ-হিতকর কাজ

তিনি আজীবন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। 'সমাজ' পত্রে পুলিসের এবং গভর্নমেন্টের সর্বপ্রকার উৎপীড়ন এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় উড়িষ্যার সকলে নিখিল ভারত রাজনীতিতে যোগদান করে। কলিকাতাতে তিনি ওড়িয়া-শ্রমিক-সংঘ গঠন করিয়া ওড়িয়াদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভালো কর্মীর

অভাবে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। খদ্দর প্রচলন করিয়া তিনি উড়িষ্যার দারিদ্র্য মোচন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন। সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে উড়িষ্যা, তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

নিবেদন

বাঙালী-পরিচালিত লোন অফিস ও ব্যাঙ্ক সমূহের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সাহায্য বিধানের নিমিত্ত বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সংঘের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন।

বাংলার লোন অফিস ও ব্যাংক সমূহকে একত্রিত করিবার বর্তমান আন্দোলনে আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। মফঃস্বলের প্রতি শহরেই এইরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রায় ৬০০; এবং ইহাদের মূলধন ১০ কোটি টাকার কম নহে। দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যে যদি এই অর্থরাশি একযোগে পুরা-পুরি নিয়োগ করা যায় তবে আমাদের আর্থিক সমস্যার যে কতকটা সমাধান হয় তাহা নিঃসন্দেহ। বস্তুত ঋণ-ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের একান্ত সহায়ক; এবং ঋণ সংগ্রহের অসচ্ছলতার নিমিত্তই অন্যান্য বিষয়ের অনুরূপ অর্থনীতির দিক দিয়াও বাঙালীর উদ্ভাবনী ও কর্মশক্তির তেমন স্ফুরণ হয় নাই। আমি আশা করি বঙ্গীয় লোন অফিস ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত স্বার্থসংরক্ষণে এই সংঘে যোগদান করিবে এবং দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই বঙ্গীয় ব্যাংক সংঘ গঠনে সাহায্য করিবে। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠান সমূহ সুচারুভাবে সংঘবদ্ধ হইলেই শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

৩ জুলাই ১৯২৮

ভাষণ

কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে যুবসমিতির উদ্যোগে জনসভায় আমেরিকার ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ড. সুধীন্দ্রনাথ বসুর বক্তব্যের প্রত্যুত্তর।

ডক্টর বসু যদিও আমেরিকার নাগরিক বনিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতীয় ও আমাদের ভ্রাতা বলিয়াই দাবি করিব। আমরা ড. বসুর বক্তৃতা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি, কিন্তু বর্তমানে আমরা কিছু করিতে পারি না, কেননা, আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই। নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে আমরা ড. বসুর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিব। আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইলে জগতের নিকট জাতীয়তা প্রচার করিব।

১২ জুলাই ১৯২৮

মেথরদের বেতন বৃদ্ধি

১৬ জুলাই ১৯২৮ কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় পরিবেশিত বক্তব্য।

আমি কিছু বলিব না বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, পাছে কড়া কথা বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু লেফটেনান্ট সিংহ রায়, শ্রীযুক্ত রামকুমার গোয়েংকার মন্তব্যের ফলে আমি কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কংগ্রেস পক্ষ হইতে আমার জানাইয়া দেওয়া উচিত যে শ্রীযুক্ত গোয়েংকা যে মনোবৃত্তি লইয়া কথা বলিয়াছেন, কংগ্রেস দলের সহিত সে মনোবৃত্তির খাপ খায় না। কর্পোরেশনের কর্তারা এবার মেথর-ধর্মঘট সম্বন্ধে যেভাবে কাজ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিবার মতো জোর ভাষা আমার নাই। এরূপ অবস্থা নূতন নহে; ১৯২৪ সালে এইরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতিকারের জন্য পুলিস কমিশনারের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। পাশব-শক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই— কৌশলে ও আপসে ধর্মঘটের মীমাংসা হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, এবার প্রধান কর্মকর্তা তাহা ভাবিয়াও দেখেন নাই। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি পুলিস কমিশনারের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। মেথর ধর্মঘট বাহিরের প্ররোচনায় হয় নাই। তাহাদের সংগত অভিযোগ সমূহের প্রতিকার না হওয়ার ফলেই হইয়াছে। মেয়র কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি যদি জানিতেন যে কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত কর্পোরেশনে গৃহীত হইবে না তাহা হইলে ধর্মঘটরত নেতাদিগকে ধর্মঘট ভাঙিয়া না দিবার জন্য তাহার অনুরোধ করা উচিত ছিল। ইহাতে বস্তুত বিশ্বাস-ভঙ্গ করা হইয়াছে।

নিজ সম্মান রক্ষার্থে মেয়রের পদত্যাগ করা উচিত। তিনি যদি এই সম্মানজনক পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে শহরবাসীকে নিশ্চয়ই তাঁহারা সমর্থন করিবেন। তিনি যদি এই কারণে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় মেয়র পদের জন্য নির্বাচন-প্রার্থী হন, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেস পক্ষের সমর্থন পাইবেন।

যুব-আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্য

১৬ জুলাই ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে ছাত্র সংগঠন সমিতির উদ্যোগে সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া তরুণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। শুধু বর্তমান যুগে কেন— যুগের পর যুগ যখনই কোনো জাতির জীবন-মরণ সংকট উপস্থিত হইয়াছে, তখনই এই আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

তরুণ-আন্দোলনের স্বরূপ

প্রকৃতপক্ষে তরুণ-আন্দোলন বলিতে যে-কোনো তরুণের আন্দোলনকেই বুঝায় না। তরুণদের আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, লক্ষ্য আছে। যেখানে এই বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই তরুণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তরুণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা। সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই নিত্য নূতন সৃষ্টি করা তরুণ-আন্দোলনের লক্ষ্য। যেখানেই এই সৃষ্টি; সেখানেই প্রকৃত জাগরণ।

জাতির পুনর্জন্ম

মানুষের জীবনে যেমন— জাতির জীবনেও তেমনই শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে। অনেক সময় জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; আবার অনেক সময় জাতি বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহার আত্মা মরিয়া গিয়াছে, এরূপও দেখা যায়। জাতির জীবনে এই উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। 'Evolution of Civilisation' নামক পুস্তকে গ্রন্থকার জাতি-জীবনের এই মৌলিক নিয়মটি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সভ্যতা মরিয়া যায়, কিন্তু আবার তাহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিলেও এই প্রশ্ন আসে— আমরা কি প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া আছি? ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমরা অনেকবার মরিয়াছি, এবং অনেকবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে যত সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটামিয়া, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া

গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি দুই-একটি জাতি এখনো বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, আজ মিশরের সভ্যতা আবার জাগিয়া উঠিতেছে ; রোম ও গ্রীসে আবার নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে।

জাতির সৃজনী শক্তি

চীন ও ভারতের সভ্যতা এখনো বাঁচিয়া আছে। আমাদের প্রাচীন চিন্তার ধারা, সভ্যতার ধারা এখনো জীবিত আছে। জাতি বাঁচিয়া আছে কিনা, তাহার মাপকাঠি হইতেছে— সে জাতি নূতন সৃষ্টি করিতে পারে কিনা। কিন্তু যখন সে সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্ব না থাকে, যদি তাহা শুধু গতানুগতিক পথেই ধাবিত হয় তবে তাহা প্রকৃত সৃষ্টি নহে। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যদি নূতন সৃষ্টি দেখা দেয় তবেই জাতির জীবনে যথার্থ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে শিল্প সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ইত্যাদিতে সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু সেই গতানুগতিকতার ভাব বর্তমান। অথচ শিল্পী হিসাবে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাস্তব জীবনেও ব্রহ্মদেশবাসীরা একরূপ মরিয়া রহিয়াছে। তবে তাহাদের বাস্তব ও রাজনৈতিক জীবনে কিছু কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আজ আমাদের শিল্পসাহিত্য, ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতিতে নূতন নূতন সৃষ্টি হইতেছে। যে জাতির মধ্যে রামমোহন, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতির যে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। সৃজনী শক্তি না থাকিলে কোনো জাতিই এইরূপ মনীষীর জন্ম দিতে পারে না। জাতি যখন মরণের দশায় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এই-সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন।

চিন্তা ও রক্তের সংমিশ্রণ

দুইরকম অবস্থায় বা দুই কারণে মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইয়া থাকে। একটা জীব-বৈজ্ঞানিক বা রক্ত-সংমিশ্রণের দিক হইতে, আর-একটা মানসিক বা চিন্তার দিক হইতে। যখনই দুইটি সম্প্রদায় বা দুইটি জাতি পরস্পর মিলিত হয়, তখনই উভয়ের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ এবং চিন্তার আদান-প্রদান হইয়া থাকে। মহাভারতের আমল হইতে ভারতবর্ষে এই রক্ত-সংমিশ্রণ

চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিভেদের অচলায়তন তখন ছিল না। তারপর ঐতিহাসিক সম্বন্ধে হূন-শক-পাঠানের রক্ত মিশিয়া গিয়াছে। যখনই বাহিরের প্রবল আঘাতে এক-একটা জাতি আর টিকিতে পারে নাই তখনই বিভিন্ন রক্ত ও চিন্তার সংমিশ্রণে সে জাতি আবার পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। রোমক সভ্যতা সব চেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা যখন ধ্বংসোন্মুখ হয়, তখন বাহির হইতে গথিক ও অন্যান্য জাতি আসিয়া রোমের উপর আধিপত্য করে। ফলে তাহাদের সংমিশ্রণে রোমের সভ্যতা আবার বাঁচিয়া উঠে। এই যে ইউরোপে ধর্মজগতে পুনঃসংস্কার (Reformation) এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পুনর্জাগরণের (Renaissance) আন্দোলন— ইহারও মূলে ঐ বাহিরের সংমিশ্রণ।

ভারতের জাতিগঠন ও তরুণের দায়িত্ব

আজ আমাদেরও এই সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যদি জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে সে গুরু দায়িত্বের ভার তরুণের উপর। এখন আমাদের চিন্তার বিষয়, কি করিলে আমরা এই গুরু দায়িত্বের উপযুক্ত হইতে পারি। বর্তমান জগতে সকলেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই ভার তরুণদল না লইলে আর রক্ষা নাই।

জার্মানী ও চীনে যুব-আন্দোলন

যুদ্ধের পর ইউরোপে যে-সমস্ত জাতির মধ্যে এই তরুণের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তন্মধ্যে রাশিয়া ও জার্মানী উল্লেখযোগ্য। জার্মানীতে যুব-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এখন সেখানে এই আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। চীন দেশেও এই আন্দোলন কতকটা আরম্ভ হইয়াছে। তবে তাহার বেশির ভাগ ছাত্র-সমাজে। আমাদের দেশে যুব-আন্দোলনের সহিত রাজনীতির যেমন সম্পর্ক, তাহাদের দেশেও সেইরূপ।

চিন্তার জগতে এবং রাজনৈতিক জগতে চীন এতদিন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া চীন দীর্ঘকাল পরে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্রমে দুই দলের সৃষ্টি হয়। একদল কনফুসীয় দর্শনের মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। অপর দল ইহার বিপরীত পথে চীনকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে। তারপর ক্রমে সামঞ্জস্য

হয়। আমাদের দেশে ইংরেজের আগমনকালে আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন ঘটে। তার পর পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। ফলে সমন্বয় সাধিত হয়। চীনেও ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা—সবদিক দিয়াই সংস্কারের একটা প্রবল আন্দোলন চলিয়াছে। বহুদিনের ঘুমন্ত চীন আজ জাগিয়া উঠিতেছে। ছাত্রগণই এই আন্দোলন চালাইতেছে। এজন্য পঞ্চাশ খানি কাগজ বাহির হইয়াছে। ডা· সান-ইয়েৎ-সেন এই নূতন আন্দোলনের জন্মদাতা। অনেকে ইহার মধ্যে বলশেভিকবাদ আরোপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। হয়তো এই আন্দোলনের কোনো কোনো দিক বলশেভিকবাদের অনুরূপ হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। ভারতের যুব-আন্দোলনেও আগাগোড়া এইরূপ একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই দিক দিয়া উভয় দেশের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যুব-আন্দোলন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত

আমাদের দেশে কেহ কেহ মনে করেন, এই বর্তমান আন্দোলন একটা হুজুক মাত্র, ইহার পিছনে কোনো সত্য নাই। ইহা বাহিরের আঘাতের একটা চাঞ্চল্য মাত্র। ইহার মধ্যে অন্তরের চৈতন্য নাই, ইত্যাদি। অনেকে এ কথাও বলেন, পাশ্চাত্য প্রভাব চলিয়া গেলে আমরা আমাদের অন্ধকার যুগে চলিয়া যাইব। আমাদের কোনো কর্মপ্রচেষ্টা থাকিবে না। সুতরাং ইংরেজ থাকিতে থাকিতেই আমাদের উন্নতি করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

ইংরেজ ও মুসলমানের প্রভাব

আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই আন্দোলনের ফলে জাতির জীবনে নিত্য-নূতন সৃষ্টি হইতেছে। বৌদ্ধযুগের আমল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য কত চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চিরদিন নব নব সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। কাজেই ইংরেজ না আসিলেও ইহা ঘটিত। আমরা ইংরেজদের অনেক প্রভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি এ কথা সত্য, মুসলমানও এ দেশে আসাতে আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ

পাণ্ডুলিপি

প্রেসিডেন্সি কলেজে গণ্ডগোল

সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহা আসিবে যদি আমরা সকলেই অন্তরের মধ্যে যৌবনের প্রেরণা অনুভব করি। আজ ক্রমেই এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিতেছে, যুবক, না বৃদ্ধ— তাহা নির্ধারিত হয় অন্তরের মমতা দ্বারা।

বয়সে কিছু বোঝা যায় না। যৌবনের এই অমর প্রেরণা ফিরিয়া পাইতে হইবে সাধনা দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কল্পনা দ্বারা। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র— সব দিক দিয়া জাতিকে গড়িয়া উঠাইতে হইবে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যদি একবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে তবে তাহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা দিবে। স্বাধীনতার এই আদর্শ চিন্তার দ্বারা, ধ্যান দ্বারা, সাধনা দ্বারা মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার জন্য যৌবনের প্রয়োজন। যৌবন ব্যতীত এই চিন্তা, এই কল্পনা, এই স্বপ্ন অসম্ভব। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইংরেজের অধীনে স্বাধীন হইব, এই চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যদি একবার প্রাণ স্পর্শ করে, একবার যদি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় তবে যে কোথা হইতে অসীম শক্তি অনুভূত হইবে তাহা ভাবিয়া আমরা অবাক হইব। এইজন্য বাঙালীর ভাবপ্রবণতার একটা সার্থকতা আছে। এই পৃথিবীতে সকল শক্তির বড়ো শক্তি কল্পনা ও চিন্তা-শক্তি।

শক্তির উদ্‌বোধন

এদেশে কী না আছে? প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য; প্রতিভাবান কবি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়— কিসের অভাব আমাদের? শুধু প্রয়োজন শক্তির উদ্‌বোধনের। এইজন্য সাময়িক স্বৈরাচারের (autocracy) প্রয়োজন। নতুবা নিয়মানুবর্তিতা থাকে না। আর নিয়মানুবর্তিতা না থাকিলে শক্তির ও সংহতির উদ্‌বোধন সম্ভবপর হয় না। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, তরুণেরা উচ্ছৃংখল হইয়াছে। আমি তাঁহাদের প্রতিবাদ করি। তবে একটা আন্দোলন আরম্ভ হইলে একটু উচ্ছৃংখলতা না হইয়া যায় না। কিন্তু পরে ইহা থাকে না।

অমৃতের সন্তান

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা অমৃতের সন্তান, আমাদের মধ্যে দেবত্ব আছে। কাজেই আমরা স্বাধীন হইলে উচ্ছৃংখল হইব ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করি না। নেতৃত্বের পতন যখন-তখন হয়। তাহা না হইলে তরুণের আন্দোলন

জাগ্রত হয় না। একজনের পতন আর-একজনের সেখানে আগমন— আর পশ্চাতে সমাজ। তখনই বুঝিব জাতি জাগিতেছে।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

আমার শেষ কথা, আপনাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি রহিয়াছে, তাহা অনুভব করুন। আমাদের মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিতে হইবে; স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে। যেদিন জাতির মধ্যে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প জাগরিত হইবে সেই দিনই আমাদের স্বরাজ আসিবে। এই সংকল্প জাগিলে ২৪ ঘণ্টাও ইংরেজ এ দেশে থাকিতে পারিবে না।

আমাদের জাতি বড়ো ছিল। আবার বড়ো হইবে। আমরা সকল রকমে বড়ো হইব, আমরা স্বাধীন হইব। তবেই আমরা বিশ্বসভ্যতায় স্থান পাইব।

সিটি কলেজ প্রসঙ্গ

১

সিটি কলেজের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় লইয়া কোনো কোনো ব্যক্তি ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন, এই ব্যাপারে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাহা আদৌ সত্য নহে। সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমি তাহা অনেক পরে অবগত হই। কর্তৃপক্ষ যখন জনসাধারণের সহানুভূতি পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন তখন ছাত্রগণ আমার সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য আমার নিকট আসে। আমি সামাজিক এবং সাধারণ জীবনে যখন দেখিলাম ছাত্রগণকে জেরবার করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে, তখন আমি তাহাদিগকে নীতির দিক দিয়া সাহায্য করা ন্যায়সংগত মনে করিলাম।

কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসা

কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিহিংসা পরায়ণতা অতিরিক্ত ঈর্ষা এবং কার্যে অনিপুণতার ভাব দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত হইলাম।

কংগ্রেস এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করে নাই, আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রগণকে সাহায্য করিয়াছি। আমি বন্দীরূপে পূজার ক্ষমতা পাওয়ার জন্য সরকারের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ ক্ষমতা আদায় করিয়াছিলাম। সিটি কলেজে তদনুরূপ দ্বন্দ্বে আমার এই ভাব গ্রহণ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সরকার ভিন্নধর্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দু কয়েদিদিগকে জেলখানার পূজা করার যে অধিকার দান করিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ সে অধিকার দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সিটি কলেজের ছাত্রাবাস

সিটি কলেজ ছাত্রাবাসের নাম রাজা রামমোহন রায় হস্টেল দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় একা ব্রাহ্মসমাজ বা সিটি কলেজের সম্পত্তি নহে। তিনি দেশে সকলের পূজা পাইয়া থাকেন। খ্রীস্টধর্ম যখন হিন্দুধর্মকে বিশেষত হিন্দুর পূজা-পার্বণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন রাজা রামমোহন রায়ই আমাদের হইয়া তাহা রক্ষা করিতে অগ্রসর হন।

ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান নেতাদের ন্যায় তিনি অত গোঁড়া ছিলেন না। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই খ্রীস্টধর্মের কবল হইতে হিন্দু ধর্মকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ

সিটি কলেজের প্রধান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সুযোগ খুঁজিতেও ত্রুটি করেন নাই দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত হইলাম। বর্তমান বিরোধের সহিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কোনো সম্পর্ক নাই। ইহা পারিবারিক কলহ। একই সমাজের দুই শাখার সহিত এই কলহের মিল হইতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিছুতেই ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। যে-সকল ভদ্রলোক 'ব্রাহ্ম হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দুমহাসভায় যোগদান করিতেন— তাঁহারা সমাজের অপর সম্প্রদায়ের সহিত কিরূপে এইরূপ গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার ভাব পোষণ করিতে পারেন তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

হিন্দু-সমাজে এইরূপ দ্বন্দ্ব নূতন নহে। অতীতে হিন্দু-সমাজের নানা সম্প্রদায়ের সহিত ইহা হইতেও অধিক বিরোধ হইয়া গিয়াছে। আমি এখানে শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের কথা উল্লেখ করিতেছি। যখনই এইরূপ বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, হিন্দু সমাজ একের প্রতি অন্যে সহিষ্ণু হইয়া এই বিরোধ মিটাইয়াছে।

মীমাংসার উপায়

বর্তমান বিরোধও সহিষ্ণুতার মধ্যে দিয়াই মীমাংসার পথে আসিতে পারে। ব্রাহ্ম হিন্দু এবং অন্যান্য হিন্দুগণ পরস্পর পরস্পরের পূজাকে শ্রদ্ধা করিলেই সমাজে বিরোধের অবসান হইতে পারে। একে অন্যের ক্ষমতাকে বাধা দিয়া কখনো মীমাংসা হইতে পারে না।

যে যাহাই বলুক-না কেন, আমি জোর গলায় বলিতে পারি, আমি কী ব্যক্তিগত কী সাধারণ জীবনে সকল সময়ই মীমাংসার কথাই বলিয়া থাকি। ছাত্ররা যখনই আমার নিকট আসিয়াছে আমি তাহাদিগকে অনাচারের পথ অনুসরণ করিয়া ত্যাগ ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়াই তাহাদের সংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছি, দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ মীমাংসার সোজা পথে

যান নাই, বরং তাঁহারা মুসলমান পত্রিকার ও মুসলমান ছাত্রের আশ্রয় লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দু ছাত্র ব্যতীতও তাঁহাদের চলিতে পারে।

বর্তমান বিরোধে আমার ব্যক্তিগত যে মতই থাকুক-না কেন, যখন অধ্যাপক অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, সিটি কলেজের ব্যাপার লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর মারফত আমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আমি মীমাংসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। আমি উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য একটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছিলাম।

মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া আমি অনেকটা বশ্যতা স্বীকারও করিয়াছি। আমি এই মাত্র দাবি করিয়াছি যে ছাত্রেরা রামমোহন রায় হস্টেলে পূজা করিবার অধিকার পাইবে। অমিয়বাবু এবং সরোজ রায়ের কথায় আমি এই বুঝিলাম যে কর্তৃপক্ষ শর্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। পাঁচ-ছয় দিন আমি আমার শর্ত সম্বন্ধে কোনো খবরই পাই নাই। অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ হইতে আমি ডাকযোগে যে চিঠি পাইলাম তাহাতে আমার মনে হইল তাঁহারা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষের ভাবগতিকে আমার মনে হয়, তাঁহারা মীমাংসা করিতে নারাজ সুতরাং জনসাধারণ বুঝুক এই মীমাংসা না হওয়ার জন্য দায়ী কে?

কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট মিটমাটের জন্য প্রেরিত শর্ত

১. সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ, রামমোহন রায় হস্টেলের সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া হিন্দু ছাত্রদের ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করেন বটে কিন্তু হিন্দু ছাত্রদের প্রতিমা পূজাদি হস্টেলের গৃহের মধ্যে করিতে দিতে নারাজ কেননা তাহার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের ধর্মগত পার্থক্য বিদ্যমান।

২. ছেলেরা এই অনুরোধ স্বীকার করিয়া লইবে কিন্তু রামমোহন রায় হস্টেলে কখনো কোনো সাম্প্রদায়িক উপাসনা বা পূজা ইত্যাদি হইতে না পারে সে সম্বন্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ নজর রাখিবেন। তবে এইরূপ কোনো পূজা-পার্বণ হস্টেলে করিতে হইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডারদের সম্মিলিত সম্মতি লওয়া আবশ্যক।

৩. রামমোহন রায় হস্টেলের হিন্দু ছাত্রদের ধর্মার্চনা করিবার সুবিধার

জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ হস্টেলের সন্নিকটে স্থায়ীভাবে একটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এবং তাহার ব্যয় কলেজ বহন করিবেন।

৪. যদি ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের জন্যই কোনো হস্টেল বা মেস আলাদা করিয়া দেন তাহা হইলে সেখানে ধর্মাচর্নার বাধা থাকিতে পারিবে না।

৫. গোলমাল সম্পর্কে ছেলেরা যদি কোনো অন্যায় করিয়া থাকে তবে তাহার জন্য তাহারা দুঃখপ্রকাশ করিতেছে।

৬. হিন্দু ছাত্রদের ধর্মভাবে কিছুমাত্র আঘাত করিয়া থাকিলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

৭. কলেজ কর্তৃপক্ষ ছেলেদের যে জরিমানা করিয়াছেন তাহা মাপ করিতে হইবে।

সিটি কলেজ কাউন্সিলের উত্তরে ভাইস প্রিন্সিপালকে পত্র

আপনার ৩ জুলাই-এর পত্রখানার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি, যথাকালে উত্তর দিতে না পারায় আমি দুঃখিত।

আমি যে আপসের শর্ত আপনাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম তাহা ছাত্রদেরই, আমার মারফতে প্রেরিত বলিয়া মনে করিয়া একটু ভুল করিয়াছেন। ব্যাপারটা এই— সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কয়েকজন বন্ধু আমাকে একটা মিটমাটের জন্য অনুরোধ করেন। ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ও এই মর্মে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে অনুরোধ করেন, তিনি আমাকে বলিয়াছেন। তখন আমি উভয় পক্ষের সঙ্গে দিনকয়েক আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল যে যদি তাহা কলেজ কর্তৃপক্ষ মানিয়া লন তাহা হইলে ছেলেদেরও আমি মানাইয়া লইতে পারিব। অমিয়বাবু ও সরোজবাবু যে যে বিষয়ে নির্বিকার ভাবে সম্মতি দিয়াছেন, দেখিতেছি কলেজ কাউন্সিল তাহা অনুমোদন করেন নাই। কাজেই মিটমাট করার তাঁহাদের অধিকার নাই।

আপনার জবাব অনেক বিষয়েই মানিয়া লইতে পারিলাম না, কেননা তাহা ন্যায্য ও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। কলেজ কর্তৃপক্ষ যতদিন না তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিবেন ততদিন আমার পক্ষে মিটমাট করিয়া দেওয়া অসম্ভব। ভবিষ্যতে রামমোহন রায় হস্টেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মুসলমান ছাত্রদের গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কিনা দয়া করিয়া জানাইবেন।

ভাইস প্রিন্সিপালের পত্রের প্রত্যুত্তর

১৫ জুলাইয়ের পর এ পর্যন্ত আমি সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আর কোনো খবর পাই নাই। ইতিমধ্যে সিটি কলেজে সত্যাগ্রহ করার দায়ে জনৈক ছাত্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে গ্রেপ্তার কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারেই হইয়াছে।

১৯ জুলাই ১৯২৮

২

সিটি কলেজে সত্যাগ্রাহী গ্রেপ্তার

সিটি কলেজের সম্মুখে সত্যাগ্রহী ছাত্রদের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে ২০ জুলাই ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে আহূত আলোচনা সভায় ভাষণ।

আমার মতে দুই রকমে মীমাংসা হইতে পারে। প্রথম, উভয়ের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়, উভয়ের অধিকার স্বীকার করিয়া। আমার মতে শেষোক্ত পথই মীমাংসার প্রকৃষ্ট পথ। সর্বজনীন উপাসনার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সর্বজনীন উপাসনা কোন্‌টা? খ্রীস্টানগণ বলিবে, খ্রীস্টধর্মই সর্ব-জনীন। মুসলমানগণ বলিবে, ইসলামই সর্বজনীন। তবে সরস্বতী পূজা কি সর্বজনীন হইতে পারে না। তারপর সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে ন্যায্য দাবি, সেখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ভয়ে পিছাইয়া যাইতে হইবে, এমন হইতে পারে না। প্রত্যেকের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া তবে মীমাংসা ও সমন্বয় করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অধিকার স্বীকার করিয়া সমন্বয় করাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন নেতার জন্যই মীমাংসা এতদিন হয় নাই। এখন কর্তৃপক্ষ পুলিস ও গভর্নমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের পক্ষে যে কয়েকজন লোক ছিল, তাঁহারাও এখন তাঁহাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিবে। আমি মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া অনেকদূর নামিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। এখন ছেলেদের পক্ষে এই উপায় ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। আমি আশা করি বর্তমান ক্ষেত্রে যত প্রকার ত্যাগ, সাধনা, সংযম ও সহিষ্ণুতার দরকার তাহা ছাত্রদের আছে।

যৌবনের ব্রত

২২ জুলাই ১৯২৮ পূর্ণ থিয়েটার হলে প্রদত্ত ভাষণ।

যৌবনই আশা

যৌবনের যথার্থ ধর্ম বুঝিতে হইলে আমাদের অতি অবশ্য প্রথম জানিতে হইবে যৌবন বলিতে কী বুঝায়। যৌবন এক অন্তহীন আশা। এক অফুরন্ত কর্মশক্তি এবং ব্যক্তির জীবনে সেই শক্তির বিকাশ। এই ভাবটি মাঝে মাঝে কবিতায়ও ভাষা পাইয়াছে যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়— 'আমি ভাঙিব পাষাণ কারা' অথবা টেনিসনের 'ইউলিসিস' কবিতায় 'Strong in will / To strike, to seek, to find and not to yield.' এই অন্তহীন আশা বিশ্বজাগতিক শক্তির সৃজনী ক্ষমতার প্রেতিরই আর-এক নাম যৌবন। যৌবনের এই সৃজনীশক্তির অন্তরালে আছে মুক্তির পিপাসা। যত বড়ো সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে তাহার সহিত তাল মিলাইয়া মুক্তির পিপাসা তত বেশি হইবে।

এই যুব-আন্দোলন এবং এই যৌবনের প্রেরণা পৃথিবীর সকল দেশে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে ; এখন তাহা একটি বিশ্ব আন্দোলনের বা বিশ্ব সমস্যার রূপ লইয়াছে।

মুক্তির পিপাসা

যখন পিপাসা জাগিয়া উঠে তখন একটি জাতির কর্মের সর্বক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ ঘটে। এই কর্ম এবং তাহার আনুষঙ্গিক সিদ্ধি প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধ মানুষের অন্তরে মুক্তির পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বাণ এবং এই ধারণার ফলগুলি সংস্কৃতিতে সামগ্রিক এবং সুষম বিকাশ ঘটাইয়াছিল। এই বিকাশ ছিল আমাদের সভ্যতায় লক্ষণীয় ও গৌরবময়। তাহার পূর্বে প্রাচীন ভারতে আমরা সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর সামগ্রিক বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। তাহা ঘটিয়াছিল বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে। বেদে এবং উপনিষদে শুধু সাংস্কৃতিক বিকাশের চিহ্নই ছড়াইয়া নাই, তাহাতে উচ্চস্তরের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাও যে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে।

একবার সভ্যতার উত্থান ঘটে, তারপর তাহার পালাবদলে পতন ঘটে—পৃথিবীর সর্বত্র, এমন যে একটি বিশ্বজনীন সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে তাহা ভারতের ইতিহাসেও সমর্থিত হয়।

মিশন

একই ঘটনা পৃথিবীর অন্য অংশেও ঘটিয়াছিল। যেমন আসিরিয়া এবং মেসোপোটামিয়ার মতো সভ্যতাগুলি ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র মিশর, গ্রীস এবং রোমের সভ্যতাগুলি পরবর্তীকালে কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাদের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারি না। শুধুমাত্র ভারতে ও চীনে অতীত এবং বর্তমানের সাংস্কৃতিক বন্ধনসূত্রটি এখনো রহিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বিপর্যয় সত্ত্বেও এই দুই সভ্যতা আজও বর্তমান। যাঁহাদের একটি বাণী ও ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়, তাঁহারাই বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

একটি সমন্বয়

তাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে আমরা কিভাবে বিপর্যয়গুলি অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারিব। গভীর সত্যটি হইতেছে বিনষ্টি যখনই আমাদের উপর আঘাত হানিয়াছে, তখনই আমরা একধরনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়কে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছি। মহাভারতে বেশ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য আছে। এই মহাকাব্যে আমরা দেখি তখনকার প্রচলিত বর্ণভেদ প্রথা সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়া রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

পরবর্তীকালে যখন শক, হূন, স্কাইথীয় এবং গ্রীকরা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের সমাজে মিশিয়া গিয়া বিলীন হইয়া গেলেন। এইভাবে তাঁহারা সমাজে নূতন রক্তধারা সঞ্চারিত করিলেন। যখন একটি জাতি তাহার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি হারাইতে বসে, তখন এই ধরনের পারস্পরিক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই পাশ্চাত্য মত। এই মতটি ভারতীয় ইতিহাসের সাক্ষ্যে সমর্থিত হয়।

অবশ্য এই ধরনের মিশ্রণ বর্মীদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে ব্রহ্মদেশে আমরা এক ধরনের বিজাতীয় অ্যাংলো বর্মী পাইয়াছি।

এখন শুধু জৈবিক স্তরে নয়, তার সংগে সংগে চিন্তা ও অনুভূতির জগতেও এই ধরনের পারস্পরিক মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রায়ই বলা হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য চিন্তার অভিঘাতেই শুধুমাত্র ভারতের নবজাগরণ ঘটিয়াছে। তাই পাশ্চাত্যের সংগে যোগ যখন ছিন্ন হইয়া যাইবে, তখন আমরা বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে তলাইয়া যাইব। কিন্তু এই কাল্পনিক বিনাশের ভয় সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। কেননা ভারতের নবজাগরণ মূলত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হইয়াছে। এই নবজাগরণ একটি ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া নয়। জনসাধারণের জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

যৌবনের ব্রত কি ? এই ব্রত নিশ্চয়ই স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানো। 'এই নূতন আদর্শের উপাসনা' যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আমাদের সেই আদর্শকে বরণ করিতে হইবে।

মানুষ গঠনের আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন : 'মানুষ তৈরি আমার ব্রত।' যখন একদল সত্যিকারের মানুষ তৈরি হইবে তখন স্বামীজীর মিশন এবং লক্ষ্য রূপায়িত হইবে। 'সত্যিকারের মানুষ তৈরির আদর্শ'' প্লেটো তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। অতিমানব (সুপার ম্যান) সম্পর্কিত নীট্শের ধারণা মন ও একই সংগে দেহের যাবতীয় বৃত্তির বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনাকে লক্ষ্য বলিয়া জানিয়াছিল। ধারণা প্রচলিত আছে যে শ্রীঅরবিন্দ জার্মান দার্শনিকের অনুরূপ আদর্শকে তাঁর লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

এই হইতেছে প্রথম ধাপ— আদর্শের অনুসন্ধান, মানুষ তৈরি ব্রত, অতিমানবের সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা। মানুষ গঠনের পরে কথা উঠে— সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের এবং এজন্য জাতির সামনে একটি নূতন আদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে। ভারতের জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে পুনর্গঠন চাই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা জাতির মধ্যে জাগা চাই। জীবনে একটি নূতন বাঁক আনিতেই হইবে।

অভিযাত্রীর অভিলাষ

জনসাধারণের মধ্যে অভিযাত্রীর ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এমন ভাবই ইংরেজকে ভারতের সন্ধানে বাহির হইতে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। আর

ভারত শেষ পর্যন্ত ইংরেজের নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণে আসিল। এভারেস্ট শৃংগে আরোহণের এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পদচিহ্ন-আঁকার উদ্যমে এই ভাবই গতিসঞ্চার করে। এমন উদ্যম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে এবং শরীরকে বলিষ্ঠ করে।

পরবর্তী ধাপ হইতেছে সংগঠন। সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কারের সংগে অনুন্নত শ্রেণীর বিকাশ এবং নারীশিক্ষা যুক্ত হইয়া আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি পরিবর্তন আনা চাই।

বহির্বিশ্বে মৌলিক পরিবর্তন

জাতীয় দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রে এক বা দুই দশকে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। আমাদের উদ্যমের সংগে স্বাধীনতার আন্তরিক ইচ্ছা যুক্ত হইলেই এই পরিবর্তন সম্ভব। তুরস্কে কামাল, ইতালিতে মুসোলিনী, মিশরে সারশুয়াত, পারস্যে রেজাশাহ্ পহ্লবী সেই-সব দেশে এই পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। এ কথা সত্য যে তাঁহারা সমগ্রদেশের সমর্থন পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের পিছনে নিশ্চয়ই সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন ছিল।

এই নূতন আদর্শের ঢেউ আমাদের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আমাদের অতি অবশ্যই এখন জাগিয়া উঠিতে হইবে।

বাস্তব অবস্থার ঊর্ধ্বে আমাদের উঠিতে হইবে এবং আদর্শে পেঁাছানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। বাস্তবের কারাপ্রাচীরের মধ্যে হইতে আমাদের বাস্তবকে অস্বীকার করিতে হইবে এবং আদর্শকে বরণ করিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অমর যৌবনের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল যখন তিনি অর্জুনকে ক্লীবতা পরিহারের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ভারতের বর্তমান অবস্থায় সকলকে বারবার বুঝাইতে হইবে যে একটি আদর্শের জন্য আমাদের উন্মাদ হওয়া চাই। সাময়িক উন্মত্ততা যদি একজনকে পাইয়া না বসে তাহা হইলে কোনো মানুষের পক্ষেই মহান হওয়া সম্ভব নয়।

যখনই আদর্শ সত্য হইয়া উঠে, বাস্তব মায়া মরীচিকা মনে হইতে থাকে ; তখনই একমাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইতে পারে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

১ আগস্ট ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অষ্টম বার্ষিক মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

জাতির ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহাকে দেখা মাত্র, যাঁহার বাণী শোনা মাত্র মনে হয় এই মানুষই চাহিয়াছিলাম। লোকমান্য তিলক এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। আজ সেই বিখ্যাত মামলার কথা মনে পড়িতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রিতে বিচারক রায় শুনাইয়া দিলেন —ছয় বৎসর কঠোর কারাবাস। তিলক উত্তর দিলেন— সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে মহত্তর শক্তি বিরাজিত। তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদর্শের প্রেমিক ছিলেন। আদর্শের সহিত বাস্তবের সংমিশ্রণ হইলে যে অভিনব জীবন হয়, তাহা আমরা লোকমান্য তিলকের মধ্যে দেখিতে পাই। তিলক বলিতেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'।— অরবিন্দবাবুও এরূপ বলিয়াছিলেন। অনেক প্রেরণাবলে, অনেক সাধনাবলে, এইরূপ বাণী তাঁহারা সে যুগে উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

তিলক ও বঙ্গদেশ

তিলক মহারাজ বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র ও বাংলার মন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময় মডারেট মন গড়িয়া উঠিতেছিল। তিলক ও অরবিন্দ এই মন ফিরাইয়া দেন। উভয়ই জাতীয়ভাবের প্রতীক। এইজন্য এই দুইজনই আমাদের নমস্য। কিছুদিন পূর্বে যখন মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে যে সমাদর, যে প্রীতি পাইয়াছিলাম, তাহা আর কোথাও পাই নাই। বোধহয় বাঙালী তিলক মহারাজকে বরণ করিয়াছিল সেইজন্যই আমি তাঁহাদের এই প্রাণের স্পর্শ পাইয়াছিলাম। মহারাষ্ট্রে প্রতি পর্বত, প্রতি গহ্বর ইতিহাস-বিজড়িত। এমনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তিলকের জন্ম।

তিলক ও শিবাজী

তিলক ছিলেন শিবাজীর প্রতীক। শিবাজী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে। তিলক সংগ্রাম করিয়াছিলেন বর্তমান দিল্লীশ্বরের

বিরুদ্ধে। তবে শিবাজী শুধু মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা আনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক সংগ্রাম করিয়াছিলেন ভারতের স্বরাজের জন্য।

তিনি যে মহাপুরুষ তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল মান্দালয়ের জেলে। তিনিও সেই নির্জন কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি যে কত মহৎ ছিলেন তাহা অনুভব করিয়াছিলাম সেইখানে।

স্বরাজ ও আমাদের যোগ্যতা

'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার'— তাঁহার এই বাণী আমাদের মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজ বলিয়া থাকে আমরা স্বরাজের যোগ্য হই নাই। কিন্তু যাহা জন্মগত অধিকার, তাহা পাইবার জন্য আবার যোগ্যতার প্রয়োজন কি? আর যদি তাহার প্রয়োজনই থাকে, তবে যে জাতির মধ্যে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে সেই জাতিই স্বাধীন হইবার যোগ্য। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই স্বাধীন হইবার যোগ্যতা।

বিলাতী বর্জনের অস্ত্র

আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে আমরা আজ নিরস্ত্র। কিন্তু কামান-বন্দুকের চেয়েও আমাদের বড়ো অস্ত্র আছে। সে অস্ত্র বিলাতী বর্জন। যে সামান্য বর্জন হইয়াছে তাহাতেই বিলাতের দুই-চারিটি কাপড়ের কলে হাহাকার উঠিয়াছে। যদি সকলে মিলিয়া এই বর্জন আন্দোলন সফল করিতে পারি তবে বিলাতে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিবে। ইংরেজকে না খাইয়া মারিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা সব রকম চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছি। কাজেই এখন বর্জনের অস্ত্র প্রয়োগ করিলে যদি ইংরেজের অনিষ্ট হয় তবে সেজন্য ইংরেজই দায়ী হইবে। আজ সাইমন কমিশন ও বিলাতী বস্ত্র বর্জন একযোগে বিপুলভাবে চালাইতে হইবে। ধামাধরাদের চেষ্টায় কাউন্সিলে সাইমন কমিশনের প্রস্তাব পাস হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও আমি নিরাশ হই নাই— ভীত হই নাই। কিন্তু সাইমন সপ্তক এ দেশে পদলেহিদের সহিত করমর্দন করিতে আসিতেছে না। শত্রুর সঙ্গেই তাহাদের করমর্দন করিতে হইবে। কমিশন যাহা ইচ্ছা করুক, আমরা বর্জন চালাইবই।

সুবর্ণ সুযোগ

এই যে সুদূর গগনে আবার কালো মেঘ দেখা যাইতেছে। ফলে পৃথিবীব্যাপী এক ভীষণযুদ্ধ বাধিবে। ইহার পূর্বে ইংরেজ ভারতবর্ষকে শান্ত রাখিতে চায়। ইংরেজ জানে, ভারতবর্ষের সাহায্য না পাইলে তাহার উপায় নাই। আমরা এই সুযোগ হারাইব না। অনেকদিন পরে জাতীয় জীবনে জোয়ার আসিয়াছে। এখন তরী ভাসাইতে হইবে। আমাদের বড়ো সৌভাগ্য, আমাদের দেশকর্মীরা কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। গভর্নমেন্টের অবরোধ ব্যর্থ হইয়াছে। কাহারো পৃষ্ঠভঙ্গ হয় নাই। সকলেই নূতন আশায় ভরপুর, নূতন বলে বলীয়ান।

তরুণ বাংলা

বড়োই লজ্জার বিষয় যে, এত লাঞ্ছনার পরেও এখনো কাহারো কাহারো গায়ে বিলাতী কাপড় দেখা যায়। তথাপি আমি নিরাশ হই নাই। তরুণ বাংলার উপর আমার অটুট বিশ্বাস আছে। আজ হউক, কাল হউক, আমরা স্বাধীন হইবই। মীরজাফর উমীচাঁদের বংশধর এখনো বাঁচিয়া আছে। তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতে হইবে। হে তরুণ বাংলা! স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও। স্বরাজ আমাদের আসিবেই আসিবে।

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন

২ আগস্ট ১৯২৮ কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে ফ্রি প্রেসের মাধ্যমে বক্তব্য।

আমি সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীরামপুরে আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেস কী করিতে ইচ্ছা করে তাহা লইয়া তথাকার জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্ত আশংকার সৃষ্টি হইয়াছে। কংগ্রেস তাহার নিজ প্রতিনিধি দাঁড় করাইয়া এই নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি এই কাজের ভার গ্রহণ করিবে। জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই নির্বাচনে কী পরিমাণ যত্ন লইবে তাহা নির্ভর করে স্থানীয় অবস্থার প্রয়োজনের উপর।

সেদিনও আমি শ্রীরামপুরের বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত দেশ যে নীতি অনুসরণ করিবে তাহা কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। এই নীতি অনুসারে, যখনই সময় বা সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের নির্বাচন দ্বন্দ্বে যোগ দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। ভারতের বাহিরে ইংলন্ডে এবং অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক এইরূপ নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। এইরূপ নির্বাচন দ্বন্দ্বে যোগদান এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন করদাতা সমিতি কর্তৃক সম্ভবপর নহে। অবশ্য করদাতা সমিতিগুলি যে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সে বিষয় কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি সেদিন শ্রীরামপুরেও বলিয়াছিলাম যে, এই-সব সমিতির কাজ হইল— একদিকে করদাতা ও অপর দিকে মিউনিসিপ্যালিটি— এই উভয়ের মধ্যে একটি 'যোগসূত্রস্বরূপ' হইয়া করদাতাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রতিনিধি দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য হইতেছে— উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির পদগুলি দখল করিয়া উহার শাসন-সৌকর্যের উন্নতি সাধন করা। সাধারণের সহানুভূতি এবং সমর্থন ব্যতিরেকে কংগ্রেসের কাজ সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমি শ্রীরামপুরের জনসাধারণকে তাঁহাদের সহানুভূতি এবং সমর্থন দ্বারা তথাকার কংগ্রেস কমিটিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

মিলনের জন্য আবেদন

২ আগস্ট ১৯২৮ 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি।

কিছুদিন পূর্বে আমি খড়্গপুর পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। সেই সময় হইতে আমি খুব যত্নের সহিত বি. এন. রেলওয়ের এবং খড়্গপুর শ্রমিকদের অবস্থা বিবেচনা করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রেরণায় বি. এন. রেলওয়ে শ্রমিক সংঘটি স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক কাল যাবৎ এই সংঘ একটি শক্তিশালী, প্রয়োজনীয় এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল। অন্যান্য শ্রমিক সংঘের নিকট ইহা একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত। কতকগুলি কারণে (আমি এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না) মূল সংঘটির মধ্যে দলাদলি দেখা দেয়। এ বিষয়ে কাহার কাহার দোষ তৎসম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে আমি ইচ্ছাপূর্বক বিরত রহিলাম। তবে একটি বিষয় আজ আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি যে বর্তমানে একটি সংঘের পরিবর্তে তিনটি সংঘ গঠিত হইয়াছে। যথা : বি. এন. রেলওয়ের ভারতীয় শ্রমিক সংঘ, বি. এন. রেলওয়ে কর্মীসংঘ এবং বি. এন. রেলওয়ে কর্মচারী সংঘ। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে কতকগুলি ন্যায্য অভাব-অভিযোগের জন্যই এই তিনটি সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সংঘই থাকা উচিত ছিল। কর্তৃপক্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলে অবশ্য সংঘের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়িয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সর্বদাই একটি সংঘকে আর-একটির বিরুদ্ধে লাগাইয়া একটি খাঁটি শ্রমিক সংঘ গঠিত হওয়া বন্ধ রাখিতে পারেন। আমি যখন আমন্ত্রিত হইয়া খড়্গপুরে গিয়াছিলাম, তখন বিশেষ জোড়ের সহিত একটি যুক্ত সংঘ গঠনের কথা বলিয়াছিলাম। কয়েকজন কর্মী (তাহারা কোন্ দলের তাহা আমি ইচ্ছাপূর্বকই বলিতে বিরত থাকিব) যে-কোনো প্রকার সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল। কাজেই আমার আবেদনে কোনো ফল হয় নাই।— আমি তথায় সে আশংকার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা এখন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ সরাসরি এবং অন্যায় ভাবে কর্মীসংঘের সেক্রেটারি মি. নাইডুকে বরখাস্ত করিয়াছেন। যদি আরো লোক বরখাস্ত হয় আমি বিস্মিত হইব না। যদি এই নিপীড়নে একটি সংঘ ভাঙিয়া যায় তবে অপর দুইটির অদৃষ্টেও সেইরূপ হইবে।

সুতরাং অপর দুইটি সংঘকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে যদি তাহারা এখন সময় থাকিতে সতর্কতার পথ অবলম্বন না করে এবং একটি সম্মিলিত সংঘে পরিণত না হয় তবে আজ কর্মীসংঘ কর্তৃপক্ষের কাছে যেরূপ ব্যবহার পাইতেছে তাহারাও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার পাইবে। পরিশেষে আমি বি. এন. রেলওয়ের কর্মী-সাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি যে তাহারা যেন তাহাদের ইউনিয়ন কর্মচারীদের উপর এরূপ চাপ দেয় যে অনতিবিলম্বে একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন যুক্ত সংঘ গড়িয়া উঠে।

সিটি কলেজের সমস্যা

'বাংলার কথা'র প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার।

'বাংলার কথা'য় আমার শেষ বক্তব্য প্রকাশের পর আমি আরেকবার মিটমাটের চেষ্টা করি। সিটি কলেজের দুইজন অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া মিটমাট যাহাতে হয় তাহার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের জানাই ইতিপূর্বে আর একবার আরো দুইজন অধ্যাপক আসিয়া আমাকে অনুরূপ অনুরোধ জানান। কিন্তু পরে জানা যায় ভদ্রলোক উভয়-পক্ষের কথা চালাচালি করিতেছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা নাই।

দুইজন অধ্যাপকের অনুরোধে কিন্তু আমি আবার আমার শর্তগুলি কিছু কমাইতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখিব বলি। ইহার পূর্বে আমার যে শর্ত ছিল আমি তাহার পরিবর্তন করি। দুই জায়গায় অনুরোধ শব্দের স্থানে ইচ্ছা শব্দ বসাইয়া আমি সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজব্যয়ে রামমোহন হস্টেলের ছাত্রদের জন্য পূজার স্থান করিয়া দিবেন বলিয়া যে শর্ত ছিল তাহা বদলাইয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া পূজার স্থানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন এইরূপ শর্ত করি। ইহা ছাড়া ছাত্রদের জরিমানা ও শাস্তি মাফ করিতে হইবে বলিয়া যে শর্ত ছিল তাহাও আমি বাদ দিয়া দিই।

এই সংশোধিত প্রস্তাব একজন অধ্যাপকের হাত দিয়া আমি পাঠাইয়া দিই। কিন্তু কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আমি কোনো উত্তর পাই নাই। কলেজ কর্তৃপক্ষের মনোভাব এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। ছেলেরা যাহাতে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ বা ঐ ধরনের কিছু করে— তাহাই শুধু চান। মিটমাট তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইলে এত দীর্ঘকাল দরাদরি না করিয়া তাঁহারা পাঁচ মিনিটে মিটমাট করিতে পারিতেন। আমি যতই নরম হইতেছি তাঁহারা ততই শক্ত হইতেছেন। কিন্তু মিটমাটের ভিতর আমার যদি থাকিতে হয়— তাহা হইলে আর শর্ত কমাইতে পারিব না। আমি সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না। কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের ভাব দেখিয়া মনে হয় মিটমাটের কোনো আশা নাই।

৫ আগস্ট ১৯২৮

সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের কার্যের প্রতিবাদ

৮ আগস্ট ১৯২৮ অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত ভাষণ।

সিটি কলেজের ব্যাপার এখন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এখন উহা গভর্নমেন্ট ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যখনই ছাত্র এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তখনই গভর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ স্থলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলেও গভর্নমেন্ট তাহাই করিয়া থাকেন। সর্বদাই ধনিকগণ সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকেন। অন্যান্য সভ্য দেশে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না। আমাদের এই পরাধীন দেশেই এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার সম্ভবপর।

সিটি কলেজের ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য দেশেও এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট ইহাদের মধ্যে বিদ্রোহের বিভীষিকা দেখিয়া থাকে। এই বিপ্লব দমনের জন্য তাঁহারা ছাত্রদিগকে নির্যাতন করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

কোনো সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার বিদ্বেষ আছে। ইহা সর্বৈব মিথ্যা। হয়তো আমি বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারি নাই, তাই বলিয়া কোনো সম্প্রদায় বিশেষের উপর বিদ্বেষ নাই। আমার দেশের কোনো অধিবাসীর প্রতি আমার আক্রোশ নাই। তারপর সিটি কলেজের ব্যাপার কাহারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে। একটি নীতি-প্রতিষ্ঠার জন্যই ছাত্রগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে।

যাহাতে মীমাংসা হয় তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কোনোই ফল হয় নাই। কাজেই ছাত্রগণকে বলিতেছি, শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালানোই তাহাদের কর্তব্য।

তাহাদের দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এরূপভাবে সংগ্রাম চালানো ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

নূতন প্রাণস্পন্দন

২৮ আগস্ট ১৯২৮ লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলন সম্পর্কে অভিমত।

২৮ আগস্ট মঙ্গলবার খুবই হৃদ্য পরিবেশে সর্বদল সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। জনসমাগম যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল, প্রকৃতপক্ষে এই উপলক্ষে সব প্রধান নেতাই উপস্থিত ছিলেন। বিশাল হলঘরে সদিচ্ছার আবহাওয়া বজায় ছিল। সর্বদল সম্মেলনের রিপোর্ট-রচয়িতাদের প্রতি ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতাই ছিল সেইদিনের কর্মসূচী। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা একের পর এক উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্ব স্ব অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। কেবলমাত্র মৌলানা হজরত মোহানির ভিন্ন সুর শোনা গেল, তিনি রিপোর্টটির নিন্দা করিলেন কারণ ইহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয় নাই।

পণ্ডিত মোতিলাল তাঁহার রসমধুর বক্তৃতায় মৌলানা হজরত মোহানির সমালোচনার উত্তর দিলেন এবং তাঁহার পরিহাসপ্রিয় ও কার্যকর উত্তরটি মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনিদ্বারা অভিনন্দিত হইতেছিল। প্রস্তাবটির উপর ভোট আহ্বান করা হইলে, মৌলানা হজরত মোহানির বিরোধিতা ব্যতীত সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে ইহা গৃহীত হইল। প্রথমদিনের ঐক্য ও সদিচ্ছার আবহাওয়া আশাপ্রদ ভবিষ্যতের সূচনা করিয়াছিল। সন্দেহ নাই যে, বিতর্কমূলক প্রশ্ন সমূহের, যথা: ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, ভাষাভিত্তিক প্রদেশবিন্যাস, সিন্ধু প্রদেশের বিচ্ছিন্নতা এবং সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপর মতপার্থক্যের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা যে তৃতীয়দিনের সমাপ্তি পর্যন্ত কোনো মতপার্থক্য দেখা দেয় নাই। অনেক কংগ্রেসী সদস্যের মনেই দ্বিতীয় দিনের উত্থাপিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করার যথার্থ ইচ্ছা ছিল, এবং তাহার কোনো সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তাহাও সম্ভবত গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা করা হইলে সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন দল এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সম্মেলনের কার্যধারায় বাধা না দিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইল। যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন তাঁহারা একটি বিবৃতি রচনা করিলেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহা পাঠ করিলেন। তিনি

এক ওজস্বিনী ভাষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করিলেন। স্বাক্ষরকারীদের পক্ষে পণ্ডিত নেহরু বলিলেন যে যদিও তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক, তবু তিনি এই বিষয় লইয়া সম্মেলনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া কোনোরূপ জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিবেন না, এবং মূল প্রস্তাবের উপর ভোটও দিবেন না। ফলে, মহম্মদ হজরত মোহানি ব্যতীত কোনো প্রতিনিধিই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন না। এই সংশোধনী প্রস্তাবটি সমর্থিত না হওয়ায় বাতিল হইয়া গেল। প্রস্তাবটির উপর ভোট লওয়া হইলে, উহা বিনাবাধায় গৃহীত হয়।

সব মিলাইয়া দ্বিতীয় দিনের কার্যবিবরণী ম্লানই ছিল। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইবার প্রস্তাব কোনো উৎসাহ জাগায় নাই এবং পূর্ণ-স্বাধীনতার সপক্ষের ওকালতিও ব্যর্থ হয়। সেইদিন কেবল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ওজস্বিনী ভাষণ প্রশংসিত হয়। মি. সোয়েব কুরেশী ও আমি আমাদের মন্তব্য যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিলাম। যদিও আমরা প্রস্তাবটিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, তবু আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক ছিলাম না, এবং আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়ার অধিকার বজায় রাখিয়াছিলাম। আমি পণ্ডিত জওহরলালকে এবং যাঁহাদের সপক্ষে তিনি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের আশ্বাস দিলাম যে আমরা দুইজনেই পূর্ণ স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহার সহিত অভিন্নমত। ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে কংগ্রেস দলের প্রস্তাবের সমর্থকদের বক্তৃতা ছিল অস্বচ্ছন্দ এবং তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করার পূর্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিন

কংগ্রেসের স্বাধীন গোষ্ঠীর উপস্থিতবুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার ফলে দ্বিতীয় দিনে যেমন একটা ভাঙন রোধ করা গিয়াছিল, তৃতীয় দিনেও তেমনি সিন্ধুর প্রতিনিধিদের আপস-মনোভাবের ফলে ভাঙন ঘটে নাই।

সম্মেলন আবার ৩০ তারিখে বেলা দশটায় শুরু হইল। প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হইল ভারতীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে। প্রথমে মনে হইয়াছিল বিষয়টি সাদামাঠা ও তর্কনিরপেক্ষ, কিন্তু আলোচনা-কালে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি

হইল। রিপোর্টটি একদিকে রাজন্যবর্গ এবং অপরদিকে তাঁহাদের প্রজাবৃন্দের মধ্যে একটি মধ্যপন্থা গ্রহণ করিল। বক্তৃতাদানকালে পণ্ডিত মালব্য শাসক-রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিলেন। ইহাতে রাজ্যগুলির প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। প্রস্তাবের উত্থাপক শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারি বিতর্কের উত্তরে কয়েকজন শাসক-রাজন্যের শাসন-ব্যবস্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষ যুক্তি সহকারে ও বেশ উদ্দীপনার সহিত তিনি প্রজা-বৃন্দের সপক্ষে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার বক্তব্য সভায় বিশেষ প্রশংসিত হইল— তাহার পর মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বিরতি হইল। সভাপতি সভায় একটি সুখবর পরিবেশন করিলেন যে সিন্ধুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সিন্ধুর বিভাগ সম্পর্কে একমত হইয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সভাপতির নিকট হইতে একটি প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হইল এবং উচ্চকিত ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হইল। সিন্ধু সমস্যার সমাধানের পর প্রতিনিধি ও সদস্যরা এক ভোজসভায় মিলিত হইলেন এবং অতঃপর একত্রিত হইলে তাঁহাদের বেশ প্রফুল্লচিত্ত দেখাইতে-ছিল।

প্রদেশগুলির পুনর্গঠন

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের পরবর্তী প্রস্তাবটি বিতর্কমূলক হইবে মনে হইয়াছিল, কারণ অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল এবং উৎকলের প্রতিনিধিগণ খসড়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সন্তোষজনক সূত্র নির্ণয় করা গেল যাহা সকলের মনোমত হইয়াছিল। সকল সংশোধনীসহ প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হইলে সভাপতির পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। দুইটি কণ্টকময় প্রশ্নের সমাধান করিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সভা ভাঙিল এবং সদস্যেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সভা ত্যাগ করিলেন।

আরো একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন সমাধানের অপেক্ষায় ছিল, যথা, পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। তাহার সমাধান হইলে সব-কিছুই অনায়াসসাধ্য হইত। শেষ কয়দিন পাঞ্জাবের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রশ্নটি আলোচনা করিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা একত্র কাটাইয়াছেন। পাঞ্জাবের সদস্যদের সমস্যাটি সমাধানকল্পে সময়

দিবার জন্য সম্মেলন দুইবার মুলতুবি রাখা হয়। প্রশ্নটি এখনো আলোচিত হইতেছে, এবং আশা করা যাইতেছে যে একটি সন্তোষজনক সমাধান করা যাইবে। সামগ্রিকভাবে এ পর্যন্ত সবই সহজসাধ্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎও বেশ আশাপ্রদ কারণ লক্ষ্ণৌ-এ যাঁহারাই আসিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ববোধ অসীম এবং তাঁহারা দায়িত্বপালনেও সচেষ্ট।

মুক্তির পথ

জামশেদপুরের অচলাবস্থা সম্পর্কে ৩০ আগস্ট ১৯২৮ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সহিত সাক্ষাৎকার।

জামশেদপুরে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কর্মীরা দৃঢ় এবং অচঞ্চল, এবং যতদিন তাঁহাদের বৈধ ও যুক্তিযুক্ত দাবি পূরণ না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা নতি স্বীকার করিবেন না। অপরদিকে পরিচালকবর্গ অনমনীয়। ফলে একটি প্রধান শিল্প, যাহা জাতীয় শিল্প বলিয়া গণ্য হইবার দাবি রাখে, তাহা ধ্বংসের সম্মুখীন। যদি অচলাবস্থা চলিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিল্প ও অংশীদারদের পরিণামের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। ইতিমধ্যেই ক্ষতির পরিমাণ প্রভূত। মালিকপক্ষ যদি আপস ও সহানুভূতির মনোভাব দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি সর্বপ্রথমেই শ্রমিকদের নিকট সংগ্রাম-বিরতির সুপারিশ করিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহারা অনমনীয়। কর্মী এবং অংশীদার সকলের স্বার্থেই দ্রুত আপস-নিষ্পত্তির প্রয়োজন এবং একটি পক্ষই পরিস্থিতির গুরুত্ব ও দ্রুত মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন না— তাঁহারা হইলেন মালিকপক্ষ।

এই অচলাবস্থা হইতে মুক্তির পথ হইল এই যে ডিরেক্টরবর্গকে ঘটনাস্থলে আসিতে হইবে এবং পরিস্থিতির বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে হইবে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই পরিচালকদের সহিত আলোচনা করিয়া ঘটনাস্থলেই একটি সমাধানে পৌঁছাইতে পারেন।

পরিচালকবর্গ ও ডিরেক্টরগণ আপসের মনোভাব দেখাইলে আমি নিষ্পত্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত।

স্বাধীনতার আদর্শ

২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ।

আমি তোমাদের উপদেশ দিতে আসি নাই। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা যে তর্কাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাতে আমি আমার আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। আমাদের অনেকেরই বিগত বহুদিন যাবৎ এইরূপ একটি ছাত্র-সম্মেলন করার স্বপ্ন ছিল। একদল ছাত্রের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফলে সেই স্বপ্ন আজ সার্থক হইয়াছে। আমি নিজেকে একজন ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি। অবশ্য সংকীর্ণ অর্থে আমি আর ছাত্র নই; কিন্তু জীবনের বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সবে পাঠ লইতে শুরু করিয়াছি— সেই অর্থে আমি ছাত্র।

বাংলার ছাত্ররা যে তাহাদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে তাহাতে আমি খুব খুশি হইয়াছি। পণ্ডিতজীও যে সুদূর মুসৌরী হইতে এখানে তোমাদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিতে আসিয়াছেন তাহার কারণ আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছি যে বাংলার ছাত্ররা তাঁহাকে চায় এবং তাঁহার ভাবধারার প্রতি তরুণ বাংলার হৃদয় সাড়া দিবে। আমার এ-ধারণা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। পণ্ডিতজী যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

পণ্ডিতজী তাঁহার সভাপতির ভাষণে ছাত্রদের সম্মুখে অনেক নূতন ভাবধারা ও নূতন আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তোমরা শান্ত চিত্তে এই-সব কথা বিবেচনা করিয়ো। যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করিবে, যাহার সংগে একমত হইতে পারিবে না তাহা গ্রহণ করিয়ো না। সভাপতির ভাষণে যে বাংলার ছাত্রদের ভাবিবার মতো অনেক কথা আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমার আশা এই যে এই ভাষণের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইবে।

আমার কাছে আজ সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হইল, এই জড়বৎ জাতির মৃত অস্থিপুঞ্জে নবজীবন সঞ্চার করিয়া নবজাগ্রত ভারত সৃষ্টি করার মতো মহা শক্তি কোথায় পাইব? নিঃসন্দেহে ইহা একটি কঠিন সমস্যা। প্রথম যখন এই সমস্যা সম্পর্কে আমি ভাবিতে শুরু করিয়াছিলাম তখন আমি দিশাহারা বোধ করিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম আমার মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ হয়তো বা উজ্জ্বল

নয়। কারণ একদিকে শক্তিশালী জাতিগুলির নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে ভারতীয়দের মতো অসম, দুর্বল ও বয়োজীর্ণ একটি জাতি। এরূপ বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতা ও অশুভ মিতালির বিরোধিতা করিয়া বয়োজীর্ণ ভারত কি কোনো সুদিনের উষালগ্নে পৌঁছিতে পারিবে ?

সব জাতিরই শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের সীমা আছে। কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পর সেই শক্তিতে ভাঁটা পড়িয়া আসার লক্ষণ দেখা যায়। তখন বুঝিতে হইবে যে জাতির মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহাই ইতিহাসের বিধান। যুগে যুগে কত সভ্যতা এই অবক্ষয়ের ধারায় কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! যখনই দেখা যায় যে কোনো জাতি তাহার অতীতের কীর্তি লইয়া বড়াই করিতেছে কিন্তু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে আর নূতন কোনো অবদান রাখিতেছে না— যখন চিন্তা বা কর্মের জগতে তাহার আর দিবার কিছু নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে সেই জাতির মৃত্যু ঘটিয়াছে।

এই মুমূর্ষু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলার মতো মৃতসঞ্জীবনী সুধা কোথায় পাওয়া যাইবে? বিজ্ঞানীরা প্রতিকারের কয়েকটি উপায় বলিয়াছেন। একটি উপায় হইল, মুমূর্ষু জাতির ভাব ও আদর্শের জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করা। জনসাধারণের বদ্ধমূল কুসংস্কারের সঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবধারার সংঘাত বাধিলে হয়তো এমন নূতন ভাব ও কর্মের উদ্ভব হইবে যাহা জাতিকে রক্ষা করিবে।

আমাদের স্বদেশের ক্ষেত্রে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর দেশ অধঃপতনের তলায় চলিয়া গিয়াছিল। তখন আসিল ভগবান বুদ্ধের বৈপ্লবিক বাণী। তাহার ফলে জাতি যেন তাহার আত্মাকে আবার ফিরিয়া পাইল। কিন্তু এই নূতন বাণী জাতির সত্তার সেই অংশে পৌঁছানো চাই যেখানে এখনো জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট আছে।

পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি ও সামাজিক সাম্যের আদর্শ এ-দেশের তরুণদের ধ্যান-ধারণায় হয়তো বিপ্লব আনিয়া দিবে। আমাদের মায়েরা ও বোনেরা পিছাইয়া আছেন। জাতির অর্ধেক অংশ প্রগতিশীল আন্দোলনে বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করেন না— ইহা পরিতাপের বিষয়। আমি পুণায় বলিয়াছিলাম, আমাদের সকল রাজনৈতিক মঞ্চের দুইটি প্রধান স্তম্ভ হইবে যুব-আন্দোলন ও নারী-আন্দোলন।

সোশ্যালিজমের নানা চিন্তাধারা আছে। যেমন, রাষ্ট্রীয় সোশ্যালিজম, সিন্ডি-

ক্যালিজম, গিল্ড সোশ্যালিজম ইত্যাদি। আমি ইহার কোনো চিন্তাধারার সঙ্গেই পুরাপুরি একমত নই। কিন্তু আমি মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যে বিশ্বাসী। সামাজিক পুঁজির অধিকতর সম-বণ্টনের পক্ষে আমি প্রচার করিয়া যাইব। সেইজন্যই আমি ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সাধ্যমতো কাজ করিতেছি। অনেকে মনে করেন যে সোশ্যালিজম পাশ্চাত্য হইতে আমদানী করা হইয়াছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। সম্পত্তির সামাজিক মালিকানা ও বণ্টন শিলঙের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে এখনো বজায় আছে।

কখনো কখনো এমন কথাও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে যে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র এ-দেশের জনসাধারণের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না। আর্ল অফ রোনাল্ডসে একবার এই উদ্ভট তত্ত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি এমনও বলিয়াছিলেন যে প্রাচ্যের লোকদের পক্ষে গণতন্ত্র মানায় না। কিন্তু শিলঙের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ভোট দিয়া রাজা নির্বাচন এখনো প্রচলিত আছে। পূর্বোক্ত তত্ত্ব ইহাতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হইতেছে। এই পার্বত্য অধিবাসী নিশ্চয়ই বেন্থাম, মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সারের বই পড়িয়া গণতন্ত্র শিখে নাই।

আমি আন্তর্জাতিকতাবাদেও বিশ্বাসী। কিন্তু যে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বের সকল জাতিকে মিশাইয়া এক করিয়া দিতে চায় আমি তাহাতে বিশ্বাসী নই। আমার মনে এহেন আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনো আবেদন নাই। জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আদর্শগত বিভিন্নতা নিশ্চয়ই থাকিবে। সারা বিশ্বে বৈচিত্র্যহীন একই রকম আদর্শ ও ভাবধারার আধিপত্য চলিবে, ইহা আমি দেখিতে চাই না।

পূর্ববর্তী বক্তাদের মধ্যে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের আবার একটি মিশন থাকিতে পারে নাকি! পাশ্চাত্য জাতিগুলি যেমন সাম্রাজ্যবাদী মিশন লইয়া চলিতেছে ভারতের অবশ্যই তেমন কোনো মিশন নাই। উগ্র জাতীয়তাবাদের মিশনও ভারত বরণ করিবে না।

তোমরা বলিষ্ঠ আশাবাদ ও আত্মনির্ভরতার মনোভাব লইয়া চলো। বর্তমান হয়তো আঁধার-ভরা, আমাদের আশাও হয়তো আসন্ন ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে না; কিন্তু এই অন্ধকারের যবনিকার অন্তরালে প্রভাতসূর্যের কিরণচ্ছটা অপেক্ষা করিতেছে। দেশের তরুণদের মধ্যে যে বিশাল সম্ভাবনা নিহিত আছে তাহা পূরণ করিতে পারিলে বর্তমানের এই নৈরাশ্য বিদূরিত হইবে ও জয় তোমাদের করায়ত্ত হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা : নূতন দৃষ্টিভঙ্গি

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ অফ ইণ্ডিয়া'র বাংলা শাখার ইশতেহার।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নূতন নেতৃত্বের প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা এমন একটি স্তরে পৌঁছিয়াছি যখন পুরানো নীতি ও কর্মসূচী আর যথেষ্ট নয়। নূতন নীতি ও নূতন কর্মসূচীর চাহিদা ক্রমাগত বাড়িতেছে। ৪২ বৎসর পূর্বে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন নব-সৃষ্ট ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণী। তাঁহাদের আত্মমর্যাদার দাবি ও তাঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা সে-আন্দোলনে ছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে দেশের কথা তাহাতে স্থান পায় নাই।

১৯০৫ সালে এক নূতন মনোভাবের জন্ম হয়। দেশে এক নূতন চেতনার বিকাশ ঘটে— মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে শুরু করে। স্বাধীনতার প্রেরণা জাতীয় সংস্কৃতি, কলা ও শিল্পের নবজাগরণ ঘটায়। তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মত্যাগ ও অ্যাডভেঞ্চারের প্রেরণা জাগিয়া ওঠে। মানুষ আবেগ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং সমাজের একটি বিশাল অংশ যেন নবজন্মের শিহরণ অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু এ-চেতনাও সর্বব্যাপক হয় নাই। সমাজের বৃহত্তর অংশকে এই আন্দোলন অনুপ্রাণিত করে নাই, স্পর্শও করে নাই। যুগ যুগ ধরিয়া যাহারা অর্থনৈতিক দাসত্বের ও সামাজিক অসাম্যের জগদ্দল পাথরের নীচে পিষ্ট হইতেছে তাহাদের কানে যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার কম্বু-আহ্বান প্রবেশ করিল তখন তাহারা রোমাঞ্চ অনুভব করে নাই।

১৯২১ সালে কিন্তু পরিস্থিতির বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটিল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কর্মসূচী, সামাজিকভাবে অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষের কাছে, অত্যাচারীদের হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্যোতক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনের অর্থনৈতিক আবেদন, ক্ষণস্থায়ীভাবে হইলেও, জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে হইয়াছিল। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই প্রথম— দুর্বল ও ক্ষীণকণ্ঠে হইলেও— ঘোষিত হইল যে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা বলিতে অর্থনৈতিক দাসত্ব ও সামাজিক অসাম্য হইতে মুক্তি বুঝায়। তাহার ফল হইয়াছিল অবিশ্বাস্য। অসহযোগ

আন্দোলনের আহ্বানে সমগ্র জাতি— এতদিন যাহারা মূক ছিল তাহারাও— যুগযুগান্তের জড়তা ত্যাগ করিয়া মানুষের মতো উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু অসহযোগ কর্মসূচীর সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। যদি ভারতের জনসাধারণের অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করিতে হয়, যদি সামাজিকভাবে অত্যাচারিত ও অর্থনৈতিকভাবে পিষ্ট জনসাধারণকে অজ্ঞতা ও জড়ত্ব হইতে জাগ্রত করিতে হয় তবে একটি স্পষ্টতর বাণী ও আরো প্রত্যক্ষ আবেদন দরকার। তাহাদের কাছে এমন স্বাধীন ভারতের চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে যেখানে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে, সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থাকিবে না। প্রকৃত স্বাধীনতা-প্রেমীদের রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলা বন্ধ করিতে হইবে। অলীক ঐক্যের ধারণা তাহাদের ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকাশ্যে আসিয়া স্বাধীনতার সকল দায় তাহাদিগকে অংগীকার করিতে হইবে। বর্তমান মুহূর্তের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন এমন-একটি দল, যাহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য, ও অর্থনৈতিক মুক্তির পক্ষে দাঁড়াইবে। ভারতকে যদি প্রকৃতই স্বাধীন হইতে হয় তবে আমাদের শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র পাইলে চলিবে না, সামাজিক গণতন্ত্রও চাই, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রও চাই। ভারতের সামাজিক অত্যাচারিত শ্রেণীদের ইহা অনুভব করিতে দিতে হইবে যে স্বাধীনতার অর্থ সামাজিক অসাম্য ও অবিচার হইতে মুক্তি। ভারতের অর্থনৈতিক ক্রীতদাসগণ জানুক যে স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের অর্থনৈতিক বন্ধন ও দাসত্ব হইতে মুক্তি। রাজনৈতিক মানসিকতাসম্পন্নশ্রেণী উপলব্ধি করুক যে স্বাধীনতা বলিতে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায়। ভারতে সমগ্র জনসাধারণ চিরতরে এ কথা বুঝুক যে স্বাধীনতার অর্থ ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম— ভারতের সংস্কৃতি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, ক্রীড়া সকল ক্ষেত্রের পুনর্জাগরণ।

ইহাই হইল স্বাধীনতার পূর্ণ রূপ। ভারত এখন এই স্বাধীনতাই চায়। এই স্বাধীনতার পূর্বস্বাদই সমগ্র জাতিকে নির্জীবতা ও জড়ত্ব হইতে জাগাইয়া তুলিবে এবং এমন শক্তির জন্ম দিবে যাহার সাহায্যে আমরা জাতীয় লক্ষ্য সাধন করিতে পারিব। আমরা পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সম্মুখে একটি পথই খোলা আছে। যাহারা পূর্ণ ও অবাধ স্বাধীনতা চায় তাহাদের এখন দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিদায় লইতে হইবে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগামীদের একটি দলে সংঘবদ্ধ হইয়া জাতির সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

নিম্নে লীগের কর্মসূচী মুদ্রিত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে জাতির সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। আমাদের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক জীবন হইতে রাজনীতিকে বাদ দেওয়া যায় না। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা বা রক্ষা করা যায় না।

কর্মসূচী

১. অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

মূলনীতি

অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা, সম্পত্তির সম-বণ্টন, সকলের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

শিল্প সম্পর্কে

১. যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে বৃহদাকার উৎপাদন-ব্যবস্থায় লীগ বিশ্বাস করে। কিন্তু ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পকেও উৎসাহ দেওয়া হইবে।
২. মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা হইবে।
৩. রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনের জাতীয়করণ করা হইবে।
৪. শিল্পের পরিচালনা, কর্মচারী নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের বিষয়ে শ্রমিকদের মতামতের স্থান থাকিবে।
৫. শিল্পে মুনাফার অংশ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে।
৬. শ্রমিক, মালিক ও পরিচালকদের মধ্যে সকল বিবাদই নিরপেক্ষ সালিশী বোর্ডের কাছে পেশ করিতে হইবে। উহার উদ্দেশ্য হইবে ধর্মঘট ও লক আউট যেন অনাবশ্যক হইয়া যায়।
৭. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তির উপর করধার্য সহ করারোপ ও আইন প্রণয়নের সাহায্যে ব্যক্তিগত পুঁজির সীমা বাঁধিয়া দেওয়া।
৮. সমবায়ের মাধ্যমে ও অন্যভাবে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হইবে ও সুদের উচ্চতম হার বাঁধিয়া দিয়া মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

৯. কারখানার শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টার কর্মদিবস করা যাইবে।
১০. রাষ্ট্র বেকার ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা দিবে।
১১. শ্রমিকদের সুবিধার জন্য এই-সব ব্যবস্থা করা হইবে :
    ক. অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার জন্য বীমা
    খ. প্রসূতি-কল্যাণ ব্যবস্থা
    গ. শিশুদের জন্য ক্রেশে
    ঘ. শ্রমিকদের বাসগৃহ
    ঙ. পর্যাপ্ত ছুটি ইত্যাদি।

কৃষি সম্পর্কে

১. একই রকম ভূমিপ্রথা
২. রাষ্ট্র সমহারে করের ব্যবস্থা করিবে
৩. রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বাতিল করা হইবে
৪. ক্ষতিপূরণের সাহায্যে জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হইবে।

২. রাজনৈতিক গণতন্ত্র

পূর্ণ স্বাধীনতা

৩. সামাজিক গণতন্ত্র

ক. বর্ণপ্রথা

১. বর্ণপ্রথার অবসান। ইহার মধ্যে পড়িবে :
    ক. অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ
    খ. রাস্তা ও কুয়া ব্যবহারে সকল সম্প্রদায়ের অধিকার
    গ. মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশাধিকার
    ঘ. আন্তঃবর্ণ ভোজন
    ঙ. আন্তঃবর্ণ বিবাহ।

খ. নারীদের সম্পর্কে

নারীজাতির মুক্তি— ইহা বলিতে বুঝাইবে :

ক. পর্দা প্রথার অবসান

খ. মেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা

গ. মেয়েদের দৈহিক ব্যায়াম

ঘ. বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা

ঙ. নারী ও পুরুষের সম-মর্যাদা ; নারীর অধিকার সংক্রান্ত বর্তমান আইনের সংশোধন।

গ. বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে

ক. বহুবিবাহপ্রথা রদ করা হইবে

খ. পুরুষ ও নারীর উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহের বয়স বাড়ানো হইবে ও একটি নিম্নতম বয়ঃসীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে

গ. বিবাহের সময় নগদ অর্থ বা দ্রব্যে পণ দান রহিত করা হইবে।

ঘ. পৌরোহিত্য সম্পর্কে

ক. বংশগতভাবে পুরোহিত ও গুরু হওয়ার প্রথার অবসান

খ. পেশাদার পুরোহিত ছাড়াই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে ব্যক্তিদের উৎসাহ দেওয়া হইবে।

২ অক্টোবর ১৯২৮

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের উদ্‌বোধনী সভায় সভাপতির ভাষণ।

আমরা পথের বাঁকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বর্তমান কর্মসূচী, স্বাধীনতা দূরে থাকুক, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের পক্ষেও উপযোগী নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য একটি দল আবশ্যক।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টে স্বাক্ষর দানের পর আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য হইলাম কেন। সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টের প্রস্তাবনা অংশ পাঠ করিলে দেখিবেন যে, সকল দলের ঐকমত্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রস্তাব পর্যন্ত পেঁীছিয়াছে। উহার বেশি অগ্রসর হইতে অনেকে রাজি হন নাই। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার ব্যক্তিগত অধিকার উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। নানা কারণ বিবেচনা করিয়া আমি সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টের সঙ্গে আমার পৃথক অভিমত যুক্ত করিয়া দিতে বলি নাই। উহা যুক্তিযুক্ত হইত না। তবে আমি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিতে চাহিয়াছিলাম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইস্তফা দিয়াছিলেনও। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কারণ তাঁহাদের মতে ইস্তফা দিবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখন হয়তো ঐ আদর্শ সরাইয়া দিয়া সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্ট অংশত মানিয়া লইবে। আমরা স্পষ্টভাবে বলিয়াছি যে-সব সংস্থা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া লইয়া মাথা ঘামায় সেই-সব সংস্থার সদস্যরা লীগের সদস্য হইতে পারিবে না।

দেশের সামনে আমরা কোন্ কর্মসূচী রাখিব? স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও উদ্ভাবন করিতে হইবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিল বলিয়াই অসহযোগ আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। একটি সুস্পষ্ট ও সরাসরি বাণী দিতে হইবে। আমাদের স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক

কর্মসূচী দরকার। যে-সব নূতন ভাবধারা জগতে আলোড়ন আনিতেছে সেই-সব ভাবধারা সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্য থাকা দরকার।

২ অক্টোবর ১৯২৮

কর্মসূচী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

দেশের সামনে এখনই একটি কর্মসূচী রাখিতে হইবে। আপনারা সে-বিষয়ে ভাবুন ও মতামত দিন। ব্রিটিশ পণ্য বয়কট, লাইব্রেরি আন্দোলন, শ্রমিক ও নারী সংগঠন, আঞ্চলিক সংস্থাগুলির নির্বাচন, পাটচাষ সম্পর্কে প্রচার—এই-সব বিষয়ে আপনারা মতামত দিন।

২ অক্টোবর ১৯২৮

পূর্ণ স্বাধীনতা ও ফেডারাল সংবিধান

৪ অক্টোবর ১৯২৮ নাগপুর তিলক বিদ্যালয় কর্তৃক আহূত জনসভায় প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তর।

আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইল আমার মাতৃভূমির যথার্থ ও বিশ্বস্ত সেবক হওয়া।... সংবিধান রচনা করার কাজ আনন্দদায়কও নয়, প্রেরণাদায়কও নয়। যখন দেশের অবস্থা নৈরাশ্যব্যঞ্জক অনুভূতিতে পূর্ণ ছিল তখন বোম্বাই শহরে একটি কমিটি গঠিত হয়। উহারই উপর ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হয়। ক্রমে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিল। সর্বদলীয় সম্মেলনের পরিশ্রম তাই সফল হইতে পারিয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে অসামান্য কিছু নাই। তবু মোটামুটি ভাবে ইহা উৎসাহ সৃষ্টি করিবে। ইহা একটি মূল্যবান দলিল। সংখ্যালঘু সমস্যা, বিশেষত মুসলমান সংখ্যালঘু সমস্যা শুধু যে আমাদের দেশেই আছে তা নয়; ইউরোপের অন্তত আধ-ডজন দেশে এই সমস্যা আছে।

সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টে আমিও স্বাক্ষর দিয়াছি। এখন আমি উহার সমালোচনা করিতে পারি না, প্রশংসাও করিতে পারি না। আমার অবস্থা তাই কঠিন। তবু দুই-একটি বিষয়ে আমি বলিব। সকলেই জানেন যে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা ও ফেডারাল সংবিধানের পক্ষপাতী। তথাপি আমি জাতীয় ঐকমত্য লাভের আশায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে মত দিয়াছি। পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাইয়া যাইবার স্বাধীনতাও আমার আছে। আমি ফেডারাল সংবিধানের পক্ষপাতী। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে আস্থা সৃষ্টি করার জন্য একটি শক্তিশালী এক-কেন্দ্রিক (ইউনিটারি) কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপন করা আবশ্যক। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যখন আমরা সামলাইয়া লইতে পারিব তখন, আজ হউক বা কাল হউক, সোভিয়েত রাশিয়ার মতো একটি ফেডারাল সংবিধান আমরা উদ্ভাবন করিতে পারিব।

সংবিধান রচনা করার কালে একসময় আমাদের সব প্রচেষ্টা নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। হতাশা লইয়া সংবিধান-প্রণেতারা এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের সমস্যা কমিটি সমাধান করিতে পারিলেন। লক্ষ্মৌয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে এ-বিষয়ে একমতে পৌঁছানো গিয়াছে। কংগ্রেস যদিও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের নীতি মানিয়া লইয়াছেন তবু ঐ বিষয়ে বিতর্ক হইয়াছিল। আমাদের বহু ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিলোপ সাধনের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। তবে ভারতে একটি সর্বজনীন ভাষা থাকিতে পারে এবং থাকা আবশ্যক। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাগুলির অবলুপ্তি ঘটাইয়া ভারতের ঐক্য সাধন করিতে হইবে—এই নীতি কার্যকর হইবে না। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিলে ভারতের প্রগতি ব্যাহত হইবে না, বরং ভারতের প্রগতির পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে। মুক্ত নাগরিকের মৌল স্বাধীনতা ও প্রাথমিক অধিকারগুলির গুরুত্ব এতই বেশি যে এইগুলি যদি আমরা না পাই তবে সংবিধানই হউক আর দায়িত্বশীল সরকারই হউক— বাজে কাগজের ঝুড়িতেই তাহার স্থান হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া আমরা তাহাদের গণতন্ত্রীকরণের চেষ্টা করিয়াছি। বর্তমান ভারত সরকারের যে-সব ক্ষমতা আছে সে-সব ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে। এখনই দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব নয়। কেননা দেশীয় রাজন্যবর্গ কিংবা দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাগণ— কেহই এখনকার সমাধানে খুশি নয়।

মানুষের তৈয়ারি সংবিধানে দোষত্রুটি থাকিবেই। আমরা যে সংবিধান রচনা করিয়াছি তাহাতেও দোষত্রুটি আছে। তবু লক্ষ্মৌ সম্মেলনে আমরা যাহা করিতে পারিয়াছি তাহা সন্তোষজনক হইয়াছে। সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্টের সবচেয়ে বড়ো মূল্য এই যে ইহা লর্ড বার্কেনহেডের দাম্ভিক চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিয়াছে। ভারতের জনসাধারণের এই নিম্নতম দাবিই রিপোর্টে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ভারতে সাইমন কমিশনের করিবার মতো আর কোনো কাজ অবশিষ্ট নাই। আগামী জাহাজেই যদি তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান তবেই সবচেয়ে ভালো কাজ করা হইবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতের এই নিম্নতম দাবি ইংরেজরা যাহাতে মানিয়া লইতে বাধ্য হয় তাহা করাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ। সেই দিকেই এখন আমাদের সকল মনোযোগ দিতে হইবে, এবং ইংরেজদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে আমাদের দাবি না মানিয়া লওয়া পর্যন্ত শান্তি আসিবে না।

কেন ভারত স্বাধীন হইবে

৫ অক্টোবর ১৯২৮ নাগপুরে প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তর।

...আমার মধ্যে আপনারা যদি কোনো সদ্‌গুণ দেখিতে পাইয়া থাকেন তবে তাহা আমার গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দান।...

বর্তমানে দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ দেখা দিয়াছে আমি মনে করি জাতীয় জীবনের ইহা একটি অধ্যায় মাত্র। বিশ্বের অন্যান্য অংশে এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। আমাদের এখানেও ইহা নিশ্চয়ই সমাধান করা যাইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বাড়াইয়া দেখা আমাদের অভ্যাস। কিন্তু শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা মিলাইয়া যাইবে। জাতীয়তাবাদের উচ্চতর চেতনার বিকাশ ঘটিলে সাম্প্রদায়িক চেতনা আর থাকিবে না।

আমরা স্বাধীন হইতে চাই কারণ একমাত্র তাহা হইলেই আমরা ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিব। আমরা যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করি ততদিন আমাদের নিজস্ব আদর্শ অনুসারে কলা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারিব না। বিশ্বে আমাদের একটি মিশন আছে, বিশ্বসংস্কৃতিকে আমাদের সমৃদ্ধ করিতে হইবে। কাহারো কাহারো মনে এই ভয় আছে যে ভারতের একটি মিশন আছে এ কথা বলিলে আমাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি হইবে। আমার মধ্যে ঐরূপ কোনো শংকা নাই।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সেনাপতি জেনারাল আভারির প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। তিনি যে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচীর প্রতি অসন্তোষ ও অতৃপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের তরুণদের নেতৃত্ব দিতে প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা যখন ব্যর্থ হইয়াছেন তখন তরুণরা নিজেদের আলোয় নিজেরা পথ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সেজন্য তাহাদের দোষ দিলে চলিবে না।

সারা বিশ্বে এখন যে যুব-মানসিকতা দেখা যাইতেছে ভারতের যুব-আন্দোলনেও তাহারই প্রকাশ দেখিতেছি। শ্রীআভারি অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন। বর্তমান অস্ত্র আইন একটি অন্যায় আইন। তাহার বিরুদ্ধে তিনি জোরালো প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

বিনাবিচারে বাংলার আটক বন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি আন্দোলন করিয়াছেন। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে, ও বাংলার পক্ষ হইতে আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলার দেশপ্রেমিক সন্তানদের বিনাবিচারে আটকের বিরুদ্ধে একমাত্র তিনিই ফলপ্রদ আন্দোলন করিয়াছেন। জাতিগঠনের জন্য শ্রীআভারি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমার আশা হয়, ভারতজননীর প্রতিটি সন্তান তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

আমরা সাগ্রহ চিত্তে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিব। জাতিগঠনের কাজে আমরা সকল সম্প্রদায়ের কর্মীর সাহায্য চাই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি?

৬ অক্টোবর ১৯২৮ নাগপুরে শ্রীঅভয়ঙ্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভাষণ।

হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধ ও বিসংবাদ পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে মিটাইয়া লইতে হইবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রকে উহার মধ্যে নাক গলাইবার জন্য ডাকিয়া আনা উচিত নয়।

অনেকে রেসপন্সিভ কো-অপারেশনের কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা মন্ত্রীসভায় যোগ দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু মন্ত্রীদের তো কোনো ক্ষমতা নাই। যদি মহাত্মা গান্ধীকেও মন্ত্রী করিয়া দেওয়া হয়, তবে বর্তমান শাসনব্যবস্থায় তিনিও দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ করিতে পারিবেন না। ১৯২১ সালের তুলনায় ভারত এখন অনেক বেশি শক্তিশালী হইয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা কী বস্তু তাহা এখন জনগণকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যদি আমরা চেষ্টা করি তাহা হইলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লইয়া যাঁহারা তৃপ্ত হইতে চান তাঁহাদের হাতও শক্তিশালী হইবে। তাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা বলা উচিত নয়। আমলাতন্ত্রকে বাধা দিবার জন্য একটি সংগ্রামী কর্মসূচী অনুসরণের উপযোগী পরিবেশ দেশে সৃষ্টি করিতে হইবে।

ছাত্রদের প্রতি বাণী

লাহোর ছাত্র-সম্মেলনের উদ্দেশ্যে।

লাহোরের ছাত্রদের কাছে আমার বাণী এই যে তোমরা আংশিক স্বাধীনতার বদলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক— এই পূর্ণাংগ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করো। ইহার একটিকে বাদ দিয়া অপরটি পাওয়া যায় না।

৭ অক্টোবর ১৯২৮

পরিস্থিতির যোগ্য হউন

৭ অক্টোবর ১৯২৮ আকোলা শহরে শ্রীরাম থিয়েটারে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

ভারত দিনে দিনে শক্তিশালী হইতেছে। আমলশাহীর বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা দিনে দিনে সংগঠিত হইতেছে। অসহযোগিতার মনোভাব এখনো জীবন্ত রহিয়াছে। নানা উপায়ে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সাইমন কমিশন বয়কট ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কট তাহার নিদর্শন।

এই সময়ে সরকারের সংগে সহযোগিতা করার কর্মসূচী লইলে তাহার ফল খুব খারাপ হইবে। রেসপন্সিভিস্টরা তাহাই করিতেছেন। আমলাশাহীকে টানিয়া নামাইতে হইলে বিরোধী পক্ষের ঐক্য দরকার। রেসপন্সিভিস্টরা বিরোধী পক্ষের ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দেশকে স্বরাজলাভের পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। বংগীয় বিধান সভার মুসলমান সদস্যদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করিলে আপনারা উহা আরো অনুভব করিতে পারিবেন। তাঁহারা স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হন বলিয়া নিজেদের মধ্যেই এক ডজন উপদল সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতের মুক্তি আসিবে আমলাশাহীর সংগে নানা উপায়ে আমরা অসহ-যোগিতা করিলে, আগামী বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ লইয়া আমরা যুদ্ধে যোগ না দিলে ও অর্থনৈতিক ভাবে আমরা ব্রিটেনকে বয়কট করিলে। অর্থনৈতিক

বয়কটই হইল অব্যর্থ অস্ত্র। গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী স্থলে ও জলে বিজয়ী হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেনকৃত অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখীন হইয়া জার্মানীর সে বিজয় পরাজয়ে পরিণত হইয়াছিল।

লর্ড বার্কেনহেড যে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছিলেন, নেহরু-রিপোর্টের মাধ্যমে তাহার যোগ্য জবাব দেওয়া হইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতির নিম্নতম দাবি নেহরু-রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। উহাতে উচ্চতর দাবি জানাইবার অধিকার সব দলকেই দেওয়া হইয়াছে।

আপনাদের নিকট, বিশেষত তরুণদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা পরিস্থিতির যোগ্য হউন, দেশমাতার পুণ্যবেদীতলে আপনাদের যথাসর্বস্ব নিবেদন করার জন্য প্রস্তুত হউন।

যুব-আন্দোলন

নাগপুরে 'বর্তমান যুব-আন্দোলন' বিষয়ে প্রদত্ত ভাষণ।

কোনো জাতির যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি দেখা দিলে, ঐ চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তির প্রেরণা যদি তাহাদের হৃদয় হইতে জাগিয়া থাকে, তবে উহা ঐ জাতির জীবনের লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতে যে যুব-আন্দোলন দেখা দিয়াছে, উহা বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল হইবার জন্য যুবকদের অন্তঃপ্রেরণাসঞ্জাত আন্দোলন। নতুন চিন্তাধারায় তাহারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধ, সক্রেতিস, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাঁহাদের সমকালীন সমাজকে নূতন চিন্তাধারা দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসীর জীবনধারায় বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী ছিল, নৈরাশ্য ও স্বৈরতন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ধর্মরাজ্য। যুব-আন্দোলনেরও ইহাই মূল বাণী। প্রাচীন বা আধুনিক সকল কালের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। আধুনিক কালে ম্যাটসিনির নেতৃত্বে ইতালি, কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া, এমন-কি চীন ও আফগানিস্তানও রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে উন্নততর ও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা প্রবর্তন

করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজিকার যুবক জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রকেই অবহেলা করিতে পারে না। তাহাদের আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা বলিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা বুঝায়। তাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেই পূর্ণ স্বাধীন হওয়া যায় না।

আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইতে হইবে। ইংরেজরা যখন ভারতে আসিয়াছিল তখন এ দেশে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সামাজিক গণতন্ত্র ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া উহা যে এ দেশে কোনোদিন ছিল না এমন নয়। আমাদের সুদূর প্রান্তে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাই তাহার রূপ কল্পনা করিতে হইবে। ঘটনার যুক্তি ইহাই দাবি করিতেছে। প্রবীণদের মস্তিষ্কে পুরানো ভাবধারা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাই তাঁহারা তরুণদের নেতৃত্ব দিতে পারিবেন না। আমি স্বীকার করিতেছি যে আমাদের প্রবীণ নেতারা সময়ের উপযোগী হন নাই ও যোগ্য নেতৃত্ব দিতেও পারেন নাই। দেশের তরুণদের প্রেরণা দিতে হইবে। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি যখন সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করিতে পারিল না তখন বোম্বাইয়ের যুবকরা আগাইয়া আসিয়া ঐ আন্দোলন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করিয়াছে। দেশের সর্বত্র যুবকদের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের আদর্শ হইবে বিশ্ব যৌবগণরাজ্যের সদস্য হওয়া। আমার আশা এই যে ভারতের যুবকরা পরিস্থিতির যোগ্য হইয়া উঠিবে।

৮ অক্টোবর ১৯২৮

বার্কেনহেডের প্রতি জবাব

৮ অক্টোবর ১৯২৮ নাগপুর টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ।

সর্বদলীয় সম্মেলন আর কিছুই যদি না করিয়াও থাকে তবু অন্ততপক্ষে লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দিয়াছে। পৃথিবীর কোনো দেশের শাসনতন্ত্রই সে দেশের জনসাধারণের সর্বজনীন মতৈক্যের ভিত্তির উপর রচিত হয় নাই। সংবিধান রচনা একটি রোমান্টিক ব্যাপারও নয়। সংবিধানকে বিচার করিতে হইবে তাহার আন্তর মূল্যে নয়—কোন্ পরিবেশে উহা রচিত হইয়াছে ও দেশবাসী উহাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা দিয়া। এই উভয় দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে নেহরু-রিপোর্ট সার্থক হইয়াছে। যদিও সর্বদলীয় সম্মেলনের কাজ শুরু হইয়াছিল অতিশয় নৈরাশ্য-জনক অবস্থায়, কিন্তু নৈরাশ্যের মেঘ কাটিয়া গেল; লক্ষ্ণৌয়ে সমবেত নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে এই রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছেন। নেহরু-রিপোর্ট দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাইয়াছে। সাম্প্রতিক স্মরণকালে এত সমর্থন আর কোনো রিপোর্ট পায় নাই। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সংখ্যালঘুদের সমস্যার মতো অত্যন্ত জটিল কয়েকটি সমস্যার সমাধান নেহরু-রিপোর্টে করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, রিপোর্টটি কাণ্ডজ্ঞান, দেশপ্রেম ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের ভিত্তিতে রচিত একটি মূল্যবান দলিল। আমার আবেদন, আপনারা সকলেই এই রিপোর্টকে সমর্থন করুন। যদিও আমরা কংগ্রেস-সেবীরা এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছি তবু পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কাজ করার অধিকার আমাদের আছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হইল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই, কারণ এই সমস্যা একমাত্র ভারতেই আছে তাহা নয়। যখন অন্যান্য দেশ সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে তখন আমাদের দেশেও জাতীয় বিবেক জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বহুমুখ দৈত্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তাহা না হইবার কোনো যুক্তি নাই।

ভারত বাঁচিয়া আছে কারণ তাহার একটি মিশন আছে। অতীতে সে তাহার নিজস্ব অবদান রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বিশ্বসভ্যতায় সে তাহার

অবদান রাখিবে। ভারত প্রকৃতই হইতে চায় আধুনিক সংস্কৃতির আগার। ভারত তাহার আপন বিশ্বাস ও রুচি অনুসারে তাহার কলা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাইতে চায় বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিতে চায়। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক জিনিস আমরা স্বী-করণ করিয়া লইতে চাই। কিন্তু কেহ আমাদের জোর করিয়া কোনো জিনিস গ্রহণ করাইতে পারিবে না।

একদল যুব-কর্মী মনে করিয়াছিলেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচী তাহাদের যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ দেয় নাই। তাহারাই যুব-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বর্তমান কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট নয় ও তাহাদের সেই অসন্তোষেরই অভিব্যক্তি রূপে যুব-অন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। সারা বিশ্বেই এই মানসিকতা দেখা যাইতেছে। শ্রীআভারির চিত্রের আবরণ আমি উম্মোচন করিয়াছি। তিনি এই অসন্তুষ্টদের দলের একজন। শ্রীআভারির কর্মপন্থার সঙ্গে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু যে মনোভাব লইয়া তিনি অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। অস্ত্র আইন আমাদের দাসত্বের চিহ্ন। কেহ ঐ আইন পছন্দ করে না। স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র ঐ অস্ত্র আইন বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

আগামী কয়েক বৎসর ভারত-ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করিবে। এখন নেহরু কমিটির রিপোর্ট যাহাতে দেশ গ্রহণ করে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সেজন্য সকল কর্মীরই উচিত জনসাধারণের কাছে উহার মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া। নেহরু-রিপোর্টে জাতির যে সর্বনিম্ন দাবি পেশ করা হইয়াছে তাহা মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ বা আমাদের কাহারো পক্ষেই শান্তি থাকিবে না।

সাইমন ফিরিয়া যাও

নাগপুরে গান্ধীচক ময়দানে শ্রীঅভয়ঙ্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণ

রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে সংগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন একসংগে চলিবে। সর্বদলীয় সম্মেলনের কমিটিতে দাক্ষিণাত্যের একজন অব্রাহ্মণ প্রতিনিধিও ছিলেন। সম্মেলনে দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণ সমাজের দাবিও বিবেচিত হইয়াছে। পৌরসভার একজন সদস্যরূপে আমি জানি যে পৌরসভার কাজে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন ভারতে দক্ষ শাসক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না। তবু দেশবাসীদের জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র কল্যাণ করিতে পারিবেন না, এমন তো নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতিরেকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অগ্রগতির ফলে বিশেষ কিছু লাভ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।

অসহযোগ আন্দোলন মরে নাই। শ্বেতশাসনতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রিটিশ পণ্য বয়কট পুরাপুরি করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক বিসংবাদের নিরসন করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া সালিশীর সাহায্যে সরকারকে নাক গলাইতে ডাকিয়া আনা চলিবে না।

বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। মহাযুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়রা যদি তাহাদের দাবি জোরের সংগে জানাইয়া দিতে পারে তবে স্বরাজ সুনিশ্চিতভাবে লাভ করা যাইবে।

সাইমন কমিশন প্রথমবার যখন ভারতে আসিয়াছিল তখন সর্বত্র তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল 'সাইমন ফিরিয়া যাও' ধ্বনি। এবারে আমরা বলিব 'সাইমন ফিরিয়া যাও, কেননা তোমাদের করার কিছু নাই।'

১২ অক্টোবর ১৯২৮

জামশেদপুরে শ্রমিক আন্দোলন

২৭ অক্টোবর ১৯২৮ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি।

বোম্বাই ও কলিকাতার বন্ধুরা আমাকে জামশেদপুরের শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিতেছে। শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই যুক্তিপরায়ণ। শ্রীহোমি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রভাব বজায় রাখিতে পারিতেছেন না। এ কথার অর্থ এই নয় যে শ্রমিকদের কোনো অভিযোগ নাই। মে মাসের হরতালের আগে তাহাদের সত্যই বহু অভিযোগ ছিল। উহার কিছু কিছু এতদিনে দূর হইয়াছে। কিন্তু বহু অভিযোগ এখনো দূর হয় নাই। শ্রমিকরা ঐ-সব অভিযোগ দূর করার পূর্ণ সুযোগ কর্তৃপক্ষকে দিবে। কিন্তু তাঁহারা যদি তাঁহাদের করণীয় না করেন তাহা হইলে আবার গোলযোগ দেখা দিবে। সে ক্ষেত্রে কোম্পানির সঙ্গে আমাকে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নামিতে হইবে, অথবা শ্রমিক সমিতির সঙ্গে আমি আমার সম্পর্ক ছেদ করিব।

কর্তৃপক্ষের সম্মুখে এখন মূল সমস্যা হইল সমহারে বোনাস বণ্টন ও বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, জল ও আলোসহ কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, অফিসাররা যেন শ্রমিকদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। চতুর্থত, স্বেচ্ছামতো শাস্তি দান ও এক কথায় ছাঁটাই বন্ধ করা। পঞ্চমত, অবসর লইবার সময় বৃদ্ধ কর্মচারীদের গ্রাচুইটি দান। ষষ্ঠত, ছুটি ও চাকরি সংক্রান্ত নিয়মের সংশোধন। শেষত, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে যে শ্রমিকরা কাজ করে তাহাদের অভিযোগ দূর করা।

আমি অপেক্ষাকৃত ছোটোখাটো অভিযোগের কথা এখানে বলিতেছি না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হইল, ভারতীয়করণ। উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির কোনো-কোনোটি সমাধান করিবেন ম্যানেজমেন্ট, আবার কোনো-কোনোটির সমাধান করিবেন পরিচালকবর্গ। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে ধর্মঘটের আগে পরিচালকবর্গ শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করিতে যথাসাধ্য করেন নাই। বর্তমানে শ্রমিক জগতে যে আলোড়ন চলিতেছে উহার খোঁজখবর ম্যানেজমেন্ট রাখেন না। শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভার যে অফিসারদের উপর দেওয়া

হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ম্যানেজমেন্টকে তাঁহারা ভুল পরামর্শ দিয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান সহ, অফিসাররাই তাঁহাদের মূঢ় ও সহানুভূতিশূন্য আচরণের ফলে ধর্মঘটকে জোরদার করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মঘট চলাকালে তাঁহাদের এ-হেন আচরণ থামে নাই।

কোম্পানি যদি জামশেদপুরে শান্তি চান তবে আগামী কয়েক মাস পরিচালকবর্গ ও ম্যানেজমেন্টকে সতর্ক থাকিতে হইবে ও শ্রমিকদের সমস্যাগুলির বিষয়ে যথাসত্বর ব্যবস্থা লইতে হইবে। তাঁহারা যদি উদার মনোভাব লইয়া উপরি-উক্ত সমস্যাগুলি একই সঙ্গে সমাধান করিতে অগ্রসর হন, একমাত্র তাহা হইলেই, বোর্ডের চেয়ারম্যান আন্তরিকভাবে যে স্থায়ী শান্তি চাহিতেছেন তাহা আসিবে।

দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো মহলে এই ধারণা আছে যে জামশেদপুরের শ্রমিকরা ভালো বেতন পায়, এমন-কি তাহাদের মাথায় তোলা হইয়াছে। এই ধারণা একেবারেই ভুল। জামশেদপুরের শ্রমিকদের অভিযোগগুলি যথার্থ ও সংগত। ঐ অভিযোগগুলি দূর করিতে হইবে। পুঁজিপতিরা পছন্দ করুন আর নাই করুন, গত কয়েক বছরে শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং এখন আর উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চলিবে না। আমরা এই আন্দোলনকে সুস্থ পথে পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা সফল হইব, না, যুক্তিহীন উচ্ছৃংখল লোকেরা প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা নির্ভর করিতেছে কোম্পানি ও ম্যানেজমেন্টের উপর। আমি ইস্পাত শিল্পকে জাতীয় শিল্প মনে করি ও সেজন্য আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য এই শিল্পের উন্নতির কাজে লাগাইব। জামশেদপুরের ইস্পাত কোম্পানির প্রতি ভারতের মানুষ আশীর্বাদও জানাইয়াছে। কিন্তু আমি আশা করিব কোম্পানিও যথার্থ জাতীয় মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন।

জামশেদপুরের ঘটনা

৩ নভেম্বর ১৯২৮ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি।

জামশেদপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধু ও সহকর্মীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে আমার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র হইতে এত দীর্ঘকাল আমি অনুপস্থিত রহিলাম কেন। তাঁহাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে যে পরিস্থিতিতে আমি জামশেদপুর গিয়াছিলাম এবং যে কারণে আমাকে এখনো সেখানে থাকিতে হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা দরকার।

জামশেদপুরে এ বছরের গোড়ায়ই গোলযোগ শুরু হইয়াছিল। কিন্তু জুন মাসে শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত তৃতীয় হরতালের পর ম্যানেজমেন্ট সাধারণ লক-আউট ঘোষণা করিয়া দিলে গোলযোগ চরমে ওঠে। লক-আউট ঘোষণার পর ম্যানেজমেন্ট তাঁহাদের লোক ছাঁটাইয়ের নতুন নীতি ঘোষণা করিলেন। ফলে, লক-আউট তুলিয়া লইবার পর ছাঁটাই নীতি মানিয়া না লইলে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিবার উপায় রহিল না। এই সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের মি. এন্ডরুজ, শেঠ ও অন্যান্যরা আমাকে জামশেদপুর যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রম বিরোধে আমি জড়াইয়া পড়িতে চাই নাই বলিয়া তখন জামশেদপুর যাই নাই। শ্রমিকরা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্মতি ছাড়াই ধর্মঘট ও হরতাল সংগঠন করিয়াছিল। শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন উহা অনুমোদন করে নাই, বরং ঐ ধর্মঘট ও হরতাল বিধিসম্মত নয় বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাই শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে দেখিয়াও শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন উহা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আগস্ট মাস নাগাদ কোনো সমাধান দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় পরিস্থিতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়া মনে হইয়াছিল। তখন শ্রীহোমির দলের প্রতিনিধিরা বাবা গুরুদিৎ সিংকে লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইবার জন্য তাঁহারা আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের এড়াইয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতে আমি সফল হই নাই। তখন শামসুদ্দিন আহমদ ও লালমোহন ঘোষকে আমি পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য জামশেদপুর পাঠাই। এইভাবে আমি শ্রীহোমির

লোকদের সন্তুষ্ট করি। ১৮ আগস্ট তাঁহারা শ্রীআহমদকে লইয়া আমার কাছে আসেন ও বস্তুতপক্ষে আমাকে জামশেদপুর যাইতে বাধ্য করেন। ২ আগস্ট কোম্পানির প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইবে। কাজেই তাহার আগে আমি না গেলে নাকি ধর্মঘট ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু আমি সেখানে যাওয়ার পর পরিস্থিতির পুরাপুরি পরিবর্তন ঘটে এবং আমার আবেদনে সাড়া দিয়া জামশেদপুরে সাধারণ ধর্মঘট হয়। ম্যানেজমেন্টের উপর তাহা বড়ো রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন এতদিন দূরে দাঁড়াইয়াছিল তাহারাও তখন আমাকে বলে যে মি. এন্ডরুজের অনুপস্থিতিতে আমি যদি তাহাদের সভাপতি হই তবে ঐ সংগঠন ও উহার অর্থ ভাণ্ডার তাহারা আমার হাতে তুলিয়া দিবে। আমি শ্রীহোমি ও তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে, আমার কী কর্তব্য সে বিষয়ে আলোচনা করি। তাঁহাদের অনুরোধে আমি শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হই।

আগস্ট মাসের শেষে কোম্পানির পরিচালকগণ জামশেদপুর আসিলে তাঁহারা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপে আমাকে আলাপ-আলোচনা শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁহারা গত তিন-চার বছর যাবৎ শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছেন! কোম্পানি শ্রীহোমির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চান নাই। তাহার একটি কারণ এই যে তাঁহাদের স্বীকৃত ইউনিয়ন শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে শ্রীহোমির কোনো সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় কারণ, কোম্পানির সঙ্গে তাঁহার অতীত তিক্ত সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনার যৌক্তিকতা সম্পর্কেই তাঁহারা সংশয়ান্বিত। শ্রীহোমি আলাপ-আলোচনার সময় উপস্থিত থাকিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনোভাব কী সে কথা আমি তাঁহাকে বলি। আরো বলি যে তাঁহার উপস্থিতি লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে গোটা আলোচনাই হয়তো ভাঙিয়া যাইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি তাঁহাকে একথাও বলি যে তাঁহার উপস্থিতি যদি কোনো মীমাংসায় পেঁছানোর প্রাক্-শর্ত হয় তবে আমি পরিচালকদের ইহা জানাইব যে শ্রীহোমিকে তাঁহাদের ডাকিতেই হইবে। আমি ইহাও বলি যে সে ক্ষেত্রে আলোচনা ভাঙিয়া গেলে তাহার জন্য শ্রীহোমিই দায়ী হইবেন। তখন শ্রীহোমি তাঁহার আবেদন-নিবেদন প্রত্যাহার করিয়া লন। আলোচনা শুরু হইয়া যায়। আলোচনা চলার সময় সকালে ও বিকালে আমি শ্রীহোমি ও তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।

চীফ এক্‌জিকিউটিভ কলিকাতা কর্পোরেশন। ১৯২৪

শ্রীহোমিকে আমি বলিয়াছিলাম যে কোম্পানির সঙ্গে তাঁহার মিলন ঘটাইবার জন্য আমি চেষ্টা করিব। আমি তাঁহাকে এ আশ্বাসও দিই যে যখন আমরা একই সঙ্গে বাস করিতেছি ও একই সঙ্গে কাজ করিতেছি তখন আলোচনার টেবিলে তাঁহার অনুপস্থিতি কাহারো নজরেই আসিবে না— অবশ্য যদি তিনি নিজেই এ সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া না বেড়ান। কিন্তু এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে গিয়া পরামর্শ চাহিলেন যে তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন কিনা ও করিলে আলাপ-আলোচনা কোন্ পর্যায়ে পেঁছাইলে করিবেন। আমি এই ঘটনার কয়েকদিন পরই শ্রীহোমির কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় সরাসরি তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি ইহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

আলাপ-আলোচনা যখন একটা মীমাংসার কিনারায় আসিয়াছে তখন আমার বন্ধুরা কোম্পানির পরিচালকবর্গ ও শ্রীহোমির মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতের আয়োজন করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই সময় আলোচনা ভাঙিয়া গেল। তাই প্রস্তাবিত সাক্ষাৎটি আর ঘটিয়া উঠে নাই।

পরিচালকবর্গ জামশেদপুর ত্যাগ করিয়া যাইবার পর তাঁহাদের পক্ষে জেনারাল ম্যানেজার মি. আলেকজান্ডার আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। শ্রীমদনমোহন বর্মন ও আমি জেনারাল ম্যানেজারকে শ্রীহোমির সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিসংবাদ মিটাইয়া লইতে বলি। মি. আলেকজান্ডার তখন কোম্পানির দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীহোমির আনুপূর্বিক ইতিহাস বলিলেন। কেন তিনি এবং পরিচালকবর্গ শ্রীহোমির সঙ্গে কোনো কথাবার্তায় আসিতে চান না তিনি তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে, শান্তি স্থাপিত হইবার পর তিনি শ্রীহোমির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইলেন। শ্রীহোমিকেও উহাতে রাজি হইতে তিনি বলিলেন। আমি মি. আলেকজান্ডারকে বলি যে আমি জামশেদপুরে একটি শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি ও সেজন্য পুরানো সংস্থা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনে শ্রীহোমি যোগ দিন ইহা আমি চাই। মি. আলেকজান্ডার বলিলেন যে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনে শ্রীহোমি যোগ দিলে তিনি আপত্তি করিবেন না, কিন্তু পরিচালকবর্গের মনোভাব কী হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

আলোচনা যখন চলিতেছিল তখন আমি শ্রীহোমির দল ও শ্রমিক অ্যাসো-

সিয়েশনের পদস্থ ব্যক্তিদের, যাহা-কিছু ঘটিতেছিল তাহা জানাইয়া গিয়াছি। মীমাংসার প্রস্তাবিত শর্ত শ্রমিকদের মধ্যে সকলেই সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীহোমি। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনিই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান এবং তিনি যে নূতন সংগঠন আরম্ভ করিয়াছেন কর্তৃপক্ষ উহাকে স্বীকৃতি দিন। এই দুইটি বিষয়ে তিনি সফলকাম হইলে, আমরা কোম্পানির নিকট হইতে যে-সকল শর্ত ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছি, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক কমেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করিতে রাজি আছেন। বোম্বাইয়ে তিনি যে শর্ত জানাইয়াছিলেন তাহা, আমরা জামশেদপুরে যাহা আদায় করিয়াছি তদপেক্ষা কম।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আমি শ্রীহোমিকে বলিয়াছিলাম যে মীমাংসায় আসার পথে কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার বাধা হইয়া দাঁড়ানো উচিত নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে একই স্থানে দ্বিতীয় একটি শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা ট্রেড ইউনিয়ন নীতির বিরোধী। আমি শ্রীহোমিকে এই পরামর্শ দিয়াছিলাম যে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনকে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক রূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে হয় সবকয়টি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্বসম্মত কমিটি করা হউক, নতুবা শ্রীহোমি তাঁহার বহুসংখ্যক অনুগামীদের সহায়তায় বর্তমান অ্যাসোসিয়েশনকে দখল করিয়া নিন। আমি তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম যে কোম্পানি ও তাঁহার মধ্যে আমি মিল ঘটাইয়া দিব।

কিন্তু শ্রীহোমি কোনো কথা শুনিলেন না। ১১ সেপ্টেম্বর শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন ও শ্রীহোমির দলের কার্যনির্বাহক কমিটিদ্বয়ের এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ততদিনে মীমাংসার শর্ত আমি জানিতে পারিয়াছি বলিয়া উহা ঐ সভায় পেশ করিয়াছিলাম। সকলেই উহা সমর্থন করেন, যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তখন এই ব্যবস্থাও করা হয় যে যদি পরদিন সকালে মি. আলেকজান্ডার ও আমি মীমাংসায় পৌঁছিতে পারি তবে অপরাহ্ণে আবার উভয় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিদ্বয়ের যৌথ বৈঠক বসিবে ও সন্ধ্যায় একটি জনসভা হইবে। চুক্তির শর্ত লইয়া উভয় সভাতেই আলোচনা হইবে।

১২ তারিখে সকালে মি. আলেকজান্ডার ও আমি একটি বোঝাপড়ায় আসি। আমরা তাই কার্যনির্বাহী কমিটিদ্বয়ের যৌথ বৈঠক ডাকি। শ্রীহোমি

উহাতে বাধা দিয়া বলেন যে তিনি পূর্বে তাঁহার নিজের সংগঠনের কার্য-নির্বাহী কমিটির বৈঠক সারিয়া লইতে চান। আমি বিপদের লক্ষণ দেখিলাম। শ্রীমদনমোহন বর্মণ ও আমি শ্রীহোমির উক্ত বৈঠকে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত লই। আমরা শ্রীহোমির নিকট হইতে আমন্ত্রণ লাভ করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু তাহা পাই নাই। অতএব বিনা আমন্ত্রণেই তাঁহার বৈঠকে আমাদের যাইতে হইল।

আমরা সেই বৈঠকে গিয়া দেখি যে শ্রীহোমি চুক্তির শর্তগুলির বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমি উহাতে আপত্তি জানাইলে তিনি আমাকে হতমান করিতে চেষ্টা করেন। চুক্তির শর্তগুলি বর্জন করিবার জন্য তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি হঠাৎ সভা ভাঙিয়া দেন ও পরের দিন উহা আবার ডাকেন! বহু কষ্টে ও আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা তাঁহার কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিই। শেষ পর্যন্ত ভোট লওয়া হয়। শ্রীহোমির কার্যনির্বাহী কমিটি ১৩—৫ ভোটে চুক্তির শর্তগুলি গ্রহণ করেন।

তারপর হইল জনসভা। শ্রীহোমির সঙ্গীরা একের পর এক উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুক্তির শর্তের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শ্রীশামসুদ্দিন আহমদ, শ্রীমদনমোহন বর্মণ এবং আমিও বক্তৃতা করি। আমাদের বক্তব্য শোনার পর শ্রোতৃবৃন্দ একমত হইয়া চুক্তির শর্তগুলি সমর্থন করেন। শ্রীহোমি যখন দেখিলেন যে তাঁহার অবস্থা সঙ্গিন হইয়া আসিতেছে তখন তিনি বলিলেন যে রায় দিবার আগে শ্রোতারা যেন প্রস্তাবগুলি অন্তত ২৪ ঘণ্টা ভাবিয়া দেখেন। তিনি বলিলেন কেহ যেন পরের দিন কাজে যোগ দিতে না যায়, বরং তাহারা একদিন ধরিয়া আনন্দ-উৎসব করুক। কিন্তু আমরা তাঁহার চাল ধরিয়া ফেলি ও লোকেদের বলি তাহারা যেন পরদিন সকালেই কাজে যোগ দেয়।

পরদিন বেশির ভাগ শ্রমিকই কাজে যোগ দিয়াছিল। ম্যানেজমেন্টের বোকামি ও ভুলের দরুন বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বাড়তির দলে রাখা হইল ও কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা খারাপ ব্যবহারও পাইয়াছে। ফলে শ্রমিকরা ক্ষেপিয়া গেল। শ্রীহোমি সুযোগ পাইয়া চুক্তির নিন্দা করার উদ্দেশ্যে ও আবার নূতন ধর্মঘট ডাকার উদ্দেশ্যে সভা ডাকিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা সারাদিন ধরিয়া আমার বিরুদ্ধে ও চুক্তির শর্তগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাইলেন। সন্ধ্যায় তাঁহার সভায় যে শ্রমিকরা যোগ দিয়াছিল তাহাদের মনোভাব ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র ও কটুভাষায় বক্তৃতা

হইতে লাগিল। আমরা যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম তখন ডেপুটি কমিশনার বলিলেন যে সভার লোকেরা আমাদের প্রতি এত বিরূপ হইয়া আছে যে সভায় আমাদের না যাওয়াই ভালো। আমি বলিলাম যে আমরা ভীত নই ও আমরা সভায় বক্তৃতা করিব। এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে আমরা যেন সভায় প্রবেশ করিতে না পারি। কিন্তু আমরা সভায় যাইবার চেষ্টা করা মাত্র ভিড় সরিয়া গিয়া আমাদের যাইবার পথ করিয়া দিল। আমরা সভায় উপস্থিত হইলাম।

আমরা বক্তৃতা করার পর সভাস্থ লোকেরা শান্ত হইল। তাহারা তখন যুক্তি বুঝিল। তখন শ্রীহোমি মনে করিলেন, তাঁহার কৌশল পালটানো দরকার। তিনি বলিলেন, চুক্তির যে শর্ত হইয়াছে উহার চেয়ে ভালো শর্ত আর হইতে পারে না এবং শ্রমিকদেরও কাজে যোগ দেওয়া উচিত।

কিন্তু শ্রীহোমি বাস্তবিক পক্ষে চুক্তির শর্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই। পরের একটি সভায় তাঁহার একজন সংগী ঘোষণা করিলেন যে তিনি তাঁহার নিজস্ব শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন ভাঙিয়া দিয়া শ্রীহোমিকে সভাপতি করিয়া শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি নূতন সংগঠন আরম্ভ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ১৯২০ সালে যে শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে ও টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস যাহাকে স্বীকৃতি দিয়াছে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও যাহাকে স্বীকৃতি দিয়াছে, মুখের কথায় তাহা ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতা শ্রীহোমির নাই। কিন্তু বাহিরের লোকদের পক্ষে ইহা বোঝা দুষ্কর যে কেন তিনি তাঁহার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সংগে আলোচনা না করিয়াই তাঁহার নিজের সংগঠনটি ভাঙিয়া দিলেন। সেই কার্যনির্বাহী কমিটি শ্রীহোমির ইচ্ছা অমান্য করিয়া চুক্তির পক্ষে ভোট দিয়া সমর্থন জানাইয়াছে। ঐ কমিটির সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ চুক্তির পক্ষে ভোট দিয়াছেন। ফলে তাঁহারা কমিটির সভাপতি শ্রীহোমির বিরাগভাজন হইয়াছেন। শ্রীহোমির হাতে যে টাকা আসিয়াছে তাহার একটি কপর্দকও কোষাধ্যক্ষ পান নাই। জনসভায় টাকার হিসাব সম্পর্কে শ্রীহোমিকে নানারকম প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ হইল তাঁহার সংগঠনকে ভাঙিয়া দেওয়া।

শ্রীহোমির প্রতি গরিব শ্রমিকদের যে কৃতজ্ঞতা ছিল তাহার সুযোগ লইয়া তিনি গত ছয় সপ্তাহ যাবৎ তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিতেছেন। তিনি বলিয়া বেড়াইতেছেন যে যদি তিনি তাঁহার শ্রমিক ফেডারেশনের জন্য চল্লিশ

হাজার টাকা ও ত্রিশ হাজার সদস্য সংগ্রহ করিতে পারেন তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাহাদের সব অভিযোগ মিটাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি ব্যক্তি-গতভাবে আমার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাইতেছেন। এবং ঐ ব্যাপারে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিতেছেন সে সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো। তাঁহার সঙ্গীরা এক সম্প্রদায়কে আর-এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ম্যানেজমেন্ট যাহাই করুক তিনি তাহার ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু এখন এই-সব কৌশলের বিপরীত পরিণাম ঘটিতেছে। আজ শ্রমিকদের মধ্যে বুদ্ধিমান অংশের তাঁহার প্রতি কোনো সহানুভূতি নাই। দেখিলে দুঃখ হয় যে কিভাবে জামশেদপুরের একদা মুকুটহীন রাজা নিজদোষে জনসাধারণের সহানুভূতি ও আস্থা হারাইয়াছেন। তাঁহার সমর্থন যত কমিয়া যাইতেছে তত তিনি মরিয়া হইয়া উঠিতেছেন। এখন তিনি শ্রমিকদের মধ্যে যে অংশ নিরক্ষর ও অনুন্নত তাহাদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ফেডারেশনের সদস্যরা একদিকে তাহাদের মিথ্যা আশা দিয়া ভুলাইতেছে, অন্যদিকে শ্রমিক অ্যাসো-সিয়েশন ও উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিবেকবর্জিত প্রথায় তীব্র প্রচার চালাইতেছে।

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, শ্রমিকদের আবার ধর্মঘট করিবার জন্য উস্কানি দেওয়াই শ্রীহোমির উদ্দেশ্য। ইহার ফলে কোম্পানির নিঃসন্দেহে ক্ষতি হইবে। প্রত্যেকেই জানেন যে কোম্পানি যদি আবার লোকসানের ধাক্কায় পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের হাত হইতে ইহা চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল কোম্পানির ক্ষতি করার জন্যই শ্রমিকদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করা উচিত কিনা।

শিল্পকেন্দ্র রূপে জামশেদপুরের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ ইহা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র রূপ। সকল প্রদেশ হইতেই এখানে লোক আসিয়া জড়ো হয়। প্রত্যেক শ্রমিক-হিতাকাঙ্ক্ষীর উচিত জামশেদপুরে একটি আদর্শ শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া তোলা। কোম্পানি শ্রমিক সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়াছে, উপরন্তু মাহিনার দিন শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। কোম্পানি এইভাবে শ্রমিকদের সাহায্য করিতেছে। নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের অমীমাংসিত কিছু অভিযোগ আছে। কিন্তু শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন থাকিলেই ঐ-সব অভিযোগ দূর করা যাইবে।

শ্রমিকদের ঐক্যে ভাঙন ধরাইয়া শ্রীহোমি শ্রমিকদেরও কল্যাণ করিতেছেন না, পুঁজির মালিকদেরও উপকার করিতেছেন না। যদি একজন ব্যক্তির খেয়াল-খুশি ও মুদ্রাদোষের দরুন জনসাধারণের স্বার্থের হানি ঘটিতে আমরা দিই তবে ভারতের সত্যই দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। জামশেদপুরের শ্রমিকদের বাঁচাইতে হইবে। তাহাদের বাঁচাইতে হইলে সেখানকার ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে দেউলিয়া হওয়া হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের সকল প্রদেশের নেতাদের দৃষ্টি জামশেদপুরের ঘটনাবলীর প্রতি আকর্ষণ করার সময় আসিয়াছে।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ

৭ নভেম্বর ১৯২৮ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'ফ্রি প্রেস' সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা সফল হইয়াছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে একদিকে যেমন নেহরু-রিপোর্ট বাতিল করিয়া দিবার উপায়ও এ. আই. সি. সি.-র নাই, অন্যদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ পরিত্যাগ করিতেও তাঁহারা পারিবেন না— তাই সংবিধানের ভিত্তির প্রশ্নে এ. আই. সি. সি.তে ভাঙন দেখা দিবে। সুখের বিষয়, একটি আপসে পেঁছানো গিয়াছে। যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান ও যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চান উভয় পক্ষের কাছেই এই আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে।

ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। শুভলগ্নে ইহার যাত্রা শুরু হইয়াছে। প্রতিদিনই ইহা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। লীগের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন দ্রুত গতিতে বাড়িয়া যাইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : এ. আই. সি. সি.-র যে সভা হইয়া গেল সেখান হইতে আপনি কী ধারণা লইয়া আসিলেন?

উত্তর : এ. আই. সি. সি.-র সভা খুবই সফল হইয়াছে। নৈরাশ্যবাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে সংবিধানের ভিত্তি কী হইবে সেই প্রশ্নে ভাঙন দেখা দিবে। আমি কলিকাতা হইতে রওনা হইবার আগে 'ফরওয়ার্ড'-এর একজন প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলাম যে এ.আই.সি সি. নেহরু-রিপোর্ট বাতিলও করিয়া দিতে পারিবে না, আবার, পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিত্যাগও করিতে পারিবে না। আমি আরো বলিয়াছিলাম যে এই দুই অবস্থানের মধ্যে আপস ঘটাইতে হইবে। এরূপ আপস ঘটানো সম্ভবও বটে, এবং খুবই বাঞ্ছনীয়। আমার এই আশা পূরণ হইয়াছে বলিয়া আমি খুশি। ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই আপসের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ও এ. আই. সি. সি.-কে উহা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। যে ফর্মুলা গৃহীত হইয়াছে তাহা স্বাধীনতাপন্থী ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনপন্থী— উভয় পক্ষের কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

প্রশ্ন : বোম্বাইয়ে শ্রীসত্যমূর্তির বক্তৃতার যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে— তিনি বলিয়াছেন লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু নেহরু-রিপোর্ট মানিয়া নিয়া বিচারে ভুল করিয়াছেন— আপনার এ বিষয়ে মত কী?

উত্তর : সংবাদপত্রের রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর। শ্রীসত্যমূর্তির কথা ঠিক-মতো বাহির হইয়াছে কিনা জানি না। আমি এ কথা বলিতে পারি যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আমি— আমরা কেহই সর্বান্তঃকরণে নেহরু-রিপোর্ট মানিয়া লই নাই। আমরা ইহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে সংবিধানের ভিত্তি সম্বন্ধে আমরা সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্যান্য বহু সদস্যের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে আমরা স্বাধীনতার সংবিধানের পক্ষে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করি নাই। কেন করি নাই সে কারণগুলি আমরা সেখানেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। ঐ একই কারণে আমরা এই প্রশ্নে সম্মেলনে বিভেদ সৃষ্টি করি নাই। এতৎসত্ত্বেও, যদি কেহ বলেন যে আমরা সর্বান্তঃকরণে নেহরু-রিপোর্ট মানিয়া লইয়াছি তবে তাহা ভুল। এই প্রশ্নে সর্বদলীয় সম্মেলনে ভাঙন না ঘটাইয়া আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করিয়াছি, এ-কথা আমি পূর্বের মতোই এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন যে এ. আই. সি. সি.-র সভায় একজন বক্তা, আপনি নেহরু-রিপোর্টে স্বাক্ষরও দিয়াছেন, অথচ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগও গঠন করিয়াছেন— এই স্ব-বিরোধী কাজের জন্য আপনার সমালোচনা করিয়াছেন?

উত্তর : আমি তাহা জানি। এই সমালোচনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে ঐ বক্তা নেহরু-রিপোর্ট পড়িয়া দেখেন নাই। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকিয়াছিল। আমাকে যখন সর্বদলীয় সম্মেলনের সংবিধান কমিটিতে সদস্যরূপে নিয়োগ করা হইল, তখন সেখানে কাজ করাই ছিল আমার কর্তব্য।

ঐ কমিটির সদস্যরূপে আমার সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল— স্বাধীনতার প্রশ্নে আলাদাভাবে একটি প্রতিবাদী মন্তব্যলিপি পেশ করা, অথবা রিপোর্টের মধ্যেই আমাদের প্রতিবাদের কথা লিপিবন্ধ করিয়া একটি যৌথ রিপোর্ট পেশ করা। আমি শেষ পথটি বাছিয়া লইয়াছি। আমার মনে হয় আমি ঠিকই করিয়াছি। আমি এখনো বলিতেছি যে আমি যদি প্রতিবাদী

মন্তব্যলিপি পেশ করিতাম, তাহা হইলে নানা প্রশ্নে আরো কয়েকটি প্রতিবাদী মন্তব্যলিপি আসিত। সে-ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা একযোগে একটি মাত্র রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। ইহার ফল হইত মারাত্মক। আমি এই সম্ভাবনাকে পরিহার করিয়াছি। অথচ আমি আমার বক্তব্যও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। সংবিধানের ভিত্তির প্রশ্নে আমার প্রতিবাদ আমি মূল রিপোর্টেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। একটি মাত্র যৌথ রিপোর্টও পেশ করা গিয়াছে। আমি আমার সমালোচকদের নিকট হইতে জানিতে চাই যে তাঁহাদের পছন্দমাফিক আর-কোনো পথ কি আমার সামনে খোলা ছিল? আমি তো আর-কোনো বিকল্পের কথা ভাবিতেই পারি না।

আমার মতে নেহরু-রিপোর্ট একটি বিরাট কীর্তিস্বরূপ। আমি ঐ কমিটিতে কাজ করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত নই। আমার প্রতিবাদ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি যৌথ রিপোর্ট পেশ করিয়াছি বলিয়াও আমি দুঃখিত নই। রিপোর্টটি প্রণয়ন না করিলে আমাদের ক্ষতি হইত। তাই আমি রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছি বলিয়া আমার কোনো দুঃখ নাই। রিপোর্টে স্বাক্ষর করার অর্থ এই নয় যে আমি স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার মত এক বিন্দুও পরিবর্তন করিয়াছি। ঐ রিপোর্টে ও লক্ষ্ণৌয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে আমরা কংগ্রেসসেবীরা স্বাধীনতার জন্য আমাদের কাজ করার অধিকার সংরক্ষিত রাখিয়াছি ও এখন ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগ সংগঠিত করিয়া আমরা সেই অধিকার প্রয়োগ করিতেছি।

প্রশ্ন: লালা লাজপত রায় বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির সদস্যরা বিবেকসম্মতভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য হইতে পারেন না। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

উত্তর: আমি লালা লাজপত রায়কে কাহারো চেয়ে কম শ্রদ্ধা করি না কিন্তু সেই শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমি বলিব এই বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোনো যুক্তি নাই। লালা লাজপত রায়ের বক্তব্যের সবচেয়ে ভালো জবাব দিয়াছেন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। আমি শ্রীআয়েঙ্গারের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিব না। তবে আমি এ কথা বলিতে পারি যে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে কমিউনিস্টরা ও আয়ার্ল্যান্ডের পার্লামেন্টে রিপাবলিকানরা সকলেই আনুগত্যের শপথ নিয়া থাকে, যদিও তাহারা চায় সংবিধানকে বাতিল করিয়া দিতে বা উহার আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে। এ-শপথ বিশুদ্ধ সাংবিধানিক শপথ।

আমরা এই শপথ লইয়াও সংবিধানের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নিশ্চয়ই কাজ করিতে পারি। ফলত, লালা লাজপত রায় কেন যে আদৌ প্রশ্নটি তুলিয়াছেন আমি তাহাই বুঝিতে পারি না।

তাহা ছাড়া লালাজী তাঁহার বক্তৃতার গোড়ার দিকে বলিয়াছেন যে স্বরাজ লাভের জন্য যে-কোনো পন্থা গ্রহণেই তাঁহার আপত্তি নাই। ইহাই যদি লালাজীর মত, তবে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্যদের আইন সভায় প্রবেশে আপত্তি করিতেছেন কেন? আমার নিজের সম্পর্কে ইহা বলিতে পারি যে আমি একই সঙ্গে আইন সভার সদস্য ও ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের বিশ্বস্ত ও সক্রিয় সদস্য হইতে পারি।

প্রশ্ন : ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কিরূপ বলিয়া আপনি মনে করেন?

উত্তর : লীগের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। শুভলগ্নে ইহার জন্ম হইয়াছে ও প্রতিদিন ইহা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। লীগের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। আমরা সবেমাত্র আমাদের সংবিধান রচনা করিয়াছি। সবচেয়ে বড়ো যে কাজটি এখন আমাদের করিতে হইবে তাহা হইল পার্টির নীতি ও কর্মসূচী ছকিয়া ফেলা। আমার কোনো সন্দেহ নাই যে কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই আমাদের কর্মসূচী প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

জামশেদপুরের শ্রমিক আন্দোলন

৮ নভেম্বর ১৯২৮ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি।

জামশেদপুর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাইতেছে যে এতদিন ধর্মঘটে যিনি নেতৃত্ব দিয়া আসিয়াছেন সেই শ্রীমানেক হোমির জনসাধারণের উপর প্রভাব ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিছুদিন আগে শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন তিনি শুরু করিতে চাহিয়াছিলেন। গরিব শ্রমিকদের নিকট হইতে তিনি বহু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহাদের তিনি আশা দিয়াছিলেন যে তাহাদের অভিযোগ সব দূর করিয়া দিবেন। কিন্তু শ্রমিক ফেডারেশন তাহাদের অভিযোগ দূর করার ব্যাপারে কোনো কাজে আসিবে না বলিয়া শ্রমিকরা ফেডারেশনের সদস্য হইতে চায় নাই। তাই ফেডারেশনের প্রচারকরা চাঁদা না নিয়াই সদস্য করা শুরু করিয়াছে।

শ্রমিক ফেডারেশনের প্রভাব যত কমিয়া যাইতেছে, উহার সদস্যরা তত মরিয়া হইয়া উঠিতেছে। তাহারা কেহ কেহ শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও কর্মীদের মারধোর করা শুরু করিয়াছে। কয়েকদিন আগে শ্রীআনওয়ারুল হক রাত্রে একা একা যাইতেছিলেন। শ্রমিক ফেডারেশনের কয়েকজন গুন্ডা-প্রকৃতির সদস্য তাঁহাকে মারে। গত ২ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীমানেক হোমি কর্তৃক আহূত এক সভায় শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শ্রী এন. সি. মুখার্জিকে কয়েকজন গুন্ডা মারধোর করিয়াছে। ঐ সভায় শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্যগণ কয়েকটি অসত্য কথা বলায় শ্রীমুখার্জি আপত্তি জানান। তখন তাঁহাকে প্রহার করা হয়। এই ধরনের কৌশলের ফল কিন্তু বিপরীত হইতেছে। কারণ এই ধরনের কৌশলের ফলে শ্রীহোমির জন-প্রিয়তা কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু আশংকা হয় যে যদি ঘন ঘন মারধোর করা হইতে থাকে তবে হয়তো পাল্টা মার হইবে ও তখন শান্তি ভংগ হইবে।

লালা লাজপত রায়

১৭ নভেম্বর ১৯২৮ জামশেদপুরে 'ফ্রি প্রেস'-এর প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার

লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর সংগে সংগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একজন প্রধান প্রবক্তার জীবনাবসান ঘটিল। লাল-বাল-পালের যুগ হইতে লালাজী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ও সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যুগের সংগে পা ফেলিয়া চলিয়াছেন ও চিরদিন জাতীয় সৈন্যদলের পুরোভাগে রহিয়াছেন। কিন্তু যে-সব স্বদেশবাসী তাঁহার মতো দ্রুত চলিতে পারেন নাই তাঁহাদের সংগেও তিনি যোগ হারান নাই। তাঁহাকে হারানোর ক্ষতি ভারতের পক্ষে সহ্য করা কঠিন, বর্তমান সংকট মুহূর্তে তাহা আরো কঠিন। আজ তাঁহার মৃত্যু প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দুর্যোগ বিশেষ ; তাই সমগ্র জাতি আজ শোক করিতেছে।

আমাদের হৃদয় এখন শোকে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাই এখন বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের প্রতি তাঁহার শেষ দানের কথা আমি আনন্দ ও গর্বের সংগে স্মরণ করিব। সাইমন কমিশন যখন লাহোরে গিয়াছিল লালাজী তখন জনগণের সেবক রূপে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন এবং সানন্দে নেতৃত্বের মূল্য দিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য পুলিশের লাঠির আঘাত যে দায়ী নয় এ কথা কে বলিতে পারিবে ?

সম্প্রতি তাঁহার সংগে আমার দুইবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল—একবার লক্ষ্ণৌয়ে, আর একবার দিল্লীতে। লক্ষ্ণৌয়ে সর্বদলীয় সম্মেলন প্রধানত যাঁহাদের জন্য সফল হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের একজন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও অন্যান্য বিতর্কমূলক বিষয়ে তাঁহাকে ছাড়া ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। লক্ষ্ণৌয়ের পর নেহরু-রিপোর্টকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি প্রচুর খাটিয়াছিলেন। দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন। আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কাপুরুষোচিত আক্রমণ সম্পর্কে আবেগ ও ক্ষোভের সংগে দিল্লীতে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় যে-সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা সকলকে বিচলিত করিয়াছিল।

নিয়তির বিধানে আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইবার আগে তিনি তাঁহার সকল

সম্পত্তি জাতিকে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেশবন্ধু দাশের অনুরূপ দানের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই হইল মহাপুরুষদের জীবন-ধারণ ও মৃত্যুবরণের রীতি। লালাজীর প্রতিভা ও শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল; তিনি খ্যাতি ও গৌরবের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এমন সময় মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া গেলেন। তাঁহার এ মৃত্যু সুখের মৃত্যু। কিন্তু তাহার পরাধীন দেশের গতি কী হইবে?

দেশের নিকট কর্মসূচী

২১ ও ২২ নভেম্বর ১৯২৮ অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পথে কিছু বাধা উপস্থিত হইয়াছে। তাই গত বৎসরে আমরা যত-কিছু করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম তাহার সবটা পারি নাই। এক বৎসর আগে আমরা যখন এই সভা করিয়াছিলাম তখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বর্তমান ছিল। সৌভাগ্যবশত উহা বর্তমানে আর নাই। আমাদের সম্মুখে কর্মীর অভাব ছিল একটি বড়ো সমস্যা। ভাগ্যক্রমে যে-সব ভাইরা কারামুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা আবার কংগ্রেস কমিটিগুলি গড়িয়া তুলিতেছেন ও দেশে কংগ্রেসের ভাবাদর্শ প্রচার করিতেছেন। এ কথা সত্য যে তাঁহাদের স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশা করিতেছি যে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত বাংলার যুবকরা অনুসরণ করিবেন।

বর্তমান মুহূর্তে দেশের যে চিত্র উপস্থিত হইয়াছে তাহা খুবই উজ্জ্বল ও আশাব্যঞ্জক। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রায় নাই। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাতির প্রাণে নব ভাব সঞ্জীবিত করিয়াছে। বিদেশী বস্ত্র ও পণ্য বয়কটের আন্দোলন খাদির উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

দেশ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এরূপ বলিয়া আমার আশা হয় যে বর্তমান বৎসরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দেশে কংগ্রেসের কাজ আরো জোরের সঙ্গে চালাইতে পারিবে।

নূতন বৎসরে কংগ্রেস প্রতি জেলায় একটি স্থায়ী পাটকেন্দ্র গড়িবার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিবে। ঐ কেন্দ্রগুলি শুধু পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করিবে না, পাটচাষীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়াও সাহায্য করিবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা একটি স্থায়ী শ্রম পর্ষৎ গঠন করিব। উহা শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা লইবে। কংগ্রেস শুধু শ্রমিক সংগঠন গড়িতেই সাহায্য করিবে না, সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাও করিবে।

তৃতীয়ত, বি. পি. সি. সি. বাংলায় কংগ্রেস কমিটিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিবে। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান মুহূর্তে ঐ

কমিটিগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে। আশা করি, সদস্যদের সংখ্যা ও কমিটির সংখ্যা আগামী বৎসরে অতি দ্রুত বাড়িয়া যাইবে।

চতুর্থত, আমরা আশা করিতেছি যে আমরা এমন একটি প্রকল্প উদ্ভাবন করিতে পারিব যাহার ফলে একদিকে কংগ্রেস, অন্যদিকে জাতীয় বিদ্যালয়, খাদিকেন্দ্র, দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান— এই উভয়ের মধ্যে ফলপ্রদ সহযোগিতা ঘটিতে পারিবে।

কিন্তু আগামী দুই মাসের জন্য আমাদের একমাত্র কর্মসূচী হইবে কংগ্রেস ও প্রদর্শনীর সার্থক ব্যবস্থা করা। ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে যে প্রতিনিধিরা বাংলায় আসিবেন তাঁহাদের সুখসুবিধা দেখা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর কর্তব্য। তাঁহারা যেন কোনো অসুবিধা বোধ না করেন। অভ্যর্থনা সমিতিতে যত বেশি সদস্য করা সম্ভব তাহা করিতে হইবে।

প্রদর্শনীতে যাহাতে বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় সেজন্যও সদস্যদের যথাসাধ্য করিতে হইবে। প্রদর্শনীটিকে বাংলার বিচিত্র কুটিরশিল্পের সৃষ্টিসম্ভারের ভাণ্ডার করিয়া তুলিতে না পারিলে আমরা শুধু কংগ্রেসের প্রতি নয়, বাংলার প্রতিও আমাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইব। যাত্রানুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক দিকটি আমাদের অতিথিদের কাছে তুলিয়া ধরাও আমাদের কর্তব্য।

গত বৎসর বাংলার বাহির হইতে বারবার ডাক আসায় আমি বাংলার জন্য সর্বান্তঃকরণে খাটিতে পারি নাই। আমি আশা করি এ বৎসর আমি শুধু বাংলার জনাই কাজ করিতে পারিব।

স্যার জন সাইমনের আচরণের প্রতিবাদ

২৫ নভেম্বর ১৯২৮ 'ফ্রি প্রেস'-এর প্রতি স্যার জন সাইমনের আচরণের প্রতিবাদে বিবৃতি।

স্যার জন সাইমন 'ফ্রি প্রেস অফ ইন্ডিয়ার' প্রতি যে আচরণ করিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্মিত হই নাই। বরং আমি খুশি হইয়াছি, কেননা স্যার জন তাঁহার উদারনৈতিক মতবাদের অন্তঃসারশূন্যতা ইহাতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের সংবাদপত্র— ভারতের জনসাধারণের মতোই— এখন যে শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত আছে তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চাহিলে তাহাকে বহু প্রযত্ন করিতে হইবে। 'ফ্রি প্রেস অফ ইন্ডিয়া' এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহাকে আমি ভালোবাসি ও যাহার কল্যাণ আমি চাই। আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই যে ভারতীয় সংবাদপত্রের অন্যান্য বিভাগের মতো ফ্রি প্রেসও এই আক্রমণ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকিবে ও বর্ধিত মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হইবে। ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের, কলিকাতা শাখার সচিব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আগ্রহশীল ব্যক্তিদের সম্মেলন ডাকিয়া যে বিজ্ঞজনোচিত কাজ করিয়াছেন আমরা সেজন্য কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রয়াস সফল হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মীবৃন্দের প্রতি

৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ অনুষ্ঠিত কলিকাতা কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ আ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণ।

কর্মচারীদের এই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমি বারবার অনুরুদ্ধ হইয়াছি। নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তবু আজ যে আসিলাম তাহার কারণ কর্মচারীদের এই সংগঠন আমার খুব প্রিয়। কর্পোরেশনে নানা ভূমিকায় আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে— কার্যনির্বাহী অফিসার, কাউন্সিলার, কংগ্রেস দলের সদস্য ইত্যাদি ভূমিকায়। তাই এরকম সভায় আমার অবস্থা কতকটা বিচিত্র ধরনের। আপনারা যতগুলি প্রশ্ন তুলিয়াছেন আমি তাহার সব কয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিব না, পাছে ভুল বুঝিবার অবকাশ ঘটে। বিভাগীয় প্রধানরা আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন না বলিয়া আপনারা অভিযোগ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওয়া চলে না। তাঁহাদের পদের দরুন কতগুলি সীমাবদ্ধতা তাঁহাদের মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু সাধারণ কর্মীরা অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিন। চাঁদার পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। কেরানীদেরও লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অন্যদের মতোই তাঁহারাও জনগণের সেবক। জনগণের সেবকদের আচরণ কেমন হইবে তাঁহারা সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। তাঁহাদের পক্ষে তাহাই হইবে গৌরবজনক কাজ। আপনাদের বেতন ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্পর্কে আপনারা একটি তুলনামূলক বিবৃতি প্রস্তুত করুন। অন্যান্য সরকারী সংস্থার কর্মচারীরা কী বেতনাদি পান, আর আপনারা কী পান তাহা ঐ বিবৃতিতে দেখাইবেন। তথ্য ও সংখ্যার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা না করিলে কিছুই লাভ করা যায় না।

প্রথমেই আর-একটি কথা আমার বলা উচিত। এরকম সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসা সম্বন্ধে আমার দ্বিধার আর-একটি কারণ এই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাদের অসুবিধা ও অভিযোগ দূর করা সম্ভবত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমার অসহায়ত্বের কারণ যে আপনারা বুঝিবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। আমার মনে হইয়াছিল যে আমি যখন জানি যে আপনাদের জন্য আমি বিশেষ কিছু করিতে পারিব না তখন এমপ্লয়িজ

অ্যাসোসিয়েশনের সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া উপদেশ বর্ষণ করায় কোনো লাভ নাই। কিন্তু আমার দ্বিধা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে আসিতে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। তাই আজ এই সভায় আমি উপস্থিত হইয়াছি।

এখন আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বলিব। আপনারা যেভাবে এখানে সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন সেজন্য আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ। আমি জানি আপনাদের অধিকাংশের হৃদয়ে আমার প্রতি দুর্বলতা আছে। আমি যে অল্পকালের জন্য এখানে অফিসার ছিলাম সে সময় আমি এমন কিছু করি নাই যাহার জন্য আপনারা আমার প্রতি এত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করিতে পারেন। তবে আমার প্রতি আপনারা যে মনোভাব পোষণ করেন আপনাদের প্রতিও আমার মনোভাব তদ্রূপ। এখানে যে কয়েকমাস আমি অফিসার রূপে ছিলাম সে কয়টি মাস আমার জীবনের একটি আনন্দের অধ্যায়। কর্পোরেশনের কর্মচারীদের সম্পর্কে আমি বরাবরই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, এখনো করি। আমার বিশ্বাস, বিশ্বের যে-কোনো স্থানের সমপর্যায়ের অফিসার ও কর্মচারীদের সমান দক্ষতা তাঁহাদের আছে। অবশ্য আমি বলিতেছি না যে আপনারা সকলেই আদর্শ পুরুষ। আমিও নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ বলিয়া দাবি করি না। কিন্তু আমাদের মানবিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এই কর্পোরেশনের কর্মচারীদের আমি বিশেষ প্রশংসা করি। কিন্তু যতটুকু করিয়াছেন তাহাতেই তৃপ্ত থাকিবেন না। আমি মনে করি এই কর্পোরেশনের কর্তব্য, কর্মচারীদের দৃষ্টিকোণ হইতে সকল দিকে একটি মান স্থাপন করা। আপনাদেরও চেষ্টা করা উচিত যাহাতে জনসাধারণের সেবক রূপে আপনারা একটি মান স্থাপন করিতে পারেন। আপনাদের সম্মুখে যখন এত উচ্চ আদর্শ আছে তখন কর্পোরেশনের সেবায় আপনাদের সর্বোত্তম অংশ আপনারা দিতে উদ্বুদ্ধ হইবেন; নতুবা নিরুদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িবেন। আমাদের অন্তরের প্রেরণাই আমাদের উচ্চস্তরের কর্মে লইয়া যাইতে পারে। কর্পোরেশন সর্বদাই অতীব উচ্চ আদর্শ নিজের সম্মুখে রাখিবে।

অন্যদের যেমন অভিযোগ আছে আপনাদেরও তেমনি অভিযোগ আছে। নিজেদের সংগঠিত করিয়া ও ক্রমাগত প্রচেষ্টার দ্বারাই আপনারা এই-সব অভিযোগ দূর করিতে পারিবেন। আপনাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা যথেষ্ট আছে এ কথা আমি বলিব না। আমি এ কথাও বলিব না যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ের কর্মচারীদের তুলনায় আপনাদের অবস্থা খুবই খারাপ। আপনাদের

কেহ কেহ ভালো বেতন পান ; অনেকে তাহা পান না। আপনাদের যে অভিযোগ আছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করা চলে না। আপনাদের সামনে সমস্যা হইল ঐ-সব অভিযোগ কিভাবে দূর করা যায়। আমার সুনিশ্চিত মত এই যে একমাত্র অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সংগঠন ও ক্রমাগত প্রচেষ্টার দ্বারাই অভিযোগগুলি দূর করার আশা আপনারা করিতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার অবস্থার কথা আমি আপনাদের বলিয়াছি। কিন্তু হয়তো সময়ের পরিবর্তন ঘটিবে। আমারও হয়তো ইহার চেয়ে ভালো অবস্থা আসিবে। যাহাই হউক আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই যে আপনারা আত্ম-নির্ভরতার বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমি খুশি যে আপনারা আরম্ভটি ভালোভাবে করিয়াছেন। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন যাহাতে শুধু কেরানীদের সমিতি না হইয়া দাঁড়ায় তাহা দেখিবেন। যদি আপনাদের উপস্থিতি অনুভব করাইতে চান, যদি অফিসারগণ ও কর্পোরেশন উভয়েই আপনাদের স্বীকাব করুক ইহা চান, তাহা হইলে আপনাদের দেখিতে হইবে যেন কর্পোরেশনের সকল কর্মচারী বহু সংখ্যায় এই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন।

আমার ধারণা, সভায় যতগুলি বিষয় উত্থাপন করা হইয়াছিল সবগুলি সম্পর্কেই আমি আলোচনা করিয়াছি। আপনারা যে-সব অভিযোগের কথা এখানে বলিয়াছেন বা বলিতে পারিতেন সেগুলি কতটা যথার্থ আমি ইচ্ছা করিয়াই সে সম্পর্কে আলোচনা করি নাই। দুইটি কারণে আমি তাহা করি নাই। প্রথমত, কর্পোরেশনের বিভিন্ন কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আমার খুব ভালো মনে নাই ; দ্বিতীয়ত, আমি আগেই যাহা বলিয়াছি যে আমি মোটামুটি নিজেকে অসহায় মনে করিতেছি বলিয়া এই-সব অভিযোগের বিশদ বিবরণে গিয়া কোনো লাভ হইবে না। কিন্তু নিম্নতর কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন খতাইয়া দেখা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের কর্তব্য। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমপর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তুলনা করিয়া একটি মেমোরান্ডাম বা তুলনা-মূলক বিবৃতি প্রস্তুত করাও অ্যাসোসিয়েশনের কর্তব্য।

অভিভাষণ

২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ সর্বদল সম্মেলন মণ্ডপে নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই বৎসর কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, দেশের যুব-আন্দোলন ধীরে ধীরে নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিতেছে। অনেকে হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বদল মহাসম্মেলনের সহিত একই সময়ে এই কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহার কার্যকারিতা কমিয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, যুব-কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই খর্ব করিতে পারিবে না। আমাদের জীবনযাত্রার পথে অনেক রাজনৈতিক সমস্যা আছে— আমি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা কম বলিতেছি না কিন্তু যুবকদের নিকট যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আরো গুরুতর। আমাদের বর্তমান জীবনে যে-সকল গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এই কংগ্রেস হইতে নিশ্চয়ই তাহার সমাধানের পন্থা নির্দিষ্ট হইবে। যুবকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর; সুতরাং এই কংগ্রেসের কার্য যে বিশেষ ধীরতার সহিত পরিচালিত হইবে তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। সুতরাং এরূপ গুরুতর স্থলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সম্বর্ধনা করিবার ভার পাইয়া আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করিতেছি।

দেশ হইতে বাহির হইয়া বিশ্বের দিকে চাহিলে প্রত্যেক দেশে একই দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িবে এবং তাহা তরুণের জাগরণ। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে, যে দিকেই তাকাই-না কেন সে দিকেই যুব-আন্দোলনের প্রধান উৎস কোথায় এবং ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

তরুণ তরুণীদের যে-কোনো সমিতিকে যুব-সমিতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কোনো সমাজ-সংস্কার সংঘ বা দুর্ভিক্ষ-সাহায্য সমিতিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুব-সমিতি বলা যায় না। বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং তাহার দূরীকরণের চেষ্টার ফলে যে যুব-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহাকেই বাস্তবিক যুব-সমিতি

নাম দেওয়া যায়। যুব-আন্দোলন শুধু সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, উহা পুরাতনকে ভাঙিয়া চুরিয়া একটা নূতন সৃষ্টি করে। যুব-আন্দোলনের সৃষ্টির পূর্বে চাই বর্তমান অবস্থাজনিত একটা চাঞ্চল্য, একটা অধৈর্যের ভাব। আজিকার যুব-আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর বা পাশ্চাত্য দেশের সৃষ্টি নহে। এইরূপ আন্দোলন প্রতি যুগে প্রতিদেশেই হইয়াছে। সক্রেটিস ও বুদ্ধের সময় হইতে মানব-সমাজ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগে যুগে সমাজকে নূতনভাবে গড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যুগের যুব-আন্দোলনের মূলেও ঠিক সেই আদর্শ ও চেষ্টা আছে। রুশিয়ার বলশেভিকবাদ, ইটালীর ফ্যাসিস্ট আন্দোলন কিংবা তুরস্কের তরুণ আন্দোলন অথবা চীন, পারস্য বা জার্মানীর তরুণ আন্দোলন, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করুন-না কেন সর্বত্রই এক মনোভাব, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত দেখিবেন। যেখানেই প্রাচীন নেতাদের নির্দিষ্ট পথ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই সেইখানেই যুবকরা সমাজকে নূতন ভাবে গড়িয়া উহাকে নব কলেবর দান করিয়াছে।

শুধু যে জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী, চীন পারস্য ও আফগানিস্তানের যুবকরা জাগিয়াছে তাহা নহে। আমাদের দেশে স্বপ্নবিলাসীদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই জাগরণ শুধু বাহিরের জাগরণ নহে, ইহা প্রাণের জাগরণ। ভারতের যুব-সম্প্রদায় প্রাচীন নেতাদের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এখন আর অন্ধভাবে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে রাজী নহে। তাহারা ইহা বেশ বুঝিয়াছে যে, তাহাদিগকেই নতুন ভারত গড়িতে হইবে, তাহাদিগকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে হইবে। তাহারা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ ও ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতেছে। এই সংকট মুহূর্তে ভারতের শুভকামী সকলেরই এই আন্দোলন সম্বন্ধে নির্ভয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ করা উচিত। আন্দোলনের দোষগুণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। আমি আজ দেশের মধ্যে দুইটি আন্দোলন বা দুইটি দেশের চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই বিষয়ে আমি যে দুইটি চিন্তাধারার উল্লেখ করিলাম তাহার একটি সবরমতী ও অপরটি পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত। দুই চিন্তাধারার মূলে দার্শনিকতা কতখানি আছে এ স্থলে আমি তাহার আলোচনা করিব না। আমি সংসারের লোকের মতো বাস্তবিক কার্যকারিতার দিক হইতে উহাদের কতটা মূল্য আছে এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

সবরমতী চিন্তাধারা

সবরমতী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে, আধুনিক যাহা-কিছু সব মন্দ, অধিক পরিমাণ কিছু উৎপাদন অত্যন্ত অশুভজনক, অভাব ও জীবিকানির্বাহের মান বাড়ানো উচিত নহে, আমাদিগকে আবার গো-যানের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম চর্চা ও সামরিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে হইবে।

পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারা

পণ্ডিচেরী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা যে শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছু মহৎ নাই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান, অনেক সৎকার্য থাকিলেও ঐরূপ যোগ করা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য দ্বারাই মাত্র বর্তমান অবস্থায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব। প্রকৃতিকে জয় করিতে হইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে ; এবং চারিদিক হইতে আমরা যেরূপভাবে বিপদ-জালে জড়িত, তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্বলতামাত্র। এই চিন্তাধারার নিষ্ক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের এই দেশে যোগী, ঋষি বা আশ্রমের প্রবর্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে। আমাদের যোগী-ঋষিদের আদর চিরকালই থাকিবে। কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে চাই, যদি ভারতকে নূতন করিয়া গঠন করিতে চাই তাহা হইলে তাহাদের পন্থায় চলিলে হইবে না। এই সত্য কথা বলিতে যাইয়া যদি আপনাদের মনে আমি কোনোরূপে আঘাত করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে মার্জনা করিবেন। ঐ দুই চিন্তাধারার মূলে যে দার্শনিক ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আমি এখানে উহার আলোচনা করিতেছি না। আমি বাস্তবতার দিক হইতেই উহাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলাম। আমরা এখন ভারতবর্ষে চাই প্রবল কর্মবাদ। আমাদিগকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক যুগের সহিত মিলমিশ করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা আর এখন পৃথিবীর একপ্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে পারিব না। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে তাহার আধুনিক শত্রুর সহিত

আধুনিক উপায়ে সংগ্রাম করিতে হইবে— রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিকেই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। গো-যানের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং তাহা আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সমগ্র পৃথিবীতে আন্তরিক ভাবে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হইবে ততদিন ভারতবর্ষকে আধুনিকভাবে সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। দর্শন, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের শিখাইবার অনেক জিনিস আছে। এককথায় আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সকল জাতির মধ্যে এই কার্য করিবার যোগ্যতা আমাদের অধিক আছে। আমাদের দেশের মনীষী ও কর্মীগণের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যেই গুরুতর কার্য আরম্ভ করিয়াছেন! আমাদিগকে একদিকে যেমন "বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাও" চীৎকারে বাধা দিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশূন্য পরিবর্তনের বিরোধিতাও করিতে হইবে।

দেশের কোনো স্থানেই তরুণ-আন্দোলন যাহাতে কেবল মাত্র পরামর্শ এবং আলোচনার মধ্যে নিবন্ধ না থাকে সে বিষয়ে আমাদের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইয়া বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এবং প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিলে তাহার ফলে শুধু একটি বিতর্ক-সমিতি গড়িয়া উঠিবে। অবশ্য ইহাতে দেশের রাজনৈতিক জীবন আরো প্রেরণা লাভ করিবে। কিন্তু শুধু বিতর্ক-সভা থাকিলেই চলিবে না। যুবকদের অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদিগকে সমস্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। এইভাবেই আজ বোম্বাইয়ের যুব-আন্দোলন এত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরো একটি বিষয়ে আমি যুবকগণকে সতর্ক করিয়া দিব। অনেক সময় কোনো আন্দোলনের প্রারম্ভে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই নবজাগ্রত উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায় মিলাইয়া যায়, আলস্য এবং জড়তা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করে এবং আন্দোলনের সমস্ত প্রাণ এবং শক্তি নষ্ট

হইয়া যায়। আমি আশা করি, আমাদের তরুণ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এরূপ হইবে না।

বিশ্বব্যাপী তরুণ-আন্দোলন আজ পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। এশিয়া এবং ইউরোপের সমস্ত দেশেই রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লবে যুবকগণ চিরদিনই এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুত্থান, আয়ার্ল্যান্ডের রাজনৈতিক মুক্তি, মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইটালীর ফ্যাসিস্ট আন্দোলন, আফগানিস্তান এবং তুরস্কের নবজাগরণ, চীনের পুনরুত্থান— সমস্তই ঐ-সব দেশের তরুণ আন্দোলনের ফলে সম্ভব হইয়াছে।

আবার মনে হয়, যে-সব দেশ ইতিপূর্বে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই-সব দেশ অপেক্ষা বৈদেশিক প্রভুত্বাধীন-জর্জরিত ভারতবর্ষেই তরুণ-আন্দোলনের প্রয়োজন বেশি।

বোম্বাই প্রাদেশিক যুব-সংঘের সভাপতি রূপে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার ফলে আমি গর্বের সহিত এই মত পোষণ করি যে এদেশের যুবক পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের যুবক অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে; বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্য দেশের যুবকের ন্যায় ভারতের যুবকও কর্তব্যনিষ্ঠা, অবিচল স্বদেশপ্রেম, সাহস, আত্মত্যাগ এবং সর্বোপরি স্বাধীন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মহৎ গুণে ভূষিত। ভারতের যুব-আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এখন যে জিনিসগুলির একান্ত প্রয়োজন তাহা এই : একটি উপযুক্ত সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, একজন সাহসী বীর ও নিঃস্বার্থ নেতা এবং সর্বোপরি বর্তমান মানসিক দৃষ্টি এবং দূষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন।

দীর্ঘদিন যাবৎ বৈদেশিক শাসনের ফলে জাতির মানসিক ও শারীরিক এবং নৈতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আজ ভারতেরও এই অবস্থা হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বের ফলে যে কেবল এই বিশিষ্ট সভ্যতাসম্পন্ন প্রধান জাতিরই সর্বপ্রকার অধঃপতন হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষময় ফল সমগ্র বিশ্বমানব-সমাজের উপরে গিয়াও পড়িয়াছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতেই গভর্নমেন্ট এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায়, এ দেশের

লোককে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া, অর্থাৎ, তাহাদের নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ দেশহিতৈষী অথবা উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তোলা গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। লর্ড মেকলের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু সরকারী চাকুরি করিবার জন্য কতকগুলি কেরানী সৃষ্টি করা।

প্রত্যেক সভ্য দেশেরই শিক্ষার আদর্শ দ্বিবিধ— একটি জীবিকা অর্জন, অন্যটি চরিত্র গঠন। কিন্তু এ দেশে শিক্ষার এই দ্বিতীয় দিকটি শুধু উপেক্ষিতই হয় না, পরন্তু এদিকে কোনো উৎসাহই প্রদান করা হয় না। এ দেশের শিশুগণ প্রথম হইতেই এই শিক্ষালাভ করে যে ভারতের প্রতি ইংরেজ রাজাদের দয়া অসীম, তাঁহারা এ দেশে সুখ-শান্তি আনয়ন করিয়াছেন, এবং যদি তাঁহারা এ দেশকে রক্ষা না করেন তবে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। প্রথম হইতেই শিশুর এই ধারণা হয় যে, ব্রিটিশ শাসনের সুফলের জন্য আমাদের ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এবং সে মনে মনে এই আশঙ্কা পোষণ করে যে এই রাজত্ব যেন চিরকাল বজায় থাকে, কেননা ইহা না থাকিলে দেশের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা কিছুই থাকিবে না।

সমস্ত পাঠ্য পুস্তকই এই ধরনের অর্থহীন বাজে কথায় পরিপূর্ণ থাকে। বেচারা শিক্ষক ছাত্রগণকে এই শিক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু তিনি যাহা শিক্ষা দেন তাহার একটি কথাও বিশ্বাস করেন না; সম্ভবত, তিনি তাঁহার দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কিন্তু কী করিবেন তাঁহার কোনো উপায় নাই। হয় তাঁহাকে এই বিশ্রী কাজ লইতে হইবে, নতুবা চাকুরি হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। এইভাবে ভারতীয় শিশুকে তাহার ছাত্রজীবন আরম্ভ করিতে হয় এবং এই অনিষ্ট তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়া পর্যন্ত চলে।

নিখিলভারত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

৩০ ডিসেম্বর ১৯২৮ রবিবার সকালে দেশবন্ধুনগরে হিন্দুস্থানী সেবাদল সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

বন্ধুগণ,

হিন্দুস্থানী সেবাদল সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মান দান করিয়াছেন। আমি এইজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কংগ্রেস-সপ্তাহে এই অধিবেশনের আয়োজন হওয়ায় সকল দিক দিয়াই ভালো হইয়াছে। হিন্দুস্থানী সেবাদল কংগ্রেসেরই একটি শাখা-প্রতিষ্ঠান মাত্র; সুতরাং কংগ্রেসের অনুগামীদিগকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকটেও ইহা সর্বপ্রকার উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা বর্তমান ভারতের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। সর্বসাধারণের নিকট হইতে সেইরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই সেবাদল দেশের যথার্থ সেবা করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে। কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে সঠিকভাবে তাহা বলিবার সময় এখনো আসে নাই। তবে ডাঃ হার্ডিকার ও তাঁহার সহকর্মীগণ যে আদর্শ দেশমধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার উচ্চ প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সংঘের আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও প্রশংসার যোগ্য। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এই কর্মীদল যতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখিয়াই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া যায়।

বন্ধুগণ, এই সম্মেলনে দীর্ঘ বক্তৃতা দান নেহাত অশোভন হইবে। এই নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলনে আমরা প্রধানত পরস্পরের হৃদয়ের প্রীতি জানাইতে, কার্যের আলোচনা করিতে এবং ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বলিয়া দিতেছে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের মতো পরাধীন দেশে বড়ো কিছু করিতে হইলে সুশৃঙ্খলাই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়। শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে

আমাদিগকে নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করিতে হইবে। স্বেচ্ছাসেবক সংঘের মধ্য দিয়াই আমাদের প্রাণে এই-সমস্ত গুণ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা বহুদিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবহেলা দেখাইয়াছি, আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে ভারতের কতিপয় অংশে স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু বাকী কতগুলি অংশে এ-বিষয়ে দৃষ্টিই দেওয়া হয় নাই।

রাজরোষের ফলে বাংলার মতো কতগুলি প্রদেশে ইহা যথারীতি বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয় যে, জাতির সংকট সময়ে দেশব্যাপী সর্বত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্যেই জগতের সকল জাতির মধ্যে জাগরণ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব কিনা, তাহা অনেকাংশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপরই নির্ভর করিবে।

স্বেচ্ছাসেবকদের কর্তব্য

স্বেচ্ছাসেবকের কর্তব্য কঠোর। যদি সে নিজের বিবেকের সন্তোষ ও দেশবাসীর প্রীতি লাভ করিতে চাহে তবে তাহাকে কতগুলি গুণের অধিকারী হইতে হইবে। তাহাকে সাহসী, স্বার্থহীন, সংযত ও বিনয়ী হইতে হইবে। বহুদিনের শিক্ষা ব্যতীত একজনের মধ্যে এই-সমস্ত গুণের সমাবেশ বড়ো দেখা যায় না। কিছু উপযুক্ত শিক্ষার ফলে যদি সমস্ত গুণ একবার স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের আয়ত্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এই সংঘবদ্ধ জাতীয় সৈন্যবাহিনী সমস্ত দেশবাসীরই শ্রদ্ধা ও গৌরবের পাত্র হইয়া উঠিবে।

স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দেরও এই বিষয়ে খুব বড়ো দায়িত্ব আছে। তাহাদের নিজেদের আচরণ দ্বারা অধীনস্থ কর্মীবৃন্দকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। তাঁহাদের চরিত্র ও শিক্ষার উপরেই স্বেচ্ছাসেবকদলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে; আর যুব-সম্প্রদায়ের প্রতি আমার বিশ্বাস অসীম। তাঁহারা দিন দিনই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন; দিন দিনই তাঁহাদের চরিত্র উন্নত হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় জীবনের সকল পরীক্ষাই তাঁহারা সাহস ও বিক্রমের সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হিন্দুস্থানী সেবাদল নামে আপত্তি

বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে আমি আর-একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করিতে চাই, 'হিন্দুস্থানী সেবাদল' নামটা আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। ইহা কেবল আমার ব্যক্তিগত অভিমত নহে, ইহা এই প্রদেশের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকেরই সম্মিলিত মত। স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের পতাকা ও নাম এইরূপ হইবে যে তাহা যেন সকলের প্রাণই স্পর্শ করে। এইজন্য ইহার বর্তমান নাম পরিবর্তন করা উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অন্যান্য দেশের সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জাতীয় সৈন্যবাহিনীর একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার অন্তর্গত প্রাদেশিক বাহিনীগুলিকে ভিন্ন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কোনো প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান যদি, 'হিন্দুস্থানী সেবাদল' নাম গ্রহণ করিতে চাহে তবে অবশ্য তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই।

যুব-আন্দোলনের প্রসার

সমস্ত দেশব্যাপী যুব-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার বর্তমান সময়ের একটি বিশেষত্ব। স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সংগে ইহাকে যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। যুবকদিগকে শিক্ষা দিয়া স্বেচ্ছাসেবকে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শারীরিক ব্যায়াম চর্চা অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই এমন এক শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিবে যাহারা ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবে।

বন্ধুগণ, স্বেচ্ছাসেবকের কার্য খুব মহৎ, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে দেশবাসীর নিকট হইতে তাহারা উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি লাভ করিতে পারে না। আমরা সকলেই জাতীয় আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক। আমরা এমনভাবে জীবন যাপন করিব যেন সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভে সক্ষম হই। যদি আমরা এই সংকল্পে দৃঢ় হই তবে শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে যখন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেশবাসীর গর্বের পাত্র হইয়া উঠিবে। জাতীয় আন্দোলনে একজন যোগ্য সৈনিক হওয়ার চেয়ে আমার জীবনে আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য নাই। ভগবান করুন, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান দিনে দিনেই উন্নত হউক এবং তাহাদের উদ্যমে অচিরেই ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হউক।

হিন্দীভাষা ও বাঙালী

রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।

আপনাদের আজ আন্তরিক আনন্দের সহিত আমরা কলিকাতায় অভ্যর্থনা করিতেছি। যাঁহারা এ শহরের কথা জানেন তাঁহাদের বোধহয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে এই নগরে প্রায় পাঁচ লক্ষ হিন্দীভাষী লোক আছেন। ভারতের আর-কোনো শহরে এত অধিক সংখ্যক হিন্দীভাষী ব্যক্তি নাই। আমি হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত নহি; দুঃখের সহিত আমি স্বীকার করিতেছি যে, হিন্দীতে আমি ভালো করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতেও পারি না।

আধুনিক হিন্দীর জন্ম

অবশ্য আমার কাছে আপনারা আধুনিক হিন্দীর ইতিহাস শুনিবার আশা করেন না। আমার বন্ধুদের নিকট আমি শুনিয়াছি যে, আধুনিক হিন্দী গদ্যের জন্ম কলিকাতাতেই হইয়াছে। এই নগরেই লালুজিলাল তাঁহার 'প্রেম-সাগর' ও সদল মিশ্র তাঁহার 'চন্দ্রাবতী' লেখেন। শুনিয়াছি যে, এই দুইজন লেখককেই আধুনিক হিন্দী গদ্যের যুগপ্রবর্তক বলা হয়।

কলিকাতায় প্রথম হিন্দী প্রেস ও দৈনিক

প্রথম হিন্দী প্রেস কলিকাতাতেই স্থাপিত হয়; এবং প্রথম না হইলেও অন্যতম প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র এই কলিকাতা হইতেই বাহির হয়। সেই পত্রিকার নাম 'বিহার বন্ধু'; সুতরাং দেখা যাইতেছে হিন্দী সাংবাদিক জগতেও কলি-কাতার স্থান নগণ্য নয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দী

এখানে এ কথাও আমার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম হিন্দীকে সম্মান দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষার বিষয় করিয়া লয়। এখনো পর্যন্ত হিন্দী সাংবাদিক জগতে ও সাহিত্যে কলিকাতা নেতৃ-স্থানীয় হইয়া আছে। সুতরাং কলিকাতাকে এক হিসাবে হিন্দী-ভাষীরা নিজেদের বলিয়া মনে করিতে পারেন। আশা করি, আমাদের অভ্যর্থনার

ত্রুটির জন্য যদি তাঁহাদের কিছু অসুবিধা হইয়া থাকে, তাঁহারা তাহা মার্জনা করিবেন।

বাঙালী বিরূপ নয়

প্রথমত, আমার হিন্দীভাষী বন্ধুদের মন হইতে আমি একটি ভুল ধারণা দূর করিতে চাই। তাহাদের ভিতর অনেকের ধারণা যে, আমরা বুঝি হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার পক্ষপাতী নই। অনেকে অতদূর মনে না করিলেও মনে করেন যে, আমরা এ-বিষয়ে উদাসীন। শুধু অশিক্ষিত ব্যক্তি নয়, শিক্ষিত অনেক ব্যক্তিরও এইরূপ ধারণা; কিন্তু আমাদের তাঁহারা সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন এবং তাঁহাদের এই ভুল দূর করা আমাদের কর্তব্য।

বাঙালীর হিন্দী অনুরাগ

হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি ছাড়া ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা হিন্দীর জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করিয়াছে বলিলে আপনারা, আশা করি, আমাকে অহংকারী বা প্রাদেশিকতাদুষ্ট মনে করিবেন না। হিন্দী প্রচারের কথা অবশ্য আমি মনে করিতেছি না। স্বামী দয়ানন্দ ও তাঁহার আর্য সমাজ হিন্দী প্রচার আন্দোলনের যে বিপুল প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহা আমি অবশ্য ভুলি নাই এবং মহাত্মা গান্ধী হিন্দী প্রচারের জন্য এতদিন ধরিয়া কী করিয়া আসিতেছেন তাহাও আমি জানি। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়াই আমি এ কথার আলোচনা করিব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দী ভাষাকে সর্বসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য ও বিহারে দেবনাগরী অক্ষরের চলন করিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা কি হিন্দীভাষীরা ভুলিতে পারেন? পাঞ্জাবে শ্রীনবীনচন্দ্র হিন্দীর জন্য যে বিপুল আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহাও আমার বোধ হয় কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

বাঙালী অগ্রণী

গত শতাব্দীর শেষ দিকে বিহার ও পাঞ্জাবের হিন্দীভাষীরাই যখন এ আন্দোলনের প্রতি উদাসীন বা বিমুখ ছিলেন তখন এই দুই বাঙালীই ওই দুই

প্রদেশে হিন্দীভাষার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে হিন্দী প্রচার কার্যের অগ্রণীদের সম্মান তাই ইঁহাদের প্রাপ্য।

চিন্তামণি ঘোষ

তাহার পর ইন্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষ হিন্দী সাহিত্যের যে মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন তাহার কথাও বলা প্রয়োজন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের জন্য এই প্রবাসী বাঙালী যাহা করিয়াছেন আর-কোনো হিন্দীভাষা প্রকাশক তাহা করিতে পারিয়াছেন কিনা আমি জানি না।

সারদাচরণ মিত্র

পরলোকগত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রও এ-বিষয়ে যে-সব কাজ করিয়াছিলেন তাহাও আপনারা বোধহয় জানেন। তিনি 'লিপিবিস্তার পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ও 'দেবনাগর' নামে একটি মাসিক পত্রের জন্মদাতা। দেব-নাগরী অক্ষর প্রচারের জন্যই তিনি উক্ত মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'হিতবার্তা'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন একজন বাঙালী। এখনো হিন্দী 'বঙ্গবাসী' আমাদের এই বাঙলারই একজন অধিবাসী চালাইতেছেন।

আধুনিক হিন্দী ও বাঙালী

এখনো বাঙালীরা হিন্দীভাষার সেবা করিতেছেন। হিন্দী সাংবাদিকরূপে আজ ৪৫ বৎসর ধরিয়া শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী যে কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভুলিলে তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। 'বিশ্বকোষের' হিন্দী অনুবাদ করাইয়া শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু হিন্দী ভাষার প্রভূত উপকার করিতেছেন। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও হিন্দীতে 'বিশাল ভারত' বাহির করিয়া কম কাজ করিতেছেন না। বাংলা হইতে হিন্দীতে যে অসংখ্য বই অনূদিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি অহং-কারের বশবর্তী হইয়া এই-সমস্ত কথা বলি নাই। আপনাদের এই-সমস্ত কথা জানাইয়া আমি শুধু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এই-সমস্ত জানিয়াও বাঙালী হিন্দী ভাষার প্রতি বিমুখ— এ কথা বলা যায় কিনা। আমরা অবশ্য আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসি এবং সে ভালোবাসা বোধ হয় অপরাধ নয়।

অমূলক ভয়

আমাদের ভিতর কাহারো কাহারো মনে এই ভয় আছে যে হিন্দী প্রচারের চরম উদ্দেশ্য হয়তো আমাদের মাতৃভাষার উচ্ছেদ করা। এ ভয় অমূলক। আমি যতদূর জানি ইংরাজির স্থানে হিন্দুস্থানী চালানোই হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্য। যে বাংলা ভাষাকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালোবাসি তাহা আমরা কখনোই পরিত্যাগ করিব না। অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য হিন্দুস্থানী শেখা আমাদের উচিত। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের যুবকদের একটি বা দুইটি পাশ্চাত্যভাষা, যথা— ফরাসী বা জার্মানও শিখিতে হইবে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইলে ইহা তাহাদের শিক্ষা করা প্রয়োজন।

হিন্দী ও উর্দু অক্ষর

আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষার জন্য হিন্দী বা উর্দু কী অক্ষর ব্যবহার করা উচিত সে প্রশ্ন আমি এখন তুলিব না। মহাত্মাজীর সঙ্গে আমিও এ-বিষয়ে একমত যে, হিন্দী ও উর্দু উভয় অক্ষরই আমাদের এখন শেখা প্রয়োজন। পরে ইহাদের ভিতর যেটি অধিকতর উপযোগী তাহা আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরল হিন্দী ও সরল উর্দুর ভিতর কোনো প্রভেদ নাই। সুতরাং এ প্রশ্ন লইয়া আমাদের কলহ করা নিষ্প্রয়োজন। সমস্যা আমাদের সম্মুখেই এখন যথেষ্ট ; তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কোনো লাভ হইবে না।

বাংলায় হিন্দী শিক্ষা

মহাত্মাজী ও হিন্দীভাষী ব্যক্তিদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে মাদ্রাজ প্রদেশকে হিন্দী শিখিবার জন্য যেরূপ সুযোগ আপনারা দিয়াছেন, আমাদের বাংলা ও আসামকেও সেইরূপ সুযোগ দেওয়া আপনাদের উচিত। বাংলার যুবক ও কর্মীদের হিন্দী শিখাইবার স্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত আপনারা করিতে পারেন। কলিকাতাতেই বহু যুবক হিন্দী শিখিতে ইচ্ছুক কিন্তু শিক্ষক কোথায়? বাংলা খুব ধনী নয় এবং ছাত্রদের হিন্দী শিক্ষার খরচ দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

কলিকাতার হিন্দীভাষী ধনী ব্যক্তিরা যদি বাংলার যুবকদের হিন্দী শিখাইবার সংকল্প করেন তাহা হইলে সে-সংকল্প কার্যে পরিণত করা বিশেষ

কঠিন হইবে না। বাঙালী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়া তাহাদের আপনারা হিন্দী প্রচারক করিতে পারেন। আপনারা আমাদের চার-পাঁচ মাসে কথিত হিন্দী ভাষা শিখাইয়া কোনো প্রকারে সার্টিফিকেট দিতে পারেন। আমার মতো অবসরহীন ব্যক্তিকেও আপনাদের ছাত্র-তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের যোগ দিতে হয়, সেজন্য হিন্দুস্থানী জানার প্রয়োজন প্রতিদিন গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করি। হিন্দুস্থানী না জানিলে উত্তর ভারতের শ্রমিকদের অন্তরে প্রবেশ করিতে আমরা পারি না। আপনারা যদি হিন্দী শিখাইবার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা যে আপনাদের অযোগ্য ছাত্র হইব না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।

বাঙালী যুবকদের প্রতি আবেদন

পরিশেষে আমি বাঙালী যুবকদের হিন্দী শিখিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদের এজন্য যে-মাহিনা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের তাহাই দেওয়া উচিত। পরে অবশ্য এ-প্রদেশে হিন্দী প্রচারের ভার আমরাই গ্রহণ করিব কিন্তু এখন হিন্দী-ভাষী প্রদেশগুলির উচিত আমাদের সাহায্য করা।

হিন্দী যাহারা শিখিবে তাহাদের সংখ্যা বেশি কি কম তাহা লইয়া বেশি মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এ-আন্দোলনের পিছনে যে মহৎ প্রেরণা আছে তাহা আমি শ্রদ্ধা করি। যাঁহারা এ আন্দোলনের নেতা তাঁহাদের দূরদৃষ্টি আছে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের এ আন্দোলনে ফল ফলিবে। প্রাদেশিকতা ও আন্তঃ-প্রাদেশিকতার ঈর্ষা দূর করিবার পক্ষে এই রাষ্ট্রীয় ভাষা মহাস্ত্র।

নিজের নিজের প্রাদেশিক ভাষার আমরা যথাসাধ্য চর্চা করিব। তাহাতে কেহ বাধা দিতে চাহে না। সেখানে কোনো বাধা আমরা সহিতে পারি না। কিন্তু হিন্দী হইবে আমাদের জাতীয় ভাষা। নেহরু-রিপোর্টেও সেই কথা বলা হইয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিলে বাংলায় হিন্দী প্রচার সার্থক করিতে পারিব। অদূর ভবিষ্যতে হিন্দী স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮

কলিকাতা কংগ্রেস

সংশোধন প্রস্তাব

১. "মাদ্রাজ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীদিগের একমাত্র কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এই কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিতেছে ; কংগ্রেসের বিশ্বাস ব্রিটিশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন না হইলে এ দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

২. সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য লক্ষ্ণৌয়ে সর্বদল সম্মেলনে নেহরু কমিটির যে-সকল মন্তব্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিতেছে।

৩. নেহরু কমিটি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া রিপোর্ট রচনার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে শাসনপদ্ধতির খসড়ার মূল বলিয়া স্বীকার না করিলেও কংগ্রেস মনে করে— রিপোর্টের মন্তব্যগুলি রাজনীতিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল। কংগ্রেস রিপোর্টের সকল কথা সমর্থন না করিয়া সাধারণভাবে উহা অনুমোদন করিতেছে।"

প্রস্তাবটির পক্ষে বক্তব্য

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহাত্মা গান্ধী যে প্রস্তাবটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং যে প্রস্তাব আমাদের প্রধান নেতৃবর্গের সকলের না হইলেও অধিকাংশের সমর্থন পাইয়াছে, সেই প্রস্তাব সংশোধনকল্পে আমার দাঁড়াইতে হইতেছে বলিয়া আমি দুঃখিত। আজ আমাকেই যে এই সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইতেছে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, কংগ্রেসের নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে একটা মতভেদ, হয়তো গুরুতর মতভেদ রহিয়াছে। আমার বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, পূর্বে নেহরু-রিপোর্টে নাম সহি করিয়া আজ কি করিয়া আমি স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছি। আমি কেবল নেহরু-রিপোর্টের একটি অংশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। সেই অংশটিতে আমার এবং আমি যাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিতেছি তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট

আলোচনা রহিয়াছে। রিপোর্টের ২৪ পৃষ্ঠায় আমরা বলিয়াছি যে রিপোর্টে আমরা যে শাসনতন্ত্রের নির্দেশ করিতেছি তাহা উপনিবেশের শাসনতন্ত্র হইলেও, তাহার অনেকগুলি নির্দেশ স্বাধীন জাতির শাসনতন্ত্ররূপে সর্বাংশে গৃহীত হইতে পারে। আমরা যে ঐরূপ শাসনতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ঐ অবধি দাবি করিতে সম্মত আছেন। ইহা হইতে এই বোঝা যায় না যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কংগ্রেসের সদস্য অথবা কংগ্রেস নিজে তাহার জন্য আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিবে। যাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, তাঁহাদের সেই আদর্শানুযায়ী কাজ করিবার সকল অধিকারই রহিয়াছে এবং রিপোর্টের নির্দেশমতোই স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবার সকল অধিকারই আমার আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আর তাহা যদি করি, তাহা হইলে আমার পক্ষে অসংগত হইবে, আমি তাহা মনে করি না।

তরুণ বাংলা চায় মুক্তি

আমার সংশোধন-প্রস্তাবের দাবি প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টার আগে আমি আমার ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে বিষয়-নির্বাচন সমিতির এক অধিবেশনে এবং সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলিয়াছিলাম যে আমাদের প্রবীণ নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ইচ্ছা আমার নাই। তাহার কারণ এই যে আমি তখন প্রস্তুত ছিলাম না। কংগ্রেসে আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে দায়িত্বের বোঝা আমাদের কাঁধে পড়িবে, তাহা বহন করিবার শক্তি আমি তখন ভিতরে ভিতরে অনুভব করি নাই। আজ আমি সেই শক্তি অনুভব করিতেছি। এই প্রস্তাবের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ফল ধারণ করিতে আজ আমি প্রস্তুত। সম্প্রতি এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে আমার পূর্বেকার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। এবং প্রথমেই আপনাদের আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমি যখন বলিয়াছিলাম যে আমি প্রবীণদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিব না, তখনো আমি আপস প্রস্তাবের সমর্থন করি নাই, তখনো আমি তীব্রভাবে আপস প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আপনারা জানেন যে বাংলার প্রতিনিধিরা এক সভায় সমবেত হইয়া আপস প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই সভায়, সর্বসম্মতিক্রমে না

হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হয় যে আপস প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেই হবে। যদি এই প্রস্তাব লইয়া আজ আমি আপনাদের সামনে না দাঁড়াইতাম, তাহা হইলে আমি জানি, অপর কোনো লোক এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেন। তারপর আরো একটি কথাও আমি আপনাদের জানাইয়া রাখিতে চাই। সেই কথাটি এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগও অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে স্থির করেন যে, আপস প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেই হইবে। আমরা নিজেরাও মনে করিয়াছি আপস প্রস্তাবের প্রতিবাদ হওয়াই দরকার। আজ আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, দেশের এমনই একটা অবস্থা আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষকে সংশয়বিহীনচিত্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে হইবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব কী। আমি আমাদের নেতাদের বলিয়াছি এবং এখনো বলিতে চাই যে, লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর, যে-কারণে তাঁকে প্রাণ দিতে হইয়াছে তাহা জানিবার পর, লক্ষ্নৌ এবং কানপুরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর, রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতার পর আমরা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম এমন কিছু করিবার জন্য যা আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার উপযোগী হয়।

আজ জাতিকে শক্তিমান করিয়া আগাইয়া লইয়া যাইবার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাইতেছি এমন একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহার ফলে, মনে হয় আমাদের আদর্শ ক্ষুন্ন করা হইবে। একদিনের জন্যও আমরা আমাদের পতাকা অবনত দেখিতে চাই না। কংগ্রেসের জয়-পরাজয় লইয়া তরুণ ভারত মাথা ঘামায় না। তাহারা চায় দেশকে মুক্ত করিতে এবং তাহার সকল দায়িত্বও তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আমাদের প্রবীণ নেতাদের চাই, আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধা করি, আমরা তাঁহাদের ভালোবাসি— কিন্তু আমরা আগাইয়া যাইতে চাই। আমাদের নেতাদের আমি বলিয়াছি যে, তরুণ ভারতের এমনই উদ্দীপনা রহিয়াছে, যাহার তুলনায় আমি বা আমার শ্রদ্ধাস্পদ-বন্ধু পণ্ডিত জওহরলাল নরমপন্থী বলিয়া মনে হয় এবং আমাদের সহিত যখন তাঁহারা আপস করিতে পারেন না তখন প্রবীণে নবীনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। যুব-আন্দোলনের কাছে আমরা সবাই ঋণী কেননা সেই আন্দোলনের ফলেই জাতির যুবজনের নবচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে। আজ তাহারা উপলব্ধি করিতেছে যে তাহারাই সৃষ্টিধর, দেশ স্বাধীন করিবার ভার তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে। মনে হয় আজ কংগ্রেসের কাজ হইতেছে সাহস অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হওয়া।

তাহা যদি সে না করে, তাহা হইলে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবল হইয়া উঠিবে, প্রবলতর প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে, শক্তিমান, নিষ্ঠাবান সকল কর্মী কংগ্রেস বর্জন করিয়া সেই-সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে আর কংগ্রেসের অবস্থা হইবে বিলাতের লিবারাল দলের মতো। আমি আশা করি কংগ্রেস সময়ের সহিত চলিবার চেষ্টা করিবে, জাতির তরুণদের মনোভাব অবগত হইয়া তাহার কর্তব্য নির্ণয় করিয়া স্থিরভাবে অগ্রসর হইবে।

আর-একটি বিষয় আছে যাহা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তাহা হইল, আন্তর্জাতিক অবস্থা। আপনারা জানেন যে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর বিদেশে আমাদের মান-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিদেশের জাতিসমূহের মাঝে আমরা সম্মানের আসন পাইয়াছিলাম। আজ যদি আমরা মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গ্রহণ করি তাহা হইলে সে-সম্মান সে-প্রতিপত্তি কি অটুট থাকিবে? তাহার পর গত কয়েকমাস যাবৎ সরকার যে-রকম আচরণ করিয়াছে, তাহাও আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার। আপনারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আরো বারোমাস সময় দিতে চান। কিন্তু আমি জানিতে চাই বুকে হাত দিয়া আপনারা কি বলিতে পারিবেন যে, বারোমাসের ভিতর উপনিবেশের অধিকার লাভের এতটুকুও সম্ভাবনা আছে? আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে সে বিশ্বাস তাঁহার যদি না থাকে, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের পতাকা অবনত করিব? কেন আমরা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিব না যে ইংরেজের উপর আমাদের এতটুকুও আর আস্থা নাই। আমরা চাই মুক্তির জন্য বীরের মতো দাঁড়াইতে।

নব মনোভাব

আপনারা হয়তো ভাবিতেছেন, ঐরকম একটা প্রস্তাবের সার্থকতা কি? এই রকম প্রস্তাবের সার্থকতা আছে। আমাদের মনে তা নবভাবের জন্ম দিবে। আমরা কী চাই? আমাদের অধঃপতনের কারণ কী? দাস মনোভাব। এই দাস মনোভাব হইতে মুক্তি পাইতে হইলে দেশের লোকের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমার বিশ্বাস এই প্রস্তাবমতো কাজ যদিও আমরা না করিতে পারি, তবুও কেবলমাত্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই আমরা দাস মনোভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। কিন্তু এ কথা সত্য যে আমরা

কেবল প্রস্তাব পেশ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই থাকিব না। আমরা কাজই করিব, আমাদের প্রোগ্রাম মতো আমরা কাজ করিব। কাজেই এই প্রস্তাব কেবল কথার কথা হইয়া থাকিবে না।

উপনিবেশের দাবির কোনো আকর্ষণ নাই

বাংলার জাতীয় আন্দোলনের সংগে যাঁহার পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে বাঙালী চিরদিনই স্বাধীনতা বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝিয়াছে। আমরা কখনো স্বাধীনতা বলিতে ঔপনিবেশিক অধিকার লাভ বুঝি নাই। স্বাধীনতা, ইংরেজ সম্বন্ধ বিবর্জিত ভারতকেই বুঝিয়া বাংলার তরুণরা স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন অর্ঘ্য দিয়াছে, কবিরা দিয়াছেন কাব্যের অর্ঘ্য। ডোমিনিয়ান স্টেটাসের দাবি বৃদ্ধদের যতই না উৎসাহিত করুক, তরুণদের মনে কোনো রকম মোহই যে জাগাইয়া তুলে না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনোই কারণ নাই।

জাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে তরুণদের লইয়াই। তরুণদের এই প্রস্তাব যে প্রবীণদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ— এ কথা সত্য নয়। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, প্রীতি ভালোবাসা এক কথা আর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা আর-এক কথা। যদি মূল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যে প্রবীণদের সম্মানহানি করা হইবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি প্রবীণরা তরুণদের স্নেহ করেন, তাহাদের কাজ শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তাহাদের ভালোবাসেন। এবং আমার বিশ্বাস যে আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তরুণের নব-চৈতন্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা প্রীতই হইবেন।

সংযোজন

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা বিদ্যাপীঠের পূর্ণ সংস্কারের পর হইতে অধ্যাপনার ভার উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছে— বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত বিদ্যাপীঠের পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজকর্ম নিয়মিতভাবে চলিতেছে। বিদ্যাপীঠে সূতা-কাটা ও বস্ত্রবয়নের জন্য চরকা ও বয়নবিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগে বিদ্যাপীঠের সকল ছাত্রকেই চরকার সূতা কাটিতে হয়— কেবল প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পক্ষে বয়নকার্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত পুস্তকাগার, পাঠাগার, তর্কসভা, মাসিক পত্রিকা ও সমবায় ভাণ্ডারের কার্যকলাপ বিশেষ আশাপ্রদ।

এখনকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা এই যে, কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিসপ্তাহে জ্ঞানী-গুণী-চিন্তাশীল-ব্যক্তিগণের অধিগত বিষয়ের বিশেষ বক্তৃতা হয়।

পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাত্র পাইলে ছাত্রাবাস খোলা হইবে।

বিদ্যাপীঠের কার্যনির্বাহক সমিতি "মধ্য" ও "উপাধি" শ্রেণীর অধ্যয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্বাচন করিয়াছেন :—

মধ্য (দুই বর্ষকাল)

অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়।

১. বাংলা সাহিত্য
২. হিন্দী
৩. ইংরাজী রচনা-পদ্ধতি
৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল
৫. চরকা

— এই সকল বিষয়ের কেবল সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও তিনটি বিষয় স্বেচ্ছা-মনোনয়ন করিতে পারিবেন :—

কলা-বিভাগ

১। সংস্কৃত সাহিত্য ২। ইংরাজী সাহিত্য ৩। অঙ্কশাস্ত্র ৪। ভূগোল ৫। তর্কশাস্ত্র ৬। মনোবিজ্ঞান ৭। ইতিহাস ৮। ফারসী।

বিজ্ঞান বিভাগ

১. পদার্থবিদ্যা ২. রসায়নশাস্ত্র ৩. অঙ্কশাস্ত্র ৪. শারীর-বিজ্ঞান ৫. উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ৬. ভূগোল।

উপাধি (মধ্য-পরীক্ষার পর দুই বর্ষকাল)

অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় :

১. ধনবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া)
২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান (বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া)
৩. বাংলা সাহিত্য
৪. হিন্দী
৫. চরকা

— এই সকল বিষয়ের কেবল সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে ছাত্রগণ যে কোনও একটি বিষয়ে স্বেচ্ছা-মনোনয়ন করিতে পারিবেন :—

১. সংস্কৃত সাহিত্য
২. ইংরাজী সাহিত্য
৩. বাংলা সাহিত্য
৪. দর্শনশাস্ত্র
৫. অঙ্কশাস্ত্র
৬. ইউরোপের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ)
৭. ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচ্যকে ভিত্তি করিয়া)
৮. ধনবিজ্ঞান
৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
১০. ভূগোল
১১. হিন্দীসাহিত্য
১২. ফারসী সাহিত্য।

এখন বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান-বিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষাগার [Laboratory] গঠন করা হইতেছে। আগামী ১৭ কার্তিক, ৩রা নভেম্বর বিদ্যাপীঠ খুলিবে। ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার প্রতি আস্থাবান তাঁহারা অবিলম্বে এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করুন। বিদ্যাপীঠ খুলিবার পর একপক্ষকাল ছাত্রগণকে ভর্তি করা হইবে।

১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিকাতা।
৩রা কার্তিক, ২০শে অক্টোবর
১৯২১

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
সম্পাদক
প্রচার-সংসদ
বঙ্গীয় প্রাদেশিক
রাষ্ট্র সমিতি

বাংলার কথা, ৪ নভেম্বর ১৯২১

কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক। এ প্রস্তাবটিও বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

বিক্রমপুর কর্মী সম্মেলন

২৬ জুলাই ১৯২৩ রিকিবাজারে বিক্রমপুর কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

ইংরেজদের আগমনের জন্য বাঙালীই প্রধানত দায়ী। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত বাঙালীকেই আগে করিতে হইবে। কংগ্রেসের প্রোগ্রামের মধ্যে চাষী, মুটে, মজুর ইত্যাদিকে টানিয়া আনিবার কোনো কথাই পাই না। তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ না করিলে স্বরাজ হইবে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

২৭ অক্টোবর ১৯২৩ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত।

কাউন্সিল সভা

১. বগুড়া ও খুলনার রিটার্নিং অফিসার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুত লালমোহন ঘোষের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হউক এবং তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হউক। মধ্য-কলিকাতা কংগ্রেস-কমিটির রিটার্নিং অফিসার শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর কোনো সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুত ললিতমোহন দাসকে নিযুক্ত করা হউক— এই প্রস্তাব শ্রীযুত কে. এল. পারেখ উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত এল. এন. গার্দে কর্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২. এই সভা স্থির করিয়াছেন যে, কোকনদ কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মনোনয়ন-পত্র ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গৃহীত হইবে, ২ নভেম্বরের মধ্যে ঐ-সকল পত্রের বাছাই হইবে এবং যাঁহাদের নাম নির্বাচিত

হইবে, তাঁহাদের নিকট ১২ নভেম্বর মধ্যে "ব্যালট পেপার" পাঠানো হইবে। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত এ. পি. বাজপাই সমর্থন করার পর উহা গৃহীত হয়।

৩. এই সভা স্থির করিয়াছেন যে বি. পি. সি. সি.-র কাউন্সিলের শূন্যপদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে— ১. শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (গ্রেপ্তার) স্থলে শ্রীযুত ধরানাথ ভট্টাচার্য, ২. মৌলবী মুজিবর রহমানের স্থলে (পদত্যাগ করায়) শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জী, ৩. মৌলবী আস্রাফউদ্দীন চৌধুরীর (পদত্যাগ করায়) স্থলে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, ৪. শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের (পদত্যাগ করায়) স্থলে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ৫. শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (গ্রেপ্তার হওয়ায়) স্থলে শ্রীযুত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ৬. শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর (পদত্যাগ করায়) স্থলে শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। এই প্রস্তাব শ্রীযুত সুকুমাররঞ্জন দাশ উত্থাপন করেন ও শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি সমর্থন করার পর গৃহীত হয়।

৪. ১৯২৩ সালের ১৭ এপ্রিল পুণা কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব মতে বঙ্গীয় জাতীয় কর্মীগণের তহবিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছিল এবং নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি উহা নাকচ করেন ; সেজন্য শ্রীযুত পি. সি. ঘোষকে এই তহবিলের হিসাব-নিকাশ দিতে অনুরোধ করা হউক এবং যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা উক্ত কমিটির সেক্রেটারির নিকট দেওয়া হউক— এই প্রস্তাব মৌলানা মহম্মদ, এম্. ইস্‌লামাবাদী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত এল. এন. গার্দে সমর্থন করার পর উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

৫. উক্ত কমিটির আগামী অধিবেশন পর্যন্ত চরমনাইর রিপোর্টের বিবেচনা স্থগিত রাখা হউক— উহা পণ্ডিত এ. পি. বাজপাই উত্থাপন করেন ও ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত সমর্থন করায় গৃহীত হয়।

৬. সভাপতি প্রস্তাব করেন যে, আইন-অমান্য সম্বন্ধে ডাঃ কিচলু যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা জেলা কংগ্রেস-কমিটিগুলিতে প্রেরণ করা হউক।

৭. মৌলানা মহম্মদ, এম. ইসলামাবাদী প্রস্তাব করেন যে, আগামী ২০ অক্টোবর উক্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

৮. নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিনিধিদের

মনোনয়নপত্র বঙ্গীয় কংগ্রেস-কমিটির নিকট দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর, ৩০ নভেম্বর মধ্যে ব্যালট পেপার পূর্ণ করিয়া সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, ৪ ডিসেম্বর মধ্যে উহা বাছাই করিতে হইবে। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত এল. এন. গার্দে সমর্থন করার পর গৃহীত হয়।

৯. এই সভা স্থির করেন যে, কাউন্সিলের সভার আগামী অধিবেশন পর্যন্ত শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশকে এডুকেশন বোর্ডের ভার গ্রহণে অনুরোধ ও বোর্ডের পুনর্গঠন স্থগিত থাকুক।

১০. কাউন্সিলের আগামী অধিবেশন পর্যন্ত শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্বদেশী বোর্ডের ভার গ্রহণে অনুরোধ ও বোর্ডের শেষ পুনর্গঠন স্থগিত থাকুক— এই প্রস্তাব শ্রীযুত এস. এন. ব্যানার্জি উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত বাজপাই সমর্থন করার পর গৃহীত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচন

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যাঁহারা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হইতে চান, তাঁহাদের মনোনয়ন পত্র পেশ করিবার তারিখ ২০ নভেম্বর। নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যেরা সর্ব-ভারতীয় কমিটির সদস্যগণকে নির্বাচিত করিবেন, তবে বর্তমান বৎসরের চাঁদা প্রদান করিয়াছেন এমন যে-কোনো কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন। নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের দেয় ৫৲ টাকা চাঁদা দিয়াছেন, শুধু তাঁহারাই নির্বাচনের সময় ভোট দিতে পারিবেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের চাঁদা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে! প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির অফিসে টাইপ করা মনোনয়ন পত্র পাওয়া যাইবে। হাতে লেখা মনোনয়নপত্র উপযুক্তভাবে লিখিত হইলে, তাহাও গৃহীত হইবে। (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিয়মাবলীর ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মনোনয়নপত্র পরীক্ষার সুবিধার জন্য, যে-সকল নির্বাচন-প্রার্থী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য নহেন, তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যে বর্তমান বৎসরের চাঁদা দিয়াছেন এবং কোনো কংগ্রেস কমিটির সদস্য, এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রেরণ করেন। আগামী ২১ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে আটটার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক 'কংগ্রেস কমিটির অফিসে, (৩৮।১বি, সুকিয়া স্ট্রীট) মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করা হইবে। নির্বাচন-প্রার্থী অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ তখন উপস্থিত থাকিতে পারেন।

২০ তারিখের পর ভোট দিবার পত্রসমূহ প্রেরিত হইবে। তাহা ২০ নভেম্বরের পূর্বে সেক্রেটারির নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন পত্রসমূহের পরীক্ষা হইয়া যাইবে এবং ফল উহার পর শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

১৪ নভেম্বর ১৯২৩

বিজ্ঞপ্তি

মিউনিসিপাল নির্বাচন

যেহেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচনে পদপ্রার্থী দাঁড় করানো হইতেছে, অতএব যাঁহারা ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে নির্বাচক-তালিকায়, তাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিনা তৎপ্রতি তাঁহারা যেন দৃষ্টি রাখেন। প্রাথমিক নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং আগামী '১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ করা হইবে। যদি কাহারো নাম অন্তর্ভুক্ত না হইয়া থাকে, আবার অশুদ্ধভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে নিজ নিজ ওয়ার্ডের রিভাইসিং অথরিটি বা সংশোধনকারী কর্মচারীর কাছে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনগুলি চেয়ারম্যান কলিকাতা কর্পোরেশন এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আমি সকল কংগ্রেস-কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাতে নির্বাচক তালিকাতে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল সকলেরই নাম উঠে তাহার জন্য যেন সকলেই চেষ্টা করেন। যদি ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য অনেক সহজ হইবে।

১৩ ডিসেম্বর ১৯২৩

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২১ জানুয়ারি সোমবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাস হইয়াছে।

সভাতে স্থির হয় যে, যেহেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে একটি পরামর্শ-সমিতির সাহায্যে আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সদস্যপদপ্রার্থী মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেইজন্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট ইহা পুনরায় উত্থাপন করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবং সভাপতি মহাশয়কে মনোনীত ব্যক্তিদিগের নাম যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দুইজন মুসলমান সভ্য নির্বাচন সম্পর্কে যে ভোটপত্র বাহির করা হইয়াছে তাহাতে সদস্যপ্রার্থীদের মধ্যে মৌলবী রফিকার রহমানের বাড়ি ভুলক্রমে কুমিল্লা জেলায় লেখা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে মৌলবী রফিকার রহমানের বাড়ি চব্বিশ পরগনায়, কুমিল্লায় নহে।

২৪ জানুয়ারি ১৯২৪

চন্দ্রগ্রহণ-স্নান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন

চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে দেশবাসীর কর্তব্য

আগামী চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ধরাত্রি পর্যন্ত স্নানযোগ। এই উপলক্ষে স্নানার্থ গঙ্গার ঘাটে বহু ভদ্রমহিলারও সমাগম হইবে। এই-সমস্ত পর্বদিনে স্নানার্থিগণ বিশেষত পর্দানশীন মহিলাগণ সময়ে সময়ে যে কিরূপ বিপদে পড়েন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং কলিকাতা ও তৎ-সন্নিকটস্থ কংগ্রেস-কমিটি ও সভা-সমিতিগুলিকে স্নানকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাজ প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচভাগে বিভক্ত হইবে :

১. যাহাতে স্নানকালে কেহ ডুবিয়া প্রাণ না হারান (ইহা প্রধানত সন্তরণ ও নৌকা বাইচের সমিতিগুলির কর্তব্য)

২. স্নানযাত্রীদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৩. যাহাতে স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে চুরি না হয়, তজ্জন্য অলিগলিগুলি পাহারা দেওয়া।

৪. দুর্বৃত্তগণ যাহাতে চুরি ও পকেট মারিতে না পারে, তজ্জন্য পাহারা দেওয়া।

৫. আকস্মিক আহতদিগের প্রাথমিক শুশ্রূষা (এই ক্ষেত্রে এম্বুলেন্স ক্লাবগুলির বিশেষ প্রয়োজন)

উত্তর কলিকাতা ও মধ্য কলিকাতা জেলা কংগ্রেস-কমিটি এবং বিবিধ সমিতিগুলি এই কার্যে ইতিমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু কাজটা এত বড়ো যে, সমবেত চেষ্টা না হইলে ইহা সম্পন্ন হইবে না। গত সূর্যগ্রহণের সময়েও কলিকাতা, হাওড়া এবং শালকিয়ার বিভিন্ন ঘাটগুলিতে প্রায় তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক কার্য করিয়াছিল।

আমরা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য বিভিন্ন কংগ্রেস-কমিটি ও

সভাসমিতিগুলিকে আহবান করিতেছি। তাঁহাদিগকে গঙ্গার উভয় তীরেই কার্য করিতে হইবে।

যে-সমস্ত সমিতি সাহায্য দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, আমি জানিতে চাই যে, তাঁহাদের কার্যের জন্য গ্যাস লাইটের প্রয়োজন হইবে কিনা। অন্ধকার অলিতে গলিতে ভয়ের কারণ বেশি এবং আলোর যে সরকারী বন্দোবস্ত আছে, তাহাও পর্যাপ্ত নহে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বাণী

আমি আজ ১৮১৮ সনের ৩ আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া চলিলাম। আমার বড়োই কষ্ট হইতেছে যে, আমি মাস মাস ছাত্রদিগকে যে সাহায্য দিতাম, তাহা আর এখন দেওয়া সম্ভবপর হইবে না ; আমি আশা করি, তাহারা অন্যপ্রকারে বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইবে। আমি কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু এ অবস্থায় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব। দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট। আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্তত আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত ইহাদের সাহায্য করিবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি।

২৬ অক্টোবর ১৯২৪

তথ্য ও উল্লেখ-পঞ্জী

পৃ. ১ ।। প্রেসিডেন্সি কলেজের গণ্ডগোল : যথাযথ বিবরণ

প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ই. এফ. ওটেনের আচরণে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাঁকে প্রহার করে। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের 'ভারতপথিক' গ্রন্থ ও রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পৃ. ৩ ।। ভাষণ : কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

১০ ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে গ্রেপ্তার হয়ে ১ আগস্ট ১৯২২ সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হন। ৯ আগস্ট ১৯২২ তারিখে কলিকাতা বিদ্যাপীঠের সহকারী অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ তাঁকে সম্বর্ধিত করেন। সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ও কাজী নজরুল ইসলাম সংগীত পরিবেশন করেন। সহকারী অধ্যক্ষ কিরণশংকর রায় মানপত্র পাঠ করেন। মানপত্রে ছিল : 'ঘরের শঙ্খ তোমার জন্য নয়, আত্মীয়ের আকর্ষণও তোমার জন্য নয়— সংসারের ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তোমার জন্য নয়— তুমি যে রুদ্র দেবতার আহবানে আজ বৈরাগী তারই দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ পড়ুক তোমার উপর।'

সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নি।

পৃ. ৪ ।। বন্যা-প্রপীড়িত উত্তরবঙ্গের বিবরণ

৪ অক্টোবর ১৯২২ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীসাতকড়িপতি রায় উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্পর্কে একটি আবেদন প্রচার করেন। তাতে বলা হয় : 'বগুড়া জেলা সমিতি হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই মর্মে তার আসে যে বন্যা ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিয়াছে। হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।··· কিন্তু কোনো বিবরণই চাক্ষুষ দ্রষ্টার বিবরণ নয় বলিয়া ১লা অক্টোবর শ্রীযুত বাবু সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুত ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সান্তাহার রওনা হইয়াছেন।'

পূর্বোক্ত তারিখেই কলকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও নাগরিকদের এক সভায় Bengal Relief Committee নামে একটি কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থা গঠিত

হয়। কমিটিতে ছিলেন : স্যার আশুতোষ মুখার্জি, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার নীলরতন সরকার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জি. ডি. বিড়লা, লেঃ জে. ডি. ক্রফোর্ড প্রমুখ। সুভাষচন্দ্র কমিটির অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটি গঠনের আগেই তিনি দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শনে চলে গিয়েছিলেন।

পৃ ৭ ।। তরুণের আহ্বান

নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন ড. মেঘনাদ সাহা। সম্মেলনের শেষে নিম্নরূপ কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল : সভাপতি ড. মেঘনাদ সাহা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহ-সভাপতি : শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা) মৌলবী এস. এস. মোয়াজ্জেম হোসেন (ময়মনসিংহ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

পৃ. ১৩ ।। দলের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি বলেন, "চরকাকে আমি স্বাধীনতার প্রতীক বলিয়া জ্ঞান করি। চরকা দ্বারা খদ্দর প্রস্তুত করিয়া, বিলাতী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা যদি পরিধান করি, তাহা হইলে বস্ত্র বিষয়ে আমরা স্বাধীন হইব। এইভাবে জীবনের অন্যান্য দিকে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইতে পারিব। চরকা দ্বারা কোন কারখানা খুলিলে চলিবে না। প্রতি ঘরে ঘরে চরকা চলা আবশ্যক। কিন্তু কংগ্রেস কার্যত এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন ? মাত্র কতকগুলি কারখানা খোলা হইয়াছে। ইহাতে দ্বিগুণ মূল্যের খদ্দর বিক্রয় হইতেছে। তাহা হইলে খদ্দর ও বিলাতী কাপড়ে পার্থক্য কোথায় ? এ ক্ষেত্রে লোকে যদি খদ্দর না কিনিয়া বিলাতী বস্ত্র অথবা মিলের কাপড় ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। পাঁচ টাকা করিয়া খদ্দরের কাপড়ের জোড়া বিক্রয় হইতেছে। ইহাতে গরীবের রক্ত শোষণ করা হইতেছে মাত্র। আমি যদি এই সব কথা বলি তাহা হইলে কি বলিতে হইবে আমি চরকা বিশ্বাস করি না ? সত্য কথা বলিতেই হইবে। সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ কি তাহা আমি বুঝি—কিন্তু সত্যাগ্রহী অসহযোগ কাহাকে বলে তাহা আমি বুঝি না।.. "

পৃ. ১৪ ।। গান্ধীপুণ্যাহ

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে 'গান্ধী পুণ্যাহ' জনসভা। সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

পৃ. ১৫ ।। কাউন্সিল নির্বাচনে প্রচার-অভিযান

দিল্লী অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ১৯২৩) বিধান সভায় প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবক স্বরাজ্য দল, এবং ফলে তার আধিপত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র। ব্যবস্থাপক সভা (বিধান সভা) নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত হল তাঁর ওপর। ১৯২৩ সালের নভেম্বরে নির্বাচনে স্বরাজ্য দল বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল।

পৃ. ১৭ ।। প্রতিবাদ

হরদয়াল নাগ। ১৮৫৩-১৯৪২। কুমিল্লার চাঁদপুরে ওকালতি করতেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯২১-২২ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটর মনোনীত হন।

বি. চক্রবর্তী। ১৮৫৫-১৯২৯। পুরো নাম ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার। ১৯০০ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯০৪ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৪ সালে বঙ্গীয় বিধান সভায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা নির্বাচিত হন ও ১৯২৬ সালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হন। ১৯২৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে তিনি পদত্যাগ করেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। ১৮৬৯-১৯৩২। জন্ম পাবনা জেলায়। পাবনায় ও কলকাতায় শিক্ষকতা, 'বন্দেমাতরম্' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদনার সংগে যুক্ত হন ও ইংরেজি দৈনিক 'সার্ভেন্ট' সম্পাদনা করেন। অনুশীলন সমিতির সংগে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালে মান্দালয় জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন।

পৃ. ২১ ।। দেশবাসীর প্রতি বাণী

মান্দালয়। ব্রহ্মদেশে অবস্থিত। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও ভারতের সংগে যুক্ত থাকাকালে ভারতের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের

মান্দালয়ে কারাভোগের জন্য পাঠানো হত। এখানে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকও প্রায় ছয় বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। মান্দালয় জেলে সুভাষ-চন্দ্রের কারাবাসের বর্ণনা তাঁর **Indian Struggle** গ্রন্থে আছে। ২৫ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে সুভাষচন্দ্র ১৮১৮ সালের আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হন এবং ১৬ মে ১৯২৭ তারিখে মুক্তি লাভ করেন।

পৃ. ২৩॥ রাজবন্দী সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ

অনিলবরণ রায়। ১৮৯০-১৯৭৪। হেতমপুর কলেজ ও বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজে সাত বছর অধ্যাপনার পর ১৯২১ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বরাজ্য পার্টির অন্যতম নেতা ও বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্য হন। ১৯২৪ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯২৬ সালে কারামুক্ত হয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগ দেন, ও চল্লিশ বছর পর বাংলায় ফিরে আসেন। গীতার অনুবাদ ও আর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ১৮৮৮-১৯৪২। কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯১৬-১৯ সালে অন্তরীণ হন। ১৯২২-২৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের প্রার্থীরূপে বিধানসভার সদস্য হন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। পরে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ও সেখানে স্বরাজ্য দলের মুখ্য সচেতক নির্বাচিত হন।

লর্ড উইন্টারটন। ১৯২২ সালে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী যখন লয়েড জর্জ ও ভারতের গভর্নর জেনারাল লর্ড রীডিং তখন লর্ড উইন্টারটন আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ছিলেন। তিনি সে সময় ভারত সফরে আসেন। ভারতের দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে একটি নতুন নীতি নির্ধারণ ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি ভারত সরকারকে পরামর্শ দেন দেশীয় রাজাদের প্রতি আরো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে।

মিঃ ডে। পুরো নাম আর্নেস্ট ডে। গোপীনাথ সাহা ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে স্যার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে এঁকে গুলি করে হত্যা করেন। ইনি কিলবার্ন কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

গোপীনাথ সাহা। ১৯০১-১৯২৪। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে জন্ম। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হন ও জ্যোতিষ ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। তিনি

দল কর্তৃক স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্নেস্ট ডে নামক একজন ইংরেজকে হত্যা করেন। বিচারে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা শুনতে শুনতেই তিনি বিচারককে বলেন: "এই দণ্ডকে স্বাগত জানাই। আমার প্রতিটি বিন্দু রক্ত ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।" বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলনে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকার ও গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হন।

পৃ. ২৯ ।। অতীতের গণ্ডগোল বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইয়া দাও

সুভাষচন্দ্র মান্দালয় থেকে বাংলায় ফিরে আসার পর স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে এই সময় শিলঙে বাস করছিলেন।

পৃ. ৩১ ।। ভাষণ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক উত্থাপিত 'সাম্প্রদায়িক ঐক্য' সম্পর্কিত প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ আলি, শ্রীপ্রকাশম, আক্রাম খাঁ, ডা. আনসারি ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

মৌলানা আক্রাম খান। ১৮৬৮-১৯৬৮। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হন, খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯২৯ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪১-৫১ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' 'দৈনিক সেবক' ও 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদনা করেন।

মৌলানা শৌকত আলি। ১৮৭৩-১৯৩৮। আগা খাঁর ব্যক্তিগত সচিবের পদ গ্রহণ করে সরকারী চাকরি ছাড়েন। মক্কার কাবাশরীফের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভারতের হজযাত্রীদের দেখাশোনা করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের খলিফার স্বার্থরক্ষাকল্পে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন ও গ্রেপ্তার হন। খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু পরে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। মোতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করেন।

মহম্মদ আলি। ১৮৭৮-১৯৩১। শৌকত আলির কনিষ্ঠ ভাই। রামপুর দেশীয় রাজ্যের শিক্ষা-অফিসার ও পরে বরোদার গায়কোয়াড়ের রাজ্যে কিছু-

কাল চাকুরি করবার পর প্রথমে কলকাতা ও পরে দিল্লী থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কমরেড' প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। উর্দু দৈনিক 'হামদর্দ' সম্পাদনা করেন ; কারারুদ্ধ হন। খিলাফত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও পরে কংগ্রেস-বিরোধী হন। ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেই মারা যান।

পৃ. ৩৪ ।। ভাষণ

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৃ. ৪১ ।। মাদ্রাজ অধিবেশন : বিবৃতি

মাদ্রাজ অধিবেশন জাতীয় কংগ্রেসের ৪২তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অন্যতম ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুভাষচন্দ্র এই অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৮৭৪-১৯৪১। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবী। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন ও দশ বছর মাদ্রাজের কংগ্রেস দলের প্রধান নেতা ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের সহ-নেতা নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৮ সালে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠিত হলে তিনি সভাপতি হন। ১৯৩০ সালে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৮৬১-১৯৪৬। পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। স্কুলে শিক্ষকতা, পত্রিকার সম্পাদনা ও আইনব্যাবসা করেন। ১৯০৯, ১৯১৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি হিন্দু-মহাসভার ও প্রতিষ্ঠাতা। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

পৃ. ৪৭ ।। সাইমন কমিশন ও বয়কট

সাইমন কমিশন। ১৯২৭ সালে ইংলন্ডের রক্ষণশীল সরকার একটি বিধিবদ্ধ কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার জন সাইমন। অপরাপর সদস্যগণ ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্রাথকোনা, এডোয়ার্ড ক্যাডোগান, স্টিফেন ওয়ালস, মেজর অ্যাটলি ও কর্নেল লেন ফক্স। মিঃ ওয়ালস পদত্যাগ করলে তৎস্থলে সদস্য নিযুক্ত হন মিঃ ভার্নন হার্টসন। চেয়ারম্যান ছিলেন উদারনৈতিক দলের সদস্য, শ্রমিক দলভুক্ত দুজন সদস্য ছিলেন, বাকি চারজন ছিলেন রক্ষণশীল। কোনো ভারতীয়কে এই কমিশনের সদস্য না করার ফলে ভারতের নরমপন্থী রাজনীতিজ্ঞরাও এই কমিশনের বিরোধিতা করেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ দানই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কমিশন' ভারতে এলে ভারতের সর্বত্র এই কমিশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষোভ দেখায়। ১৯৩০ সালের ৭ জুন তারিখে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

মিলনার কমিশন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে মিশরে মিলনার মিশন আসে "to investigate the causes of the last disorders in Egypt" এর আগে ১৯১৯ সালের ১০ নভেম্বর হাই কমিশনার ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড মিলনারের অধীনে একটি মিশন পাঠাবেন একটি সংবিধান রচনার প্রাথমিক কাজ নিয়ে। কিন্তু মিশরীয়রা বুঝল যে মিশনের উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ প্রোটেকশনের অধীনে স্বায়ত্তশাসন-এর ব্যবস্থা করা। জগলুল পাশা ঐ কমিশন বয়কটের আহ্বান জানান— জনগণ তাতে সাড়া দিয়ে প্রতিবাদ জানায়, রাজপথে দাঙ্গা হয়, আবদিন প্রাসাদের সামনে বহুলোক মারা যায়। মিলনার মিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও মিশরের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে সম্পর্ক করতে হবে। এই রিপোর্ট মিশরীয়রা প্রত্যাখ্যান করে।

পৃ. ৫৮ ।। বিবৃতি

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ তারিখে সারা ভারতে হরতাল পালিত হয়। কলকাতায় ঐ দিন পুলিশ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও জুলুম করে। তারা প্রদেশ কংগ্রেস অফিসেও প্রবেশ করে মারপিট করে। স্যার জন সাইমন এই দিনের ঘটনার পর এদেশের নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে একত্রে সব-কিছু করতে চান বলে এক বিবৃতি দেন।

পৃ. ৫৮-৫৯ ॥ ভারতবর্ষ কী চায়

মুদিম্যান কমিটি সংখ্যালঘু রিপোর্ট। ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন কার্যকর করতে গিয়ে যে-সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার আলেকজান্ডার মুদিম্যানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির সদস্য হন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার শিবস্বামী আয়ার, মোহম্মদ আলি জিন্না ও ডা. পরাঞ্জপে। কমিটিতে বহু সরকারী অফিসারও সদস্য ছিলেন। উপরোক্ত রাজনৈতিক নেতারা হন সংখ্যালঘু ও তাঁরা একটি সংখ্যালঘিষ্ঠের রিপোর্ট দেন। এঁদের রিপোর্টে বলা হয় যে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার ও কেন্দ্রেও কিছু পরিমাণ দায়িত্বশীল সরকার গঠিত না হলে শাসনতন্ত্রে তথাকথিত পরিবর্তন এনে লাভ হবে না।

পৃ. ৬০ ॥ জাতীয় ফিল্ম

১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মনোমোহন থিয়েটারে ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট নির্মিত প্রথম ছায়াছবি 'দেবদাস' প্রদর্শনের তৃতীয় সপ্তাহে সুভাষচন্দ্র ছবিটি দেখেন ও ভাষণ দেন।

পৃ. ৬৩ ॥ ভাষণ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

'মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, করদাতা সংঘ, চুঁচুড়া বান্ধব সমিতি, চুঁচুড়া ছাত্র অ্যাসোসিয়েসন ও হুগলি কলেজ ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা।

পৃ. ৬৫ ॥ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ভাষণ

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এবং পনেরো হাজার শ্রোতা স্থানাভাবে ফিরে যান। সহস্রাধিক নারী-সমাবেশ ঘটেছিল— এঁদের মধ্যে ছিলেন বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি।

পৃ. ৭২ ॥ মিঃ এ. এল. থার্টল সম্বর্ধনা

ব্রিটিশ হাউস-অফ-কমন্সের সদস্য মিঃ ই. এল. থার্টল ও মিসেস থার্টলকে শ্রমিকদের এক সভায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। মিঃ থার্টল অভিনন্দনের উত্তরে

বলেন : 'সারা বিশ্বের শ্রমিকগণ মহান শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্বত্রই ধনিকের দ্বারা শ্রমিকগণ শোষিত হয় এবং ভাল জিনিসের তারা অংশ পায় না। ভারতের সংগ্রাম— ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দল এই দ্বিমুখী ধারায় চালাতে হবে।' মৃণালকান্তি বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির বিষয়ে মিঃ থার্টলের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করেন।

পৃ. ৭৭ ॥ স্বাধীনতার যুদ্ধ

রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজার পরিপ্রেক্ষিতে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের উপর শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তিদানের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভেদানন্দ।

পৃ. ৯১ ॥ গুজবের প্রতিবাদ

হাওড়ার মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন উপলক্ষে গুণ্ডামির প্রতিবাদে বিবৃতি।

পৃ. ১০৮ ॥ পূর্ণ-স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য

বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসিরহাটে উপস্থিত হয়েছিলেন। বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলেন :

"সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাগমন

ভারতের রাজনৈতিক আকাশ আজ সমস্যার ঘনঘোরঘটায় আবৃত। এ সমস্যা জটিল নয়— ইহার সমাধানও যে অত্যন্ত কঠিন, এমনও আমার মনে হয় না ; কিন্তু এই মহাজাতিকে সমস্যা পূরণের পথে পরিচালিত করা যে কত বড় দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ, তাহা হয়তো আপনারা বোঝেন। একদিকে এই গুরু কর্তব্য—এই বিপুল দায়িত্ব—যেমন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, অন্যদিকে তেমনি আশার আলোও দেখা দিয়াছে। প্রায় চার বৎসর পূর্বে যে কর্মবীরকে আমরা হারাইয়াছিলাম—সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া যাঁহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজশক্তি দূরে নির্বাসনে পাঠাইয়াছিল—আজ সেই কর্মবীর সুভাষচন্দ্র আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার পরিত্যক্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসনে আহ্বান করি। বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ

সন্তান— তাঁহাকে পাইয়া আমাদের আশা ও উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছে ; মনে হইতেছে—এবার নিশ্চয়ই আমরা মহা অভিযানে জয়ী হইব।"

লর্ড বার্কেনহেড ১৮৭২-১৯৩০। সফল ব্রিটিশ আইনজীবী ও রাষ্ট্রনেতা। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ১৯১৫-১৯ সালে অ্যাটর্নি জেনারাল, ১৯১৯-২২ সালে লর্ড চ্যান্সেলার ও ১৯২৪-২৮ সালে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া ছিলেন। সাইমন কমিশন নিয়োগের মূলে এঁরই হাত ছিল।

পৃ. ১১২-১১৩ ।। ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করে দুটি পৃথক প্রদেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে গঠিত একটি প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত একটি প্রদেশ। দুজন পৃথক লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই দুটি পৃথক প্রদেশ শাসন করবেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। স্বদেশী পণ্য ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদি গঠনমূলক কার্যসূচী-সহ স্বদেশী ভাবের বন্যা বাংলা ও ভারতকে এই সময় প্লাবিত করেছিল। ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনও এই সময় শুরু করা হয়েছিল। সরকার এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার নীতি নেওয়ায় বাংলায় বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১১ সালে সরকার বঙ্গবিভাগ নাকচ করে দেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত হলেও আসাম, বিহার ও ওড়িশাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ভারতের রাজধানীও কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে সারা ভারত প্লাবিত হলে সরকার শাসন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল আর্ল মিন্টো ও ভারতসচিব জন মর্লে যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন তা ১৯০৯ সালের ভারত সরকার আইনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। যোগ্য ভারতীয়দের মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ার বিধান এই আইনে স্থান পেয়েছিল। ভাইসরয়ের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথম স্থান পান স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও বাংলার এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে প্রথম স্থান পান রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী। আইনসভাগুলির গঠন ও

কর্মপরিধি সম্পর্কেও পরিবর্তন আনা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এই আইন তথা মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারে স্থান পায় নি।

অসহযোগ আন্দোলন। ১৯১৯-২০ সালে মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন শুরু করেন। সরকারের সংগে অসহযোগিতা করার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় দাবি আদায় করে নিতে সরকারকে বাধ্য করানোই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ত্রিমুখী বয়কট— সরকারী স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত ও সরকারী চাকুরি বয়কট ছিল কর্মপন্থা। এ ছাড়া ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনও বয়কট করা হয়। অগণিত মানুষ এ আন্দোলনে যোগ দেয় ও গান্ধীজী সম্পূর্ণ অহিংসা পদ্ধতিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত আন্দোলনের রেশ বর্তমান ছিল।

পৃ. ১৭৬ ।। উপাসনার স্বাধীনতা

সিটি ও স্কটিশচার্চ কলেজের অচলাবস্থা কাটে নি— প্রবীণ নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই বিষয়ে একটি আপস-মীমাংসার প্রস্তাব সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতিটি দেওয়া হয়।

পৃ. ১৮২ ।। সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী

বোম্বাই সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিতে অনেক নেতা এসেছিলেন। ডা. আনসারি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, দেশীয় রাজন্যবর্গ, ন্যাশনালিস্ট পার্টি, হোমরুল লীগ, লিবারাল ফেডারেশন ইত্যাদি দল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিল।

শ্রীযুক্তা অ্যানি বেশান্তের প্রস্তাবক্রমে এই সম্মেলনে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন: তেজবাহাদুর সপ্রু, আলি ইমাম, জি. আর. প্রধান, সোয়েব কুরেশি, সুভাষচন্দ্র বসু ও মিঃ আনে।

পৃ. ১৯৪-১৯৫ ।। নির্বাচন

বংগীয় প্রজাস্বত্ব বিল: কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৮৮৫-র প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন ক'রে ৩ ডিসেম্বর ১৯২৫ বংগীয় বিধান সভায় একটি বিল

পেশ করা হয়েছিল। বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় এবং ৭ আগস্ট ১৯২৮ প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলটি উত্থাপিত ও বিতর্কিত হয়ে কয়েকদিন পর গৃহীত হয়। প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজা বলতে মোটামুটি তিন শ্রেণীকে বোঝাত। যারা মধ্যস্বত্বভোগী— যাদের tenure-holders বলা হত— যারা রায়ত, যারা নিম্ন রায়ত। ১৯২৮ সালের আইন না হওয়া পর্যন্ত মধ্যস্বত্ব-ভোগীরাই, যারা জমিদারদের প্রায় সমগোত্রীয় ছিল, প্রজাস্বত্ব আইনের ফল ভোগ করেছে। ১৯২৮ সালের আইন রায়তদের তো বটেই নিম্নরায়তদের স্বত্বকেও অনেক পরিমাণে স্বীকার করে নেয়। এই বিলটি কংগ্রেসের-জমিদার সদস্যদের স্বার্থবিরোধী হওয়ায় কোনো কোনো মহলে সংশয় ছিল এই বিলটি কংগ্রেস সমর্থন করবে কিনা।

পৃ. ২১৭ ।। উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস। ১৮৭৭-১৯২৮। নব্য ওড়িশার অন্যতম স্রষ্টা। সাক্ষীগোপাল বন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২১ সালে গ্রেপ্তার হলে বিচারপতি ম্যাজিস্ট্রেট সতীশচন্দ্র বসু (সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সরকারী চাপ সত্ত্বেও এঁকে কারাদণ্ড দিতে অস্বীকার করেন এবং সেজন্য পদত্যাগও করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গোপবন্ধুকে 'উৎকলমণি' নামে অভিহিত করেছিলেন। ওড়িয়া সাহিত্য তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস। ১৮৮৪-১৯৬৭। নব্য ওড়িশার অন্যতম স্রষ্টা। সাক্ষীগোপাল বন বিদ্যালয়ে গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওড়িয়া ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনবার কারারুদ্ধ হন। স্বরাজ্য দলে যোগ দেন ও ত্রিশ বছর কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় স্বরাজ্য দলের সম্পাদক ও ওড়িয়া প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে ওড়িশায় কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন ও সরকারী যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা করেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর অবদান আছে।

'সমাজ' পত্রিকা। ওড়িশার নেতা গোপবন্ধু দাস দুর্ভিক্ষ ও বন্যাত্রাণ কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে জনসাধারণের অভিযোগ প্রকাশের জন্য পত্রিকার প্রয়োজন আছে। তাই তিনি ১৯১৯ সালের ৪ অক্টোবর সাপ্তাহিক 'সমাজ' প্রকাশ করেন।

পৃ. ২৪৫ ।। নূতন প্রাণস্পন্দন

মৌলানা হজরত মোহানি। ১৮৭৮-১৯৫১। আসল নাম সৈয়দ ফজলুল হাসান। জন্ম লক্ষ্ণৌয়ের কাছে 'মোহন' শহরে। উর্দু ভাষায় কবিতা লেখার সময় এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যোগ দেন। তিলকপন্থী ছিলেন। কারারুদ্ধ হন। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধীজীর আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম সমাজে স্বদেশী ব্রতের প্রথম প্রচারক। সমাজ সংস্কারক। লাহোরে মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভারতের সংবিধানের খসড়ায় স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃত হন এই যুক্তিতে যে তিনি দেশ-বিভাগ ও ভারতের কমনওয়েলথ-ভুক্তির বিরোধী।

পৃ. ২৪৯ ।। স্বাধীনতার আদর্শ

বেন্থাম। ১৭৪৮-১৮৩২। জেরেমি বেন্থাম আইন ব্যবসায়ে যোগ দিয়েও সরে আসেন। ১৭৭৬ সালে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন A fragment on Government. আইন ও রাজনীতি সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রয়োজনবাদী দার্শনিক ছিলেন— ঊনিশ শতকের চিন্তাজগতে তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল।

মিল। ১৮০৬-১৮৭৩। জন স্টুয়ার্ট মিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জেমস মিলের পুত্র। অর্থনীতি, রাজনীতি, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ঊনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। ইংলন্ডে ও ভারতে তাঁর প্রভাব সুবিস্তৃত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এঁর অনুরাগী ছিলেন। **On Liberty, Principles of Political Economy** প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ।

হার্বার্ট স্পেন্সার। ১৮২০-১৯০৩। প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। **Philosophy and Religion, Social Statics** প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ঊনিশ শতকের

মনীষীদের অন্যতম। ভারতের নবীন বিদ্বৎসমাজ এঁর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

পৃ. ২৫২ ॥ ভারতের স্বাধীনতা : নূতন দৃষ্টিভঙ্গি

ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ অফ ইন্ডিয়া। শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রসঙ্গে টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ. ৩৩০)। বাংলায় এই লীগের যে শাখা গঠিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র তার সভাপতি হন। বঙ্গীয় শাখার পক্ষ থেকে যে ইশতেহার প্রকাশিত হয় তার খসড়া সুভাষচন্দ্র কর্তৃক রচিত।

শ্রীআভারি। জন্ম ১৮৯৮। পুরো নাম মঞ্চেরসা আভারি। গুজরাটের সুরাট জেলায় জন্ম। ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করার পর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালের নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন। বেরার তদানীন্তন সেন্ট্রাল প্রভিন্স-কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অন্যতম। তিনি অস্ত্র-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করেন ও বিপ্লববাদী হন। ১৯৩২ সালে 'রিপাবলিকান আর্মি' গঠনে সক্রিয় অংশ নেন। ১২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। নাগপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন। সুভাষপন্থী আর. এস. রুইকরের সহযোগী। জনসাধারণ তাঁকে 'জেনারাল' নামে ডাকে।

মিঃ এন্ডরুজ। ১৮৭১-১৯৪০। পুরো নাম চার্লস ফ্রিয়ার এন্ডরুজ। ধর্মপ্রচারক পরিবারে জন্ম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস। চার্চ-অফ-ইংলন্ডের সদস্য হন ও লন্ডনের পূর্বাঞ্চলে দরিদ্রদের মধ্যে সেবাকর্ম শুরু করেন। ১৯০৪ সালে দিল্লী সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। দিল্লীতে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১২ সালে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লাভ করেন। পরবছর শান্তিনিকেতনে যান ও আশ্রমবিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে গোখেলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে বসবাস করেন। সারাজীবন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা বহন করেছেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেন। কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। দীনবন্ধু এন্ডরুজ নামে তিনি পরিচিত। শ্রমিক ও হরিজন আন্দোলনে তাঁর অবদান আছে।

এন্ডরুজ জামশেদপুর শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

কিন্তু টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লক-আউট ঘোষণা করলে তিনি পরামর্শ দেন সুভাষচন্দ্রকে ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিপদে বরণ করতে। তখন সর্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্র ঐ পদে নির্বাচিত হন।

পৃ. ২৯২ ।। অভিভাষণ—নিখিলভারত যুব-কংগ্রেস অধিবেশন

নিখিলভারত যুব কংগ্রেসের অধিবেশন পার্কসার্কাস কংগ্রেসে সম্মেলনের প্যান্ডালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন কে. এফ. নরিম্যান। এখানেই সুভাষচন্দ্র পণ্ডিচেরী ও সবরমতী আশ্রমের চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর বহু বিতর্কিত ভাষণটি দেন। এই ভাষণ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্যও করেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ সুভাষচন্দ্রের এই ভাষণ নিয়ে সাড়া দেশজুড়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যায়।

পৃ. ২৯৮ ।। নিখিলভাবত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের প্রয়োজনীযতা

জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনের প্যান্ডেলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুস্থানী সেবাদলের সম্মেলন। সম্লেমনে নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

পৃ. ৩০১ ।। হিন্দীভাষা ও বাঙালী

একই প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন'। সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের স্বার্থে রোমান বর্ণমালায় হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

পৃ. ৩০৬ ।। কলিকাতা কংগ্রেস, ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮

কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৩ তম অধিবেশন ১৯২৮ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সব প্রদেশ থেকেই প্রতিনিধি এসেছিলেন, ব্রহ্মদেশ থেকেও এসেছিলেন দেড়শো জন। সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু গান্ধীজী বিরোধিতা করার ফলে ১৩৫০ : ৯৭৩ ভোটে ঐ প্রস্তাব পরাজিত হয়। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন।

পৃ. ৩১৩ ।। কলিকাতা বিদ্যাপীঠ

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ১৯২১ সালে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এই বিদ্যাপীঠ শুরু হয়। অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র কারাগারে নীত হলে এই বিদ্যাপীঠের কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে যায়। 'বাঙ্গলার কথা' দৈনিক পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি এই প্রসঙ্গে সংযোজিত হয়েছে।

পৃ. ৩২০ ।। বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তিটি ১৪ নভেম্বর ১৯২৩ দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত।

নির্দেশিকা